সাহিত্য সংস্কৃতি দর্শন

তীর্থপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বুকস্ ওয়ে
কলকাতা

প্রকাশক
বুকস্ ওয়ে
পাবলিশার্স এণ্ড ডিস্ট্রিবিউটার্স
৮৬ এ কলেজ স্ট্রিট (ওয়াই. এম. সি. এ. বিল্ডিং)
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৪০৭/২০০০

মুদ্রণ
পদ্মনাভ ইম্প্রেসন
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

অক্ষর বিন্যাস
জে. বি. এন্টারপ্রাইজ
৬/১ সীতানাথ রোড, কলকাতা-৬

উৎসর্গ

পার্ব্বতীপ্রভা জননীকে

সূচিপত্র

বিষয়সূচি *পৃষ্ঠা সংখ্যা*

মুখবন্ধ

বস্তুতঃ প্রবন্ধ সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য সমালোচনা বা ক্রিটিসিজম্। প্রবন্ধ শব্দের উৎপত্তি প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করলে কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কোন বিশেষ তর্কপ্রক্রিয়া তথা বিচারকার্য সংঘটন করার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উপরন্তু সেই বিচারকার্য কোন বিষয়ের উপর নতুন দৃষ্টিস্থল বা নতুন কোন প্রায় অপ্রত্যাশিত প্রেক্ষিত থেকে একটা আলোচনা বা তর্ক নির্মাণ করে। প্রবন্ধ অতএব একটি অবলোকন করবার প্রক্রিয়া বটে। অন্যথায় তর্ক বা পক্ষপাত সমর্থিত বক্তব্য। এক্ষেত্রেও সেহেতু বৃক্ষের বৃদ্ধিপ্রক্রিয়া খাঁটি প্রবন্ধ সাহিত্যের উপযুক্ত রূপক। যেমন বৃক্ষের সারোৎসার, বীজবপন ও বৃদ্ধি। যেমন তার পল্লবিত শাখাপ্রশাখা। যেমন পুষ্পের স্ফুরণ ও সৌন্দর্যবিস্তার। তেমন প্রাবন্ধিকের নিরবচ্ছিন্ন বাক্যসংলাপ প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে পাঠককে এক প্রাচীন মনীষায় পুনরুজ্জীবিত করে। ঠিক একই কারণে প্রবন্ধকে প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র তথা আপ্তবাক্যের সমতুল্য একপ্রকার ব্যাখ্যা বা প্রস্থান হিসেবে বিবেচনা করাটা প্রয়োজনীয় বটে।

পাঠক স্মরণ করবেন যে অন্ততঃ শাস্ত্র অধ্যয়নকারি পণ্ডিতবর্গ, তাত্ত্বিক বা ভাষ্যকারেরা যে প্রস্থান রচনা করেছেন, তা জ্ঞাত ধর্মীয় সভ্যতার উন্মেষকাল থেকে লিখিত হয়েছে তো বটেই। প্রস্থান কথাটার ল্যাটিন বা ইংরেজি পরিভাষা 'একসিজিসিস্'। তার উদ্দেশ্য সার্বিকভাবে এক তথা অভিন্ন। বস্তুতঃ প্রাচীন কবি বা ঋষি যে আপ্তবাক্য বা সর্বজনবিদিত সত্য প্রণয়ন করে গেছেন তার সঠিক টীকা বা ব্যাখ্যা করা। এই টীকা বা ব্যাখ্যা প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার প্রস্থান বা কোন পূর্বোক্ত সত্যের বা পূর্বপক্ষের সমালোচনা। বর্তমান যুগের যে প্রবন্ধ সাহিত্য তাও একপ্রকার প্রস্থান। প্রাবন্ধিকের মূল বিষয় এক অর্থে প্রাচীন। প্রাবন্ধিক সামাজিক মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের নিরলস অংশীদার। তার কায়িক শ্রম বলতে এই যে সে এক শাশ্বতবোধ নিয়ে তার মালাকারি করে, তার যত্ন করে। প্রাবন্ধিক তার নিজের যুক্তির মাপকাঠিতে পুরাতন বিষয়ের অবতারণা করেন, অধ্যয়ন করেন, গ্রহণ বা খন্ডন করেন, এবং শেষমেষ তার পুনর্বিন্যাস করেন যাতে করে মানসের ভাণ্ডারে সম্বৎসরের শস্য মজুত থাকে।

দ্বিতীয়ত প্রবন্ধ সাহিত্যের যা মৌলিক উপকরণসমূহ, সমালোচনা তথা পূর্বপক্ষ খন্ডন, তার প্রধান উদ্দেশ্য অবশ্য আভাসপ্রাপ্তি। এই আভাসব্যঞ্জনা কেবলমাত্র সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেই নিষিক্ত তা নয়, বরঞ্চ তা বিশেষ করে প্রবন্ধের নির্মাল্যবাক্যে অনুরণিত হয়ে থাকে। অতএব যদিও নিরঞ্জন রসের এই প্রাচীন উল্লেখসহ বর্তমান গ্রন্থের এই প্রবেশিকা তাতে কেবল একটি বিশেষ ভাবাদর্শের নির্মাণ প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, নতুবা নয়। এই

গ্রন্থে সেই ভাবান্তর প্রবন্ধের সাহিত্যের শরীর ও অবয়ব। রাজনীতি যখন সাহিত্যের উপপাদ্য হয় তখনও তা বিশেষ করে একটি ভাবান্তর বা মানসিক বিকাশ সাধন করে। অন্যত্র যে অনুরূপ ঘটে না তা নয়। প্রাবন্ধিকের ক্রিয়ায় তার্কিকের তেজস্বিতা, বোধির প্রসারতা এবং তদোপরি সূত্র নির্মাতার প্রত্যয় লক্ষণীয়। এইসব বক্তব্যের প্রমাণ পাঠক পাবেন রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা ধূর্জটিপ্রসাদের প্রবন্ধে। সৈয়দ মুজতবা আলির আলোচনা সাহিত্যে। বীরবল, হিরণকুমার সান্যাল, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বা শংকরের জনপ্রিয় রচনাতেও সেই বিকাশ কিঞ্চিদধিক অব্যাহত। রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপরিচয়'তে যেমন কিংবা ধূর্জটিপ্রসাদের ব্যতিক্রমী প্রবন্ধ 'প্রগতি'তে, আমরা দেখতে পাই প্রাচীন আর্য ধ্যানধারণার এক নতুন, ভিন্ন বিশ্লেষণ, ভিন্নতর ও যুগধর্মী উপস্থাপন।

তৃতীয়ত, সমাজকে যারা তন্নিষ্ঠ চোখ দিয়ে দেখেছেন, কালে কালে যারা মানুষের চরিত্রকে বিশ্লেষণ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, বিশেষ করে যখন ইতিহাসে সংকটের দিন দেখা দিয়েছে, তারা বুঝেছেন যে মানুষ কর্ত্তব্যপরায়ণ জীব। আমাদের পক্ষে উচ্ছৃঙ্খলতা বা নৈরাজ্যের কাছে আশ্রয় নেওয়া কখনোই শ্রেষ্ঠ নয়। অতএব আমরা নীতিপরায়ণ হয়ে থাকি। যেখানে আমাদের সচকিতে ভালবাসা বা করুণার মত অনুভব চিত্তের সংশয়ের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে তখন সাহায্য নিতে হয়। সৃষ্টির অধ্যায়ক্রমে মানুষ হয়ত বন্য বা আগ্রাসী পুরাবৃত্ত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি পায়নি তবুও এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে আমাদের চৈতন্যের পার্থিব সত্তার অন্তরে কোথাও, কোন ঐন্দ্রজালিক মায়ার ভিতরকার পথ দিয়ে, একটা সুচারু, নক্ষত্রের আভাস আমাদের আকর্ষিত করে, চালিত করে। সমকালের পটভূমিতে আমরা যে সামাজিক চিত্র দেখতে পাচ্ছি, গোটা বিশ্বেই মানুষের আনাগোনায়, মানুষের আচার ব্যবহারে বা এমনকি মানুষের ট্র্যাজিক উন্নাসিকতায় যার ক্ষতিকর প্রকাশ ঘটে থাকে, তার মধ্যে কেবলমাত্র একটা চিরাচরিত সত্যের বা বাস্তবের উন্মেষ ঘটছে বলেই আমার মনে হচ্ছে। এই প্রাথমিক ব্যাপারটা সঠিক করে ব্যাখ্যা করা দরকার কারণ অধিকাংশ প্রবন্ধগুলিতে আমি যে বিতর্কের সম্মুখীন হব এবং যে মৌলিক প্রশ্নের একটি সামান্য উত্তর সন্ধান করবো তা শুধু এই প্রাথমিক স্বীকারোক্তি দিয়েই সূচনা করে করা সম্ভব। সহজ করে ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হয় যে আমরা বস্তুতঃ একটাই মূল প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজছি। প্রশ্নটি এক অর্থে স্বতঃসিদ্ধ। বস্তুতঃ জীবনের এই পক্ষপাত ও অজ্ঞতা কেমন করে আরও এক সুবৃহত সৌন্দর্যের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে?

অবশেষে বলতে হয় যে যিনি বৈকুণ্ঠে বিরাজ করছেন তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে শুরু করে আজ ইস্তক্ তার অন্তরনিহিত শৈশব পরিত্যাগ করেননি। এখন পাঠক যদি প্রশ্ন করেন যে এই অদ্ভুত তথ্য লেখক কি প্রক্রিয়ায় নিরূপণ করলেন তবে সন্দিহান ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করতে হয়, বিধাতা যদি শিশুসুলভ না হবেন তো অন্যথায় কেমনতর হবেন? কারণ মনুষ্য সভ্যতায় সম্ভবতঃ শিশুর নির্মল অকপট আনন্দের কোন বিকল্প নেই এবং পাঠকবর্গকে উপরন্তু স্মরণ করিয়ে রাখি যে আনন্দের সংস্পর্শেই বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। তা অন্ততঃ উপনিষদ রচয়িতা উদ্দালক অথবা জার্মান পণ্ডিত ইমানুয়েল কান্ট্ তেমন উল্লেখ করছেন। বিধাতার সেই নিষ্কন্টক শৈশব অথবা আনন্দ—যাকে কান্ট্

'গ্লোরি' বলে অভিহিত করেছিলেন তা রয়েছে সৃষ্টির মূলে এবং এই নিষ্কলঙ্ক ভাবনা ব্যতীত কোন কৃতি, বিশেষ করে সাহিত্যকৃতি, সম্পন্ন দূরে থাক, সূচীত হতে পারে না। এই গ্রন্থে যে প্রবন্ধগুলি সঞ্চয়িত হয়েছে তাতে অন্ততঃপক্ষে এই আনন্দের অহেতুক উপস্থিতি কাঙ্খিত বৈ নয়। বৈকুন্ঠনিবাসী সেই বালকসত্তা, তা তাঁকে যে নামেই ডাকা হোক, তা শ্রীকৃষ্ণই হোক বা সিদ্ধিবিনায়ক হোক, তা অমুক সুরাবর্ণিত আল্লাহ্ হোক বা হহোবহ হোক, বা বেথ্লেহেমবাসী ইহুদি সন্তান খ্রীষ্টই হোক, বা অন্তর্নিহিত সেই গুরুই হোক, সেই আকিঞ্চনপরবশ অপরিনামরূপ কর্তার ভজনা করতঃ এই পুস্তক প্রণয়ন করা সিদ্ধান্ত করলাম।

চতুর্থতঃ, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই হ্রস্বাকৃতি গ্রন্থে যে প্রবন্ধগুলো প্রকাশ করা হয়েছে তার মধ্যে কতকগুলি ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। নামী অনামী বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সেই সব প্রবন্ধগুলো নিরলস লেখন পদ্ধতির অপরিণত ফলশ্রুতি হিসেবে কিয়ৎকাল বিরাজ করেছে এবং পাঠকের অনুসন্ধিৎসু চিত্তের সংশয়লাঘব করেছে। কারণ তাতে কেবলমাত্র অনুৎকর্ষের লক্ষণ প্রতুল বটে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রবন্ধগুলোতে বিশেষতঃ স্টাইলে অপরিণতি লক্ষ্য করে কষ্ট অনুভব করেছি। পাঠক কল্পনা করুন কেমন সেই সত্য যার সংযোজনে অহরহ আনন্দের সংসর্গ পরিলক্ষিত হয়, সুন্দর কৈবল্যের উদ্ভাস ঘটে, এবং বৈঠকখানায় কিংবা উৎসবের দিনে আত্মীয়ের সাক্ষাৎ-তৃপ্তির মতোই, নানা রকম সব উচ্ছ্বাস, আন্দোলন তথা সুখের কোমল সন্দর্ভ রচিত হয়। মানুষের জীবনে যে সখ্যের আনন্দ, ঠিক অনুরূপ এক আনন্দ আমাদের সকল শিল্পের, শৈলীর, সকল উন্মেষের, সকল শিক্ষা এবং সকল কারিগরির কেরামতিতে বারবার ফিরে আসে এবং রোমাঞ্চ করে।

তীর্থপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১

নোয়াম চম্‌স্কির চৈতন্যবিজ্ঞান ও তাঁর বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

এ স্থলে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা নিরস শুষ্ককাষ্ঠ নয়। মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে ভাবতে গেলে যে বিষয়টা সর্বপ্রথম আমাদের উৎসাহিত করে, কিংবা রোমাঞ্চ করে এবং তদুপরি মনে অপার বিস্ময় উদ্রেক করে তা হল এই। অন্যান্য জীব, তথা পশুপক্ষী সবই প্রাণী বটে, সকলেই আহার, নিদ্রা, মৈথুনে মত্ত এবং মানুষও তথৈবচ। কিন্তু উপরন্তু মানুষ এক চিন্তাশীল জীব। অত্যন্ত ক্ষুরধার ও তীক্ষ্ণ তার ইন্দ্রিয়, তার বুদ্ধি তার প্রকৌশল। জীবজগতের অন্তঃশীল স্রোত মনুষ্য সৃষ্টিতে আবির্ভূত হয়েছে এক অনির্বচনীয় উৎক্ষেপণে। বোধহয় জীবনবিজ্ঞান আধুনিককালে এই প্রক্রিয়ার নাম রেখেছে 'ইমারজেন্স্‌' অর্থাৎ 'উন্মেষ'। অনন্য প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে প্রকৃতিতে। এবং প্রকৃতি স্বয়ং নিজেই জানতেন না যে জীবের এত উন্নত, এত জৈবিক, এক মুহূর্তে সৃষ্টি হবে মনুষ্যচৈতন্যের। যাকে বলে বুদ্ধির অথবা বোধের। সরিষার যেমন ফুল, বসন্তের ধ্বজা, নবীন তৃণ বা গুল্মের ক্ষেত্র বিপণন যেমন জমিতে এক অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, যেন কোন অযাচিত অনুল্লিখিত প্রক্রিয়ায়—এমন যার কারণ জানা দূরে থাক, কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত পাওয়া যায় না, তেমন করেই মানুষের এই মগজের বিবর্তন হয়েছিল। এই বোধের উন্মেষ হয়েছিল বলেই প্লেটো মানুষকে 'সকল বিস্ময়ের শ্রেষ্ঠ বিস্ময়' বলে অভিহিত করেছিলেন।

পূর্বপক্ষ, অর্থাৎ এই বিষয়টি নিয়ে পূর্বে যে সব পণ্ডিতরা টীকাটিপ্পনী লিখেছেন, ভাষ্য লিখেছেন, নিবন্ধ রচনা করেছেন তারা কি বলে গেছেন সে প্রসঙ্গে আগে আলোচনা করা দরকার। প্রথমেই, জানতে হবে 'চেতনা' বা মানুষের এই যে 'বোধ' সেটি কি বস্তু? মূলত দুটি দার্শনিক পদ্ধতি আছে—একটি 'বিদ্যার' বা যাকে বলে 'বৈজ্ঞানিক'। দুই 'পরাবিদ্যার' বা যাকে বলা চলে 'অতীন্দ্রিয়তা'। 'বিদ্যা' শব্দটি যেহেতু চোখে দেখা বা অনুভূত জগতের সব ঘটপটাদি বিষয়ক বিদ্যা সেহেতু তাকে 'বৈজ্ঞানিক' আখ্যা দেওয়াটা অসমীচীন নয়। পক্ষান্তরে পরাবিদ্যার ক্ষেত্র হচ্ছে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার—'মন', 'মানস', 'বুদ্ধি', 'চেতনা' এইসব উপকরণ নিয়ে তার কারবার। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান জগৎ সম্পর্কিত বিদ্যা অনুসরণ করেই চর্চিত হয়। অতীন্দ্রিয় অনুসন্ধান কেবলমাত্র মানসিক বিষয়বস্তু নিয়ে ব্যস্ত, সাব্যস্ত।

বিজ্ঞান প্রকৃতির বিদ্যা। অতিন্দ্রীয়তা মানসের বিদ্যা। বিজ্ঞান বস্তুভিত্তিক। অতিন্দ্রীয়তা মন ভিত্তিক। বিজ্ঞানই 'সায়েন্স' অর্থাৎ অন্বেষণের পদ্ধতি, প্রত্যক্ষবিদ্যা। গণিতের সাহায্যে তার চর্চা করা হয়। অতীন্দ্রিয় বিদ্যা 'ট্রান্সেনডেন্ট্', বস্তু অতিক্রম করে তার চর্চার ক্ষেত্র শুরু হয়। জ্ঞেয় বা প্রমিত সত্য অর্জন করার এই দুইটি পদ্ধতি সম্বন্ধে একেবারে স্বচ্ছ ও মৌলিক পার্থক্যটুকু মেনে নিলে এবং সেই পার্থক্যটুকু সম্বন্ধে অবহিত হলেই আমাদের আলোচনা পরবর্তী স্তরে উন্নীত করা সম্ভব।

এ স্থলে, অতঃপর, জানা প্রয়োজন যে এই যে 'চেতনা' বা 'বোধ' তার সম্বন্ধে পণ্ডিতরা কি বলেছেন? প্রাচীনকাল থেকে 'চেতনা'-কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক নয়, বরঞ্চ অতীন্দ্রিয় বিদ্যার উপকরণ হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জ্ঞানকে এ ক্ষেত্রে আলোক কিংবা আভাসের মতো কোন ব্যাপার হিসেবে মনে করা যেতে পারে। আমরা যদি মানুষের এই পাণ্ডিত্যের ইতিহাস পুনর্বিবেচনা করি তাহলে সরাসরি উল্লেখ করতে পারি, প্রথমেই উপনিষদ রচয়িতাদের কথা। সেখানে চেতনার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য তলবকার বা কঠোপনিষদ। অথবা ছান্দোগ্য উপনিষদ। কিন্তু বিশেষ করে ষড়দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্থা পাতঞ্জল ভাষ্য। আপাততঃ অবশ্য প্রাচ্য দর্শন যাক। বরঞ্চ বিবেচ্য পাশ্চাত্য ধর্ম্ম, দর্শন। এক্ষেত্রে অতিন্দ্রীয়তায় বিশ্বাস করে যারা চেতনা প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবশ্যই সক্রেটিস/প্লেটো। প্লেটোর প্রস্থান অনুযায়ী চেতনার উন্মেষ পরলোকে, বা আত্মায় বা প্লেটো যাকে বলছেন 'প্সুখে' তাতে। 'প্সুখে' অর্থাৎ 'আত্মা' বা পক্ষান্তরে 'প্রাণ'—কতকটা পতঞ্জলির মতোই ঠিক। সেই 'প্সুখে' যা আমাদের একমাত্র পরিচয়, একমাত্র আধার, যার বিন্যাসেই জগতের উপর, এই মহাবিশ্বের উপর, আমাদের শরীর, আমাদের দেহ, আমাদের এই দুর্লভ কান্তি, আমাদের স্থান, কাল, পাত্রের স্বরূপ নির্ণীত হয়ে থাকে। আমাদের জ্ঞান অর্জন করার প্রক্রিয়া যেন এই 'আত্মা'র প্রতিদান। শিখা যেমন অগ্নির প্রতিদান, চন্দ্রাভা যেমন সূর্যকিরণের প্রতিদান, পুষ্প যেমন তরুর জৈবিক প্রক্রিয়ার প্রতিদান—চেতনা বা বোধ তেমন আমাদের আত্মা বা মানসের প্রতিদান। আত্মার প্রণোদিত শক্তিতেই আমরা বুদ্ধি প্রয়োগ করি, জগৎ নিরীক্ষণ করি, জগৎ সংসার সম্বন্ধীয় সব জ্ঞান অর্জন করি। তদুপরি এই চেতনার সাহায্যেই (রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন) পান্নাকেই সবুজ বলে চিনি। এই তো গেল অতীন্দ্রিয়বাদী, পরাবিদ্যানুরাগী ঋষি, দ্রষ্টাদের কথা।

পক্ষান্তরে রয়েছে নিরীশ্বরবাদী, অতীন্দ্রিয়তা বর্জনকারি চার্বাকচেলা। অথবা চার্বাকপন্থী না হলেও গম্ভীর নাস্তিক ঋষিরও অভাব নেই। অন্ততঃ পাশ্চাত্য দর্শনের আদিতে রয়েছে এমপিরিকস্। এমপিরিকস্ বটেই। রয়েছে কোপারনিকাস। আর অষ্টাদশ শতকে ডেভিড হিউম। বিশেষ করে হিউম। স্কটল্যাণ্ড নিবাসী এই দ্রষ্টা আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শনের প্রধান পুরুষ। মোদ্দা কথায় এই অপরপক্ষের দার্শনিকরা কোন অতীন্দ্রিয় উৎসে বিশ্বাস করে না। তারা বলে চেতনা নিতান্তই মস্তিষ্কের একটা গুণাগুণবিশেষ। মানুষের চিন্তাশীলতা গোটাটাই জগৎপ্রকৃতির নিয়মানুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়—নির্দ্ধারিত হয় এবং মূলতঃ দু'ভাবে চেতনার গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়। একদিকে যারা চিকিৎসাশাস্ত্রী তারা মনে করেন (১)

শরীরের অন্তর্নিহিত গুণ মস্তিষ্কের ভূমি থেকে চিন্তার উন্মেষ ঘটায়। মানুষকে বিশেষভাবে বুদ্ধিদীপ্ত বা চিন্তাশীল করে তোলে। অতএব শারীরিক বৈশিষ্ট্য বায়ু, পিত্ত ইত্যাদি ও মস্তিষ্কের গঠনবিন্যাস চেতনাকে প্রভাবিত করে। (২) মানুষ নিতান্তই প্রকৃতির সন্তান। প্রাণীজগতের অন্যান্য পশুপক্ষীদের মতোই তার উদ্ভব। এক বিস্ময়কর ভুঁইফোঁড়। শুধু এই পার্থক্যটুকু—মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত চৈতন্য অন্য সব প্রাণীদের থেকে উন্নত, পৃথক।

এবার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন কিসের? না, আসল প্রশ্নের। অতীন্দ্রিয়তার চর্চা তো অনেক হোল। যতদিন মানুষের কল্পনাশক্তি তথা মানুষের অলৌকিকের প্রতি বিশ্বাস, অগাধই হোক বা একপেশে, এমনকি ধরে নেওয়া যাক কুসংস্কারবশতঃ, বহাল থাকবে ততদিন চেতনার একটা অপার্থিব উৎস, উন্মেষ এবং কার্যকারণ বিবেচিত হবেই হবে। মানুষের উৎসে যে দৈবশক্তি, তার হলফনামা নেওয়া আছে। চেতনা কি কেবল স্থূল, মেদ-অস্থি-শোণিতের বিষয় হতে পারে? তবে এই দৃষ্টিভঙ্গি যারা অস্বীকার করবেন, তাদের জন্যেই বর্তমান আলোচনা। কারণ পক্ষান্তরে বিজ্ঞান বলছে চেতনা অস্তিত্বের বাইরের সামগ্রী নয়। এই দেহ থেকেই তার বরকরার। তার বাড়বাড়ন্ত, তার বহিঃপ্রকাশ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মনুষ্য চৈতন্যের স্বরূপ কেমন হবে? প্রাথমিকভাবে, এই একবিংশ শতাব্দীর প্রাক্ মুহূর্তে অন্ততঃ একটি প্রধান তত্ত্ব প্রচলিত। এখানে সেই ধারনার ব্যাখ্যা করা শ্রেয়। মনে করা হয় (১) মস্তিষ্ক এবং শুষুম্না এবং তৎসংশ্লিষ্ট স্নায়ুতন্ত্র হচ্ছে আমাদের সব অনুভূতি ও চিন্তাপ্রক্রিয়ার উৎসস্থল। (২) মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের অভ্যন্তরে বিশেষ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে চেতনার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে (৩) আমাদের চেতনার কিছু স্বকীয় বা স্বয়ংক্রিয় সূত্র আছে এবং (৪) চেতনার যে উন্মেষ তা হয়তো কার্যকারণ অনুসরণ করে সংঘটিত হয় না। পক্ষান্তরে (৫) চেতনাকে আমরা কিছুটা স্বয়ম্ভু বলতে পারি। নিজে থেকে তার উৎপত্তি হয়েছে। নিজে থেকে তা বিলীন হয় এবং তা নিজের অর্থাৎ (কোন) ব্যক্তির—অন্য সকল আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া, ক্রীড়া এমনকি ভাষা ব্যবহার করার (কথা বলার বা লিপিবদ্ধ করার) পদ্ধতিকে সামগ্রিকভাবে নির্ণীত করে। যে কোন বিজ্ঞানসম্মত মানুষের আজ এই সিদ্ধান্তটিই সঠিক বলে মনে হয়—আদতে এটি একটি নিউরোবায়োলজিকাল তত্ত্ব বৈ নয়। রসায়নের কোন নিয়ম অনুসরণ করে চেতনার উদ্ভব হয় তা একদম পুঙ্খানুপুঙ্খ জানা যায় না। ইংরাজি পরিভাষায় 'ফোটো সেনসিটিভ' বলে একটা শব্দ চয়ন করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে সব কোষদল বা স্নায়ু আমাদের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে সাজানো আছে তার মধ্যে একটা বিশেষ দ্রব্যগুণ রয়েছে—একই সঙ্গে এক রাসায়নিক তথাচ জৈবগুণও বটে। যেমন আলোর কণিকা দেখে অনুরক্ত পরমাণু সহাস্যে, সচকিতে অনুরণিত হয়। একটা অতি গভীর রাসায়নিক ভিত্তি থেকে আমরা চেতনার এই উন্মেষকে বিশ্লিষ্ট করে দেখতে পারি। তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অগ্রগতি, প্রকৌশল, অনুবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি মানুষকে মগজের ভিতরটাকে বুঝতে সাহায্য করে এবং করছে। এই প্রেক্ষিতেই আমরা চেতনা ব্যাপারটাকে বুঝতে শুরু করি।

এই প্রবন্ধ লেখার প্রাক্কালে অর্থাৎ যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করে লেখক

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করছে, তখন নোয়াম চম্‌স্কি দুটো অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। চম্‌স্কি একজন মহান পণ্ডিত। পাণ্ডিত্যের অনিয়ন্ত্রিত আতিশয্যে যেমন প্রায়শই ঘটে থাকে। চম্‌স্কির ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে—স্রোতঃস্বিনী স্বততঃই চঞ্চল। চিন্তা কোন দিকে ধাবিত হবে তা বলা মুস্কিল, বিশেষ করে যখন তা অন্য ব্যক্তিবিশেষ, অন্য তর্কপদ্ধতি, অন্য কল্লোলের সংস্পর্শে আসে। চম্‌স্কি যখন অল্পবয়সে, আরও প্রখর উদ্ভাবনী শক্তি নিয়ে লেখালেখি করেছিলেন তখন একরকম লিখেছিলেন নিঃসন্দেহে কিন্তু আরও পরিণত বয়সে, বিশেষ করে ২০০০ থেকে ২০০১ পর্যন্ত এই দু-এক বছরের মধ্যে যেসব লেখালেখি করেছেন তা অবশ্যই তার আগেকার তত্ত্বের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। তবে একেবারে ভিন্ন ভাবলে ভুল হবে। তার তর্কের চেহারা এতটাই পাল্টেছে যে আপাত দৃষ্টিতে তাকে প্রায় ভিন্নতর প্রকাশ বললেই তার সুবিচার করা হয়। এখন এক্ষেত্রে জেনে রাখা প্রয়োজন যে চম্‌স্কির সেই স্বল্পবয়সের পুরাতন প্রবন্ধের সূত্র ধরেই দুটো মূল তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে। এই তত্ত্ব দুটি হল : (১) ঐকিকতাসূত্র। ইংরাজী ভাষায় 'ইউনিফিকেশন' থিওরী ও (২) প্রাকৃতিক ভাষা বা ন্যাচারাল লাঙ্গোয়েজ। বলা বাহুল্য, দুটো তত্ত্বই সোজাসাপ্টা ব্যাপার নয়। প্রায় অদ্ভুত এক আর্ষদৃষ্টির ব্যাপার যা হয়ত চম্‌স্কির লেখনীকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক প্রস্থান হিসেবে পূর্বাপর প্রতিষ্ঠিত করে যাবে। অথচ দুটো ক্ষেত্রেই সেই দৃষ্টির ভিত্তি গড়া হয়েছে বিজ্ঞান থেকে, কোন অলীক, অতীন্দ্রিয় আপ্তবাক্য থেকে নয়।

এই হ্রস্বাকার প্রবন্ধে তত্ত্ব দুটোর সংজ্ঞা নিরূপণ করলাম। প্রথমে আলোচনা করব ঐকিকতাসূত্রের বিষয়ে। চম্‌স্কি খুব সম্ভবতঃ বয়সে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছিলেন। মানে দিনের শেষে যেমন ভাঁড়ার ঘরে গৃহিনী তার তৈজসপত্র গুছিয়ে রাখে—ভোরের পূজাপাঠের সূচনার জন্যে ঠিক তেমন করেই বোধহয় সমগ্র জীবনের পাণ্ডিত্যের ভাঁড়ার গুছিয়ে রাখছিলেন চম্‌স্কি। পূর্বেই বললাম তার বীক্ষার মূল ছিল বিজ্ঞানে, বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে—এ ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য হচ্ছে এই। বিজ্ঞানের নানাবিধ শাখার রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র, জীবনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই বিশ্বপ্রকৃতি, তথা মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ বা নির্দিষ্ট সত্য প্রোথিত আছে। জীবনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই ধরা যাক। জীবনবিজ্ঞানের মূল পূর্বসূত্র হচ্ছে জৈবরসায়ন। রাসায়নিক বা কেমিক্যাল উপাদানের উপস্থিতি বা প্রক্রিয়াকরণ, বা কার্যকারণ সম্পর্কহেতু জীবনের সৃষ্টি ও সমীকরণ, জীবনের উন্মেষ ও অস্তিত্ব, জীবনের স্পন্দন। আবার ধরা যাক ফিজিক্স বা পদার্থবিদ্যার কথা—পদার্থের কোন গুণাগুণ কোন প্রক্রিয়ায় বস্তু বা বস্তুকণা, সৃষ্টির মূলে নিহিত সব শক্তি কণিকার প্রচলনের মধ্যে দিয়ে, প্ররোচন ও সেবনের মধ্যে দিয়ে, ভগবদ্‌গীতায় বর্ণিত মহাকরালি বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মতন এই জগতের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করে চলেছে। অর্থাৎ রসায়ন, জীবনবিজ্ঞান, ফিজিক্স-এর বর্ণনায় প্রকৃতি, জীবন, মানবমন—এই সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটা সৃষ্টির ঐক্যসূত্র আছে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি থেকে ড্যানিয়েল ডেনেট্ কিংবা জেরী ফোডর, এবং প্রসঙ্গত চামার্স, পেনরোজ, প্রত্যেকেই বলছেন যে মস্তিষ্কের জৈবরাসায়নিক গঠনই এ ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়—বস্তুতঃ চেতনার উদ্ভবের জন্য দায়ী। এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে রাখা প্রয়োজন যে চমস্কি এই

তাত্ত্বিক ভিত্তিটাকে গ্রহণ করছেন এবং প্রথমোক্ত যে বিষয়টি উল্লেখ করলাম—অর্থাৎ ঐকিকতাসূত্র, সেই সূত্রের যুক্তি শৃঙ্খলা অনুসরণ করে, বা করলে, আমরা এই এক অটুট সিদ্ধান্তে উপনীত হই। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা দরকার, যে যদিও জৈবরসায়নের এই মস্তিষ্ক নামক ল্যাবরেটরীতে ভৌতিক বিজ্ঞানের সব সূত্রগুলো মিলে মিশে একত্রিত হচ্ছে এবং তৎক্ষণাৎ সেখানে চেতনার উদ্ভব ঘটছে তথাপি সেই চেতনা কোন বিশেষ এক রকম রাসায়নিক বিক্রিয়া নয়। চেতনা, অন্ততঃ ডেনেটের মতে নিঃসন্দেহে, একটা বিশেষ মুহূর্ত, বা একপ্রকার উন্মেষ। রসায়নের কলকব্জায় পরিবর্তন ঘটলেই চেতনার গুণসমূহ বদলে যায়। অর্থাৎ এই মুহূর্তের যে চেতনা, পরমুহূর্তে সেই চেতনার গঠনের থেকে ভিন্ন বটেই। এতৎসত্ত্বেও হয়ত চেতনার একটা সম্ভাবনা মানুষের মগজে সদা উপস্থাপনশীল। একভাবে বা অপরভাবে তার বিকাশ ঘটবে। কিন্তু আবার কেবলমাত্র সময়প্রবাহের কোন মুহূর্তের উপর নির্ভরশীল হয়ে। চেতনার উন্মেষের সম্ভাবনা সদা বর্তমান। এই প্রেক্ষিতে, বলা চলে পাঠক বিচার করবেন যে চেতনার কোন নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা করা যাবে না। কারণ মানুষের বিশ্লেষণী ক্ষমতা তো প্রতিটি মুহূর্তে পাল্টে চলেছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তার একটা আংশিক আভাস পাওয়া যেতে পারে। চেতনা একটা সম্ভাবনা। এই পরিবর্তন ও গঠনশীলতাই মানুষের ধর্ম। উপরন্তু চেতনার দ্বারাই চেতনার এই জটিল উত্তর দেওয়া যেতে পারে অথবা পারে না।

দ্বিতীয় যে সূত্রটির কথা চম্‌স্কি বলছেন, তাকে 'ভাষাপ্রকৃতি'র তত্ত্ব আখ্যা দেওয়া যায়। অত্যন্ত মৌলিক একটি তত্ত্ব—প্রায় অভাবনীয়, অকল্পিত; এবং তত্ত্বটি যদি সত্যি হয় তাহলে কবুল করতে হবে যে মানুষি আবিষ্কারের গৌরবময় ইতিহাসে এই তত্ত্বটি একটি অনন্য সংযোজনের সমতুল্য। ভাষাপ্রকৃতি বলতে আমরা যে টার্মটির তর্জমা করছি তা হোল 'ন্যাচারল ল্যাঙ্গোয়েজ'। ভাষা কাকে বলে---অর্থাৎ ভাষা নামক যে প্রক্রিয়াটি মনুষ্য সমাজে ব্যবহার করা হয় সেটি আদৌ কি ধরণের সংঘটন, কেমনতর তার উৎপত্তি—এবং যেহেতু তার বহিঃপ্রকাশ সম্বন্ধে আমরা সর্ব সময়ে অবগত সেহেতু তার স্বরূপ বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন এতৎ জানা সত্ত্বেও —সেই ভাষার মৌলিক উপকরণগুলো কি হতে পারে। এই হলো 'ভাষাপ্রকৃতি' সম্বন্ধীয় আলোচনার বিষয়বস্তু। ভাষার গঠনগত দিকটি কেমনতর—এবং সেই অর্থে ভাষার সংজ্ঞা কি? চম্‌স্কি এই বিষয়গুলোর অবতারণা করেছেন। এই হ্রস্ব প্রবন্ধে বিশদ ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। এমনকি ভাষাপ্রকৃতির তাত্ত্বিক উৎস নিয়ে পর্যন্ত অপ্রয়োজনীয় অপব্যাখ্যায় লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকলাম। অতঃপর বলা দরকার যে ভাষা চম্‌স্কির মতে একটি প্রাকৃতিক উন্মেষ। কথাটা ততটা সরল নয় এবং এর সরলীকরণ তত্ত্বের বিপর্যয় আহ্বান করে। অতএব ভাষা একটি প্রত্যঙ্গ। পাঠক প্রনিধান করবেন। হাত বা কান যেমন দেহের অঙ্গপ্রতঙ্গ—ঠিক অনুরূপ একটি প্রত্যঙ্গ হচ্ছে ভাষা সম্পদ। ভাষা আক্ষরিক অর্থেই প্রত্যঙ্গ। নিছক দৃষ্টান্ত বা তুলনা করবার জন্য নয়। ভাষাকে একটি অত্যন্ত বিশেষ ধরণের প্রত্যঙ্গ হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন চম্‌স্কি। এই প্রত্যঙ্গটির শারীরিক ভিত্তি রয়েছে মস্তিষ্কে, কর্নে, নাসিকায়, জিহ্বায় এবং ফুসফুস থেকে নিঃসৃত নিঃশ্বাস ও বায়ু রেচনের যন্ত্রে এবং এর বৃহৎ অনুলম্বিত উপঙ্গ রয়েছে শব্দে। উচ্চারণ

প্রক্রিয়ায়, শ্রুত স্বরক্ষেপণে। অর্থাৎ, সমগ্র স্নায়বীয় বোধ প্রক্রিয়া—যাকে প্রসেস অব কনশাসনেস বলতে পারি—তার থেকে ভাষা ব্যবহার করার একটা যোগ্যতা আমরা অর্জন করতে সক্ষম। কেবল মানুষ নয়। এই ক্ষমতা প্রাণীকুলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যেও কম বেশী বর্তমান। শিম্পাঞ্জি বা পাখি—বিশেষ করে আমাদের অতি পরিচিত চন্দনা, ময়না, টিয়া—আরও অনেক অনেক পশুপাখীর ভাষা বা সংকেত সৃষ্টি করা তথা সঞ্চয় করা, প্রক্রিয়াকরণ এবং যোগ্য বোধশক্তির সাহায্যে তা ব্যবহার করবার লক্ষণ অতি সাধারণ একটা ব্যাপার। মানুষের ভাষা এক জৈব শারীরিক স্তর থেকে একটা নিরাকার বা অদৃশ্য ও ব্যবহারযোগ্য অথচ শ্রুতিনিয়ন্ত্রিত রূপ পাচ্ছে। চম্‌স্কির অন্যতম শিষ্য স্টিভেন পিঙ্কার উচ্ছ্বসিত হয়ে বলছেন, ভাষার গঠন কাঠামো হচ্ছে একেবারে হস্তীশুঁড়ের মতন। মাথা থেকে তার উৎপত্তি অথচ দীর্ঘায়িত একটা নিয়ন্ত্রণকারি সুযোগ্য, সুন্দর প্রত্যঙ্গের মতো উদিত। ভাষার এ হেন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপনে চম্‌স্কির জুড়ি মেলা ভার। এখানে ইদানীং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিষয়গুলো একিভূত হচ্ছে বলে পূর্বোক্ত সেই ঐকিকতা সূত্র অনুসরণ করছে বৈকি। জীবনবিজ্ঞান, স্নায়ুবিজ্ঞান বা নিউরোলজি, অ্যানাটমি, লিঙ্গুইসটিক্‌স্, ফিজিক্স, হরমেনিউটিক্‌স্ সব আন্তর্বিষয়ক সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে। ভাষা প্রকৃতির সংজ্ঞার মধ্যেই চম্‌স্কির বর্তমান গবেষণার দুটি মূল বিষয়বস্তু বা প্রতিপাদ্য বিষয় আলোকিত হচ্ছে নিশ্চয়। এক বিজ্ঞানের আন্তর্বিষয়ক বা ইন্টারডিসিপ্লিনারি ঐকিকতাসূত্র। দুই ভাষার শারীরিক অঙ্গবৈশিষ্ট—মানুষের অস্তিত্বে ভাব বিনিময় ও বন্টনের জৈবিক এক উন্মেষ পর্যায়ে আমরা ভাষার মত একটি প্রত্যঙ্গের একটি অতি-ডারউইনীয় আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছি।

২

রিচার্ড ওলহাইমের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে

রিচার্ড ওলহাইমের নাম শুনেছিলাম উত্তর আমেরিকায়। তখন মার্কিন সৈন্যরা বাগদাদ শহরে বিমান হানার সূচনা করছে। অর্থগৃধ্নুতা, বা নৈরাশ্যের প্রতিরূপ আগে কখনও এত কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা ব্রিটিশ অভিনিবেশের জেরে যে নিপীড়নের ইতিহাস সংঘটিত হয়েছিল, কিংবা যে লুঠতরাজ বা অমানবিকতার শিকার হতে হয়েছিল সে সম্পর্কে আমাদের প্রজন্ম শুনেছে মাত্র, কিংবা অধ্যয়ন করেছে। উত্তর আমেরিকায় দেখলাম প্রতিপত্তির কদর্য প্রতিবিম্ব, অর্থের মোহ, কনজিউমার সোসাইটির স্খলিত রূপ, ঐশ্বর্য নিয়ে আস্ফালন আর অন্তঃসারহীনতা, লোভ, লালসা। সড়কে অষ্টাদশ চাক্কার পেল্লায় গাড়ি। তার জন্য চাই জ্বালানি। পেট্রোপণ্যের প্রয়োজনে সামরিক অভিযান। প্রত্যেকটি মার্কিন নাগরিকের চোখে দেখেছিলাম অনৈতিক আক্রোশ, ঘৃণা, উন্মত্ততা। অবশ্য ব্যতিক্রম থাকেই। চার্চ অব গুয়াদালুপেতে জড়ো হয়েছিল অগণিত মানুষ, যুদ্ধের প্রতিবাদে। জননী মেরির স্নেহস্পর্শ। তার স্থির নিঃশব্দ দৃষ্টির সচিত্র আভাস।

রিচার্ড ওলহাইমের বয়স তখন আশির উর্দ্ধে। 'লিজিওন ডি অনর' ডক্টর ব্রেটেলের কাছে জানতে পারলাম—তাও প্রায় আকস্মিক ভাবে—যে ওলহাইম লস্ এঞ্জেলেস-এ তার শেষ গ্রন্থটি লিখতে ব্যস্ত। আমি ইতিমধ্যে তার 'থ্রেড অব লাইফ্' পড়তে শুরু করেছি। অনুপ্রাণিত, এক গভীর মনীষার সে লেখা। বিশ্বের দরবারে ওলহাইম তখনও ততটা পরিচিত নন। সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল একটা ব্যাপার—ওলহাইম দেখলাম মনস্তত্ত্বঃবিদ। তবে সাইকোলজি যদিও তার পেশা তিনি কাব্যচিত্ত সমৃদ্ধ বটে। কারণ তার গ্রন্থের নামকরণে আছে চিত্রশৈলী কিংবা আর্টিস্টের নৈপুণ্য। 'থ্রেড অব লাইফ' অর্থাৎ এই জীবনের সুতোনুটি, সূত্র, জীবনসূত্র। কিন্তু অন্য কিছু নয়। তিনি 'ল' বলতে পারতেন। কিন্তু বললেন থ্রেড, যেমন তাঁতি বা সূত্রধার তার কাঁচামাল নিয়ে কাজ করে। যখন লোভে উন্মত্ত পৃথিবী, কোলাহলে আবিষ্ট, আচ্ছন্ন তখন অনীহাক্লিষ্ট হয়ে বলছেন 'থ্রেড'। একটা রূপকধর্মী শব্দ। 'সুত্‌লি' পাঠককে অজানা রূপকের সূত্রে আকর্ষণ করতে থাকে। গুটিকীটের নৈপুণ্যে সৃষ্ট লাইফ বা জীবন। যুদ্ধের দামামায়, দুঃখ ও মৃত্যুর কণ্ঠরোধ সত্ত্বেও ওলহাইমের বইতে শুনলাম জীবনের অলক্ষিত, ঋজু সুত্‌লির কথা যা জীবনচিত্রের, নক্সায়, অস্তিত্বের আঁধার সরিয়ে বিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটায়।

আজকের এই প্রবন্ধে অন্যান্য বিষয়ের থেকেও ওলহাইমের একটা বিশেষ তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখার প্রচেষ্টা করব। লেখকের চিন্তার পরিণতি খানিকটা এই পথ ধরেই প্রবাহিত হয়ে পড়েছে। অন্ততঃ এ খাতে তার মনস্তত্বঃ বাধা পায়নি। সে তত্ত্বের পারে ভাঙন ধরেনি। পূর্বপক্ষ যদি হয় আধুনিকতা-উত্তর চিন্তা সেক্ষেত্রে ওলহাইমের প্রস্তাবনা বলব মূলত মূলস্রোত নিরপেক্ষ। অন্ততঃ বিরোধী না হলেও পাশ্চাত্যের কাছ থেকে আমরা দুটো ভাবধারা শিক্ষা করেছি। এক, আধুনিকতা ও দুই উত্তর আধুনিকতা। কিন্তু দুটি তর্ক পদ্ধতিকেই উজ্জীবিত করে পশ্চিমের প্লেটোনীও, নতুবা খ্রীষ্টান ভাবস্রোত। ইদানীন্তন যে দার্শনিক তত্ত্ব পশ্চিমের সমাজ ও সমাজবিজ্ঞানে প্রাধান্য পেয়েছে তাতেও রয়েছে যাকে বলা যেতে পারে কৈবল্যবাদ। দীর্ঘ একটা বিষয়কে সংক্ষিপ্ত করে বলতে গেলে তার যুক্তিসম্মত বৈশিষ্ট্যগুলো অনুল্লিখিত থেকে যাবে। তবে প্রকৃত পূর্বপক্ষ অবশ্য অনুধেয়। পাশ্চাত্য দর্শন, এমনকি আধুনিকতার পরবর্তী যুগে খ্রীষ্টীয় মতাদর্শগত দার্শনিক (মার্কস্‌বাদী সমেত), সমাজের বিপ্লবের মধ্যে, জীবনের অন্বয়ের মধ্যে, দেখছি কেবল কৈবল্যের সন্ধান করেছেন। দার্শনিকরা মূলত এক নিরঞ্জন কৈবল্যজ্ঞানের সূত্র আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। যেখানে সত্য বা ট্রুথ্ প্রতীয়মান হয়। বা সত্য উদ্ভাসিত হয়; কোন নিঃসীম আঁধারের ক্ষণিক বিকাশের মধ্যে দিয়ে মানবের একাকিত্বে, নিরালায়, সাধকের চিত্তবৃত্তিতে, সেই দর্শনের চর্চা করা হয়। এই ব্যক্তিগত সাধনার সিদ্ধিলাভেই সার্থক তাদের দর্শন। সার্ত্র, ডেরিডা বেনয়ামিন প্রমুখ এই উদ্ভাসিত সত্যের দর্শনশাস্ত্র রচনা করেছেন।

এখানে অবিশ্যি 'কৈবল্যবাদ' শব্দটির ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কথাটা আমি একটু ব্যক্তিগত ঢঙে ব্যবহার করলাম। যদিও 'কৈবল্য' শব্দটা শাস্ত্রে প্রচলিত তথাপি 'কৈবল্যবাদ' নয়। অন্ততঃ কোন প্রণেতা বা পণ্ডিত নেই যিনি 'কৈবল্য' শব্দটিকে নিয়ে কোন বিস্তারিত প্রস্থান রচনা করেছেন। 'কৈবল্য' শব্দের অর্থ কোন বিশেষ জ্ঞানের উন্মোচন। অথবা বলা যায় কোন বিশেষ বা নির্দিষ্ট বিষয়ে কোন জ্ঞান উন্মোচিত হওয়া, অথবা প্রমিত হওয়া। ধরণীর বুকে যেমন সূর্যোদয় হয় কিংবা নির্বিকার বা অসাফল্য প্রণোদিত, অতি অকিঞ্চিৎকর, মানুষের মনে যেমন বিশেষ কাণ্ডজ্ঞানের উদয় হয়, তেমন করে নয় বরঞ্চ প্রায় অলক্ষে, অনুসন্ধিৎসু মানুষের নানা বিঘ্ন সত্ত্বেও যখন সত্যের উন্মোচন হয়ে থাকে, তখন তাকে কৈবল্য ছাড়া কি বলব? তবে রূপকের আশ্রয় ছেড়ে আরও সোজামাটা কথায় বলতে হয় যে কৈবল্য হচ্ছে কৃপা, সত্যের উন্মোচন। এই উন্মোচন খানিকটা রহস্যময় এক প্রক্রিয়া। মনের সব জানা অজানার প্রক্রিয়া এবং মনের প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হলে মানসপটে যেন এক উত্তর ভেসে ওঠে। যে কোন বিষয়ে তদ্‌বির করতে গেলে সরাসরি কিছু হয়ত জানা যায় না। এমনিতেই মানুষ কতকটা নিরেট। আবার জ্ঞানের পরিধি এতটাই অনন্ত, এতটাই বিস্তৃত বা জটিল যে অর্ধেকের কম প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদের গলদঘর্ম হতে হয়। অথচ আমরা বেঁচে আছি। দিব্যি সব প্রশ্নের, জিজ্ঞাসার সদুত্তর নিজেরাই বানিয়ে নি, ভিয়েন বসিয়ে উপাদেয় করে। তার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা অজ্ঞান, অসত্য, কুসংস্কার বা ভুল জ্ঞানের দ্বারাই সন্তুষ্ট হই। নতুবা, আমাদের চিত্তে, হয়ত ঈশ্বরের পাদপদ্ম দর্শনের মতো, পরম জ্ঞানের কৈবল্যলাভ ঘটে।

এখন ইহুদি বা খ্রীষ্টীয় এবং আমার যতদূর জানা আছে আরবি বা ইসলাম ধর্মমতেও, কৈবল্যজ্ঞানের জ্ঞান একমাত্র সত্যজ্ঞান বা সদ্জ্ঞান বলে বিবেচিত হয়েছে। অর্থাৎ তারা মনে করেন বা 'বিশ্বাস' করেন যে যতক্ষণ না কৈবল্যপ্রাপ্তি হচ্ছে ততক্ষণ বিধাতার কোন জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। তদুপরি তাঁরা বলেন যে প্রাচীনকালের সাধক পয়গম্বরদের মনে সেই কৈবল্য ঘটেছিল। তদুপরি এও তাঁরা মনে করেন যে বাইবেল, তলমুদ, তোরাহ্ বা ভবিষ্যবাণী-সঙ্গত ধর্মগ্রন্থ, বা নিউ টেষ্টামেন্ট, এমনকি পবিত্র আল্-কোরানেও, যে শব্দ লিখিত হয়েছে, যে বাণী বা শ্লোক রচিত হয়েছে তা পাঠ করলেও কৈবল্যলাভ ঘটে। অর্থাৎ শাস্ত্রই হচ্ছে পরম সত্যের, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় যা সত্য বটে তার একমাত্র আধার অর্থাৎ এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেই সত্যের উন্মোচন ঘটে—সেই সত্য যা নিরাকার, যা কল্পনার অতীত, জগৎকে মিথ্যা প্রমাণিত করে, বা আমাদের সংস্কারমুক্ত করে এবং আমাদের ভাব, ভালবাসার সংসারের থেকে, আমাদের পুত্র, কলত্র, আমাদের ঐশ্বর্য, বৈভব, অভাব বা সিদ্ধিলাভের এই মায়ার খেলা থেকে ভিন্ন, কোন অজ্ঞাত বলয়ে বিরাজ করে। এই উন্মোচনের প্রক্রিয়া অতএব আমাদের এমন এক দর্শনের দিকে প্রেরিত করে যেখানে জগৎকে সরাসরি উপেক্ষা করাটাই শ্রেয় পথ হিসেবে পরিগণিত হয়।

এই কেবল্যবাদকে আশ্রয় করেই পাশ্চাত্যদর্শন বারে বারে পুষ্টি লাভ করেছে। বিশেষ করে বিগত দুই শতাব্দী ধরে। যদি আমরা ইংরেজ দার্শনিক কোলরীজ থেকে শুরু করে উত্তর পশ্চিম য়ুরোপের সব পণ্ডিত, বা আফ্রিকা বা আরব/ঈহুদি সব পণ্ডিতবর্গের সত্যান্বেষণ বিষয়ক রচনাগুলোর পূর্ণমূল্যায়ন করি তাহলে দেখব যে কৈবল্যপ্রাপ্ত সত্যের ফলে তাদের সিদ্ধান্তে বিধাতা সত্য জগৎ মিথ্যার মতো একটা প্রবচন তৈরি হয়। তারা প্রায় প্রত্যেকেই মানুষের আটপৌরে সংস্কৃতির কোন তাৎপর্য আছে বলে স্বীকার করছে না। এই কারণেই মূলতঃ মানুষের সাধারণী সংস্কৃতি বা লোকসংস্কৃতির থেকে এই সব দার্শনিকরা দূরে সরে পড়েছেন। তাদের জ্ঞানদর্শন খানিকটা পণ্ডিতের এবং খানিকটা পণ্ডিতমন্যের। জাঁ পল সার্ত্রের কথাই ধরা যাক। সার্ত্রে একে ফরাসী, তাঁর অত্যন্ত খ্রীষ্টীয় ঘেরাটোপের কবলে পর্যবসিত। তাঁর গ্রন্থে সার্ত্রে বলে গেলেন যে গোটা অস্তিত্ব সমান সমান 'নাথিং'। অস্তিত্ব সমান সমান শূন্যতা। অতএব অস্তিত্বের মধ্যে কোন সদুত্তর নেই। অতএব জগৎ মিথ্যা। অতএব কি দিয়েই বা কি হবে। অতএব, এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে খুব সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের মাটিতে ফিরে আসতে হবে। বিশেষ করে আমাদের পৌরাণিক সংস্কৃতিতে—এখানে আর্ট আর সত্যের একাকার, ভাবগম্ভীর, নৈরাশ্যপরবশ কৈবল্যবাদ নয়। হয়ত সংসারের এই অতি পরিচিত ঠাকুর দেবতার সংস্পর্শে, পূজো-আচ্চায়, অর্চনায়, আবাহনে, নিরঞ্জনে—বাঙালীর উৎসবের, পার্বণের মধ্যে যেমন করে থাকে তেমন করেই হয়ত সেই সত্য নিহিত থাকে। কৈবল্যবাদ সম্পর্কে এই সন্দেহবাতিক আমায় একদা প্ররোচিত করে। লোকসংস্কৃতিকে মনে হয়েছিল সত্য ও শাশ্বত। কৈবল্যদর্শন একমাত্র নয়। এই ঐকিক কৈবল্যবাদের বিরুদ্ধেই বর্তমান লেখক প্রতিপক্ষ কিছু বিষয় নিয়ে চর্চা করতে উদ্যত হয়েছিলেন এবং তার প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে আমরা দর্শনে নিরঞ্জনতা বর্জন করব। মানবিক দর্শন মানুষের অস্তিত্বের দর্শন। মানুষের

উৎসবের দর্শন, তার পার্বণের দর্শন। সেই সত্য দর্শনে বিগ্রহের স্থান অপরিহার্য। কেবলমাত্র 'সেল্ফ' নয়, 'এসেন্স' নয়, ডিকনস্ট্রকসান নয়—কেবলমাত্র ডায়ালেক্টিক নয়। কেবল প্রণব নয়। মানব দর্শন এতটাই মূর্ত, দেবাদিদেব অন্তর্যামীর দর্শন, বিগ্রহের দর্শন, শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসৃত লীলা দর্শন। সঙ, ছোউ, কালিনাচ তথা যাত্রার ভাবসম্পন্ন পৌত্তলিক ও আকার সমৃদ্ধ শিল্পের, কলাবৈচিত্রের দর্শন, নতুবা নয়। এই লৌকিক দর্শনই শ্রেষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য। সত্য ইহলোক দর্শনে শশীসম।

স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল, আলোকিত সঘন তার প্রকাশ। শশীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ। শশীমুখি জননী মেরী। এই শশীস্নাত, উজ্জ্বল এক আধুনিক অথচ শ্বাশত, অপাণ্ডিত্যক্লিষ্ট অথচ গুণসম্পন্ন, অব্যক্ত অথচ সর্বগ্রাহ্য এক ভাবধারার দিকে যে দার্শনিক খোঁজ প্রবাহিত হয়েছে তারই প্রতিফলন দেখলাম ওলহাইমের গ্রন্থে। বস্তুতঃ ওলহাইমের থেকে যে শব্দটি আমি গ্রহণ করেছিলাম তা আমি তাঁর রচনা থেকে ধার করেছি মাত্র। সে শব্দে সঞ্চয়ের প্রতিমূল্য প্রায় গোটাটাই আমার চেষ্টা তাই তা ত্রুটিহীন নয় হয়ত। 'থ্রেড অব লাইফ'-এ ওলহাইম যে শব্দটিকে তার প্রচলিত অর্থের বলয় থেকে ভিন্নতর অর্থে ব্যবহার করলেন সেটি মূলতঃ গ্রীক, অর্থাৎ যাবনিক। 'আইকন' কথাটির অর্থ 'বিগ্রহ' বা 'মূর্তি'। কিয়দংশে প্রতিমা। ওলহাইম নব্য শাব্দিকের প্রকোষ্ঠে শব্দসংযোজন করলেন। তাঁর মতে 'আইকোনিসিটি'। ইংরাজী শব্দটির মধ্যে গ্রীক শব্দমূল ও লাতিন প্রত্যয় যুক্ত করে দাড়াঁচ্ছে, বৈগ্রহিকীকরণ বা মূর্তিরূপকতা। কিংবা বলা যায় পৌত্তলিকতা। এই মূর্তি রূপকতা চিত্রকলা বা স্থাপত্যকলার প্রেক্ষিতে এবং বিশেষ করে গ্রীক ও খ্রীষ্টীয় চিত্রশিল্প নতুবা উপাসনার জন্যে অপরিহার্য। হিন্দু সংস্কৃতিতে উপচারবিশেষে বা পৌরাণিকতায় তা অনুধাবন করা যায়। সহজ ভাষায়, আইকনিসিটি কথাটার মানে 'বিগ্রহ অনুবর্তিতা'। আরও সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হয় সমাজ ও ধর্মজীবনে বিগ্রহ বা প্রতিমূর্তি স্থাপনের প্রয়াস বা প্রয়োগ। ধরে নেওয়া যেতে পারে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার কথা। মন্দির স্থাপত্যে বা ভাস্কর্যে, বৌদ্ধ চিত্রকলায়, দেওয়াল অঙ্কনে যেমন দেখা যায়। নিতান্ত চিত্রের প্রতি আনুগত্যে নয়। প্রদর্শন বা উপস্থাপনার সুচারু প্রযত্নে কিংবা মানবিক বিশ্লেষের নিখুঁত বা নিপুণ দৃশ্যকাব্যের তাগিদে যেমনভাবে অন্তর্যামীর অঘটনঘটনপটিয়সী সৃষ্টির প্রকাশ ঘটে।

নানাপ্রকার বিগ্রহ বা মূর্তি ধর্ম ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয়। যেমন শিবের লিঙ্গবিগ্রহ, পটচিত্রে শোভিত লক্ষ্মী বা শ্রী, নতুবা বুদ্ধের ভাস্কর্য কল্পনা। অনার্য সংস্কৃতিতে পরিলক্ষিত হয় নানা ধরনের বৈচিত্র্যময় মূর্তি। মিশর, যাবনিক, রোমান তথা পশ্চিম প্রাচ্যের পৌরাণিক রূপকল্পনা। বিশেষ করে পাঠক হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন জননী ও শিশুর রূপকল্পনা। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে প্রাচীন বাইজ্যানটাইন চিত্রশিল্প থেকে শুরু করে তাঁরা যাকে নবজাগরণ বলেন, সেই চৌদ্দ বা পঞ্চদশ শতকের চিত্রশিল্পে ইতালীয় শিল্পী জত্তু বা সিমাবিউইর গির্জা সজ্জায় দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রতীত। এই আন্তর্জাতিক ধর্মবিশ্বাস ও চিত্রশিল্পে কেবলমাত্র কল্পিত দেবতা বা ইষ্টদেবতার অর্চনা করা হয় এমন নয়। বংশপরম্পরা বা জাতিপরিচয় থেকে উদ্ভূত ধর্মবোধ, পলিনেশীয় বা জুনি বা নাভাহো উপজাতির মানুষ যে পিতৃপুরুষের তর্পণ করেন সেই ধর্মবিশ্বাস জন্ম দিয়েছে পিতৃকল্প বিগ্রহের, ইংরেজিতে

যাকে 'অ্যান্‌সেস্ট্রাল আইকনগ্রাফি' আখ্যা দিতে পারি। কিন্তু খ্রীষ্টীয় বা ইসলামধর্ম আগমনের পরে এই প্রাচীন ধর্ম এবং তার সংশ্লিষ্ট শিল্পকলা আজ নিশ্চিহ্ন। তদুপরি বিজ্ঞানের আবির্ভাবেও নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাশীলতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত। তবুও এ কথা অনস্বীকার্য যে এই বিগ্রহ গড়ার অনুপ্রেরণা মানুষ পেয়ে থাকে তার ভিতর থেকে। অর্থাৎ তার 'মন' থেকে যদি 'মন' বলে কিছু থাকে। পতঞ্জলি তো বলছেন যে 'মন' বলে কিছু আছে বটে। আমাদের এই এক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। এই মনসঞ্চালনেই সৃষ্টি হচ্ছে আর্টের। মনের থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে সংগীতের, স্থাপত্যের, বিগ্রহের। কল্পনাশক্তির এই এক দান এবং তা জীবনের সর্বত্র ব্যাপ্ত। সর্বঘটে এই সৃষ্টিশীলতারই একটা বিশেষ পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। একটি ঘোড়া পড়ে গেলে স্বচেষ্টায় দাঁড়াতে পারে না, কারো সাহায্যে সেটি উত্থিত হয়। এখানে প্রত্যক্ষ করার প্রক্রিয়া আলোচ্য। অর্থাৎ অশ্বপতন হওয়ার একটি বিশেষ এবং সম্যক উপলব্ধি প্রকারান্তরে কিন্তু ভিন্ন তাৎপর্য বহন করতে পারে। আর্টই বলবে যে এটি একটি নিতান্ত কাল্পনিক প্রক্রিয়া। অশ্বপতনের ঘটনাটি যখন কোন ব্যক্তি একটি সৃষ্টিশীল চিন্তার পটে, একটি বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ববোধ সহকারে দেখেন বা উপলব্ধি করেন ঠিক তখনই মানসের কোন অব্যয় গোলকে তা একটি 'আইকন' বা 'বিগ্রহে'র রূপ নিয়ে ভেসে ওঠে। এইভাবে উপলব্ধি করতে গেলে, অশ্বপতনের ঘটনাটির ক্ষেত্রেই যেমন, এক বিশেষ কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয়। উপলব্ধি করার প্রক্রিয়াটি কালক্ষেপের ওপর নির্ভর করে না। অন্তত ঘড়ির কাঁটা যেভাবে ইহলোকের সময় মাপে, সে ভাবে নয়। 'থ্রেড অব লাইফ' বইটিতে ওলহাইম এই পদ্ধতিকেই 'আইকনিক' বা বিগ্রহ কল্পনার উৎস অর্থাৎ মানসিক উৎস, বলে চিহ্নিত করছেন। ওলহাইম সাহেবের এই মন্তব্যটিকেই আমি উল্লেখযোগ্য বলে মনে করেছিলাম। বিশেষ করে ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে যেখানে বিগ্রহের অবমাননা আর ধ্বংস এক বিকট সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। আশ্চর্যের নয় যে ওলহাইমের মতো একজন বিজ্ঞানমনস্ক পণ্ডিত বিগ্রহ কল্পনার এই মানসিক প্রক্রিয়ার চুলচেরা বিশ্লেষণ করবেন। ওলহাইম সাহেবের এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আলোচনা করা শ্রেয়।

ওলহাইমের মতে আইকনিসিটি একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। যে প্রক্রিয়ায় মনের মধ্যে সব ছবি তৈরী হয় তাকে আইকনিসিটি বলে। ওলহাইম সাহেব এটুকুই বলেছেন নতুবা নয়। ধরা যাক আমরা আমাদের চোখ দিয়ে কিছু প্রত্যক্ষ করছি। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক সেই অশ্বপতনের এক বিশেষ দৃশ্য—কোথাও, অর্থাৎ কোন আঁধারে কোন এক বিশেষ ব্যক্তি দেখতে পাচ্ছেন যে একটি ঘোড়া পড়ে যাচ্ছে। ওলহাইম বলছেন যে অশ্বপতনের দৃশ্যটিকে দুরকমভাবে দেখা যায়। ১. অশ্বের পতন ঘটছে বা সোজা বাংলায় ঘোড়াটি পড়ে যাচ্ছে। ২. অশ্বপতন সংক্রান্ত বিবিধ ঘটনাক্রমের একটির বিশেষ উপলব্ধি। প্রথম দৃশ্যটি চলমান ঘটনা প্রবাহের। মনস্তাত্ত্বিক বলবেন যে অশ্বের পতিত হওয়ার ঘটনাটি একটি সাধারণ ঘটনা এবং সেই ঘটনাটিকে পরিপূর্ণ রূপে দেখতে গেলে আমাদের টাইম বা কালের উপর নির্ভর করতে হবে অবশ্যই। এই ঘটনাটির একটি শুরু আছে। তার একটি ক্রমিক বিকাশ আছে এবং তার একটি শেষ আছে। এই প্রথমোক্ত প্রক্রিয়া।

কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত দৃশ্যের বৈশিষ্ট্য কি? বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ঘোড়ার পতনের দৃশ্যটিকে

এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার কোন এক ক্ষণিক মুহূর্তে অনুধাবন করলাম। যেমন দৈবাৎ কিছু ঘটে। যা ঘটে তার কিছুটা ঘটে কারণ তা নিয়তির বিচিত্র শৃঙ্খলায় নির্দিষ্ট ছিল। যেন এমনটা হবে। পাশ্চাত্য পুরাণেই বিদ্যমান ফোবস্। রথারূঢ় সূর্যদেব যখন পূর্বদিগন্ত থেকে ফোবস্ চালিত রথে পৃথিবীর বুকে ধেয়ে আসেন তখন দৈবাৎ কি ফোবস্ আকাশ থেকে জগৎ অভিমুখে পতিত হতে পারেন? এমনটা কি হতে পারে? যদি পারে তবে সেই দৃশ্যের যে চিত্রিতরূপ সেটিই 'আইকনিক' আর্টের মূল কথা। আরও একটা পরিচিত দৃষ্টান্ত দেওয়া শ্রেয়। খ্রীষ্টান শিল্পে যীশুর জন্মগ্রহণের যে আইকন বা বিগ্রহরূপ তার কথা আগে উল্লেখ করেছি। মানবের যে আদি শিকারি রূপ, অস্ত্র হাতে করে প্রায় নৃত্যের মুদ্রায়, উল্লম্ফমান একটা বিশেষ মূর্তি দেখা যায় গ্রীক মৃৎশিল্পে, চিত্রকলায়, বল্লম হাতে ক্রীড়াবিদ্। একই রকম 'আইকনিক' বা মূর্তকল্পনার দৃষ্টান্ত আমেরিকার আদিবাসী গোষ্ঠীদের চিত্রশিল্পে, পাথরের উপর আঁকা সব অসামান্য কারুকৃতিতে। একই বিগ্রহ কল্পনা দেখা যায় বাঙলার মঙ্গলকাব্যে, যেমন কালকেতুর বর্ণনায়। এই যে এক একটা প্রাচীন 'মোটীফ', তা মানুষের সরল জীবনযাপনের এক একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা, এক একটা বিশেষ মুহূর্ত, যা মানুষের অস্তিত্বের একেবারে গোড়ার ব্যাপার—মানুষের প্রজনন আর সংরক্ষণের অপরিহার্য, প্রাকৃতিক সত্য, যা কল্পনার রসদ নিয়ে সংস্কৃতির নক্সি কাঁথায় বিরাজ করছে।

২০০৪ সনে ওল্‌হাইম যেদিন ইংল্যান্ডের একটি কিঞ্চিত নামী হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন সেদিন এই প্রবন্ধটি লেখার সিদ্ধান্ত করেছিলাম। আমি যদি প্রকৃত মানব সন্তান হই তাহলে নিতান্তই বিশ্বের নাগরিক—কোন দেশ বা সম্প্রদায়ের নথিভুক্ত পুরুষবিশেষ নই তো বটেই। বিশ্ব নাগরিক হিসেবে ওলহাইমের কাছ থেকে 'আইকনিসিটি' শব্দটি একটি বিশেষ দান সামগ্রী বা প্রাইজ হিসেবে পেয়েছিলাম। যদিও গ্রীক্, অর্থাৎ যবনীয়, তথাপি শব্দটি মানুষের উদ্ভব, মানুষের ইতিহাস, তার সমাজ, তার শিল্পের একমাত্র সঠিক পরিচায়ক বলে মনে হয়েছে। কারণ ভূবৈজ্ঞানিকের সময়ের নিরিখে দেখলে মনে হয় যে মানুষ গুটি কয়েক পুতুল বা বিগ্রহ নির্মাণ ছাড়া আর বিশেষ কোন কীর্তি সম্পন্ন করতে পারেনি। এই পুতুল গড়ার কাহিনীতেই মানুষের জীবন হয়ত সমৃদ্ধ হয়েছে। কেবলমাত্র পুতুল গড়া নয় অবশ্য। জাগ্রত পুতুল বিগ্রহের চারিপাশে বিন্যস্ত হয়ে থাকে অহেতুক সব কলমকারি, কলকা, আলপনা—লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ। এই অহৈতুকি রূপদানের মধ্যে যে ভাবনা এবং চিন্তাশীলতা লুকিয়ে আছে সেই ভাবনা বা চিন্তাশীলতা নিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। ওলহাইমের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তা করা দরকার।

৩

তিনটি পত্র ঃ

প্রথম পত্র ঃ

প্লেটো ও প্রতীচ্যের আর্ট

প্লেটোর রচনাসমগ্রের বাংলা তর্জমা করা উচিৎ। নচেৎ পাশ্চাত্য ধর্মীয় বা দার্শনিক ভাবনার আধাখাচড়া শিক্ষা করা সম্ভব, সম্যক নয়। পাঠক ভেবে দেখুন (১) প্লেটোর বাণী গ্রীক ও রোমান সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছিল, যার ফলে য়ুরোপের পরবর্তী সভ্যতার ইতিহাসে প্লেটোর স্থান সর্বোচ্চ। (২) প্লেটোর লিখিত সংলাপ নিবন্ধের মধ্যে যে তত্ত্ব উপস্থিত তা সমগ্র পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের (বা যাকে 'পাশ্চাত্য ন্যায়' বলে চিহ্নিত করার অধিকারটুকু প্রয়োগ করতে পারি তার)—একটা অব্যর্থ দিক্‌নির্দেশ করতে সাহায্য করে, এবং বর্তমানেও তা করে চলেছে। (৩) প্লেটোর সংলাপগ্রন্থের যে গুঢ় জ্ঞান তা খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের চিন্তাভাবনাকে আমূল পরিবর্তিত করে। অতএব সূর্য ছাড়া যেমন গ্রহ, উপগ্রহের উপর আলোকপাত সম্ভব নয়, তেমন প্লেটোনীয় তত্ত্ব ছাড়া পাশ্চাত্য খ্রীষ্টীয় দর্শন তথা অধ্যাত্মজ্ঞানের বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা কল্পনীয় পর্যন্ত নয়। এই মূল বক্তব্যটুকু অধিগ্রহণ করে পাশ্চাত্য জগতের ক্লাসিক্যাল শাস্ত্রে আমরা কিঞ্চিৎ মাত্রায় দন্তস্ফুট এবং তদুপরি তার আস্বাদন, করতে পারি। অন্যথায় খ্রীষ্টান পাদ্রীপিতাদের প্রচারিত ন্যায় প্রস্থান, সাধক অগাস্টিনের সাহিত্য, ক্যারোলিঙ্গিয়ান নবজাগরণ বা মানবিকী আর্ট সমূহের যে তাত্ত্বিক মন্ত্রগুপ্তি তা সম্বন্ধে আগাগোড়া কিছুই বোঝা সম্ভবপর নয়। তথাপি কেন য়ুরোপীয় আর্টের বর্তমান দুর্দশা তা বোঝা দুষ্কর। সেহেতু প্লেটোর মূল শিক্ষাকে অস্বীকার করার কি পরিণতি হতে পারে তা একটা ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য বিবেচ্য।

প্রথমেই চক্রবৎ প্রদক্ষিণ করে প্লেটো সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত। উচিত বৈকি, কারণ আদতে প্লেটোর গ্রন্থ সংখ্যা হাতে গোনা হলেও, নিছক প্রতিপাদ্য বা বক্তব্য এত বেশি সংখ্যক, এত প্রতুল ও এতটাই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন যে পাঠকের কাছে তা এক অতলান্ত শাস্ত্রবিশেষ। এ যুগে প্লেটোকে অবশ্যই অতএব শাস্ত্র হিসেবে অভিহিত করা কেবল ন্যায্য নয়, প্রয়োজনীয় বটে। এই প্রবন্ধের প্রয়োজনেও তাই প্লেটোর গ্রন্থসমূহকে

প্লেটোশাস্ত্র বললে অত্যুক্তি করা হয় না। প্লেটো শাস্ত্রের মূল ও একমাত্র সিদ্ধান্তটি অবশ্যই কি হতে পারে—এই প্রসঙ্গটি এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ একটা সূত্র আবিষ্কার করার কথা বলছি। সিদ্ধান্ত বা সূত্র সম্ভবতঃ একই শব্দার্থবোধক কথা। যে সূত্রের সাহায্যে আমাদের প্লেটোনীয় শাস্ত্রের মূল বিষয়ের অন্ততঃ সামগ্রিক না হলেও, একটি বিশেষ অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করতে সক্ষম করে, সেদিকে ইঙ্গিত করবার উদ্দেশ্যে এই প্রয়াস। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে মানুষকে প্রেম প্রীতি ও মানবিক স্নেহপরায়ণতা, তথা বন্ধুবাৎসল্যতা সম্বন্ধে দীক্ষা দিয়েছিলেন প্লেটো। শৃঙ্গারের যে দুটো পৃথক রূপ এক পার্থিব আর অন্য স্বর্গীয়—সে কথাও তিনি প্রথম ব্যাখ্যা করেছিলেন। 'ফেইড্রাস' নামক গ্রন্থে দেখি প্রেম আকাঙ্ক্ষার রূপপ্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে ও অপরপক্ষে দেখি 'সিমপোজিয়াম'-এর পৌরাণিক কল্পবিজ্ঞান যেখানে প্রেমের অধিষ্ঠাতা এরস-এর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত। প্লেটোর তত্ত্বে আজও তার্কিত ভাবিত। কত প্রাচীন শিল্পী, কলাকার, স্থপতি প্লেটোর এই অপার্থিব চিন্তায় বিকশিত হয়েছেন তার যেমন ইয়ত্তা নেই, তেমন পরবর্তীকালের পাঠক বা দর্শকের সৌভাগ্য যে, প্লেটোনীয় শিল্প ঐতিহ্যের সংস্পর্শে প্রতিভাবানেরা দেখি অনুপ্রাণিত হয়ে বারংবার তাদের সৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন অমৃত চিত্রকলা, কাব্য ও নাট্যের পঞ্চত্যে।

আধুনিক দুনিয়ায় প্লেটোর এই তত্ত্বের অভ্যুত্থান ঘটে ফ্লরেন্সের একাডেমিতে। ১৪৩৪ সালে ফ্লরেন্সের রাজপুরুষ ছিলেন লোরেঞ্জো ডি মেডিচি। লোরেঞ্জো চেয়েছিলেন ফ্লরেন্স সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে একটা পীঠস্থান হয়ে উঠুক। গুইকিয়ারডিনি রচিত 'পোর্ট্রেট অব লোরেঞ্জো'তে বর্ণিত হয়েছে যে এই ক্ষমতাবান উচ্চাকাঙ্ক্ষী অথচ শৌখিন লরেঞ্জোর ইচ্ছায় প্রখ্যাত পণ্ডিত ভাসারি গ্রীস তথা দক্ষিণ য়ুরোপের সর্বত্র প্লেটোদর্শনের পুঁথি ও প্রাচীন নথিপত্র সংগ্রহার্থে ভ্রমণ করেছিলেন। লোরেঞ্জোর অনুগ্রহে সেযুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মার্সিলিও ফিচিনো প্লেটোর গ্রন্থ 'সিমপোজিয়াম'-এর অনুবাদ করেন ও একটি দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করেন। ফিচিনোর চেষ্টায় প্লেটোর ব্রাত্যপুরাণ খ্রীস্টীয় তত্ত্বের সঙ্গে একত্রিত হয়। এই পরিণয়-বন্ধনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের অন্যতম প্রতিপাদ্য।

ছাত্রাবস্থায় আমরা ইটালীয় ধর্মযাজক পণ্ডিত মার্সিলিও ফিচিনো পড়বার অবকাশ পাইনি, পাঠক্রমের চাপে তখন আমাদের নাভিশ্বাস। অধিকন্তু ফিচিনোর দুরূহ খ্রীস্টীয় তত্ত্বকে মস্তিষ্কসঙ্গত করাটা তখন কল্পনার অতীত। খ্রীস্টধর্মে প্রেমের যে একটা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এটা নতুন করে বলতে লাগে না। খ্রীস্টীয় প্রেমতত্ত্ব ঈশ্বরের অপত্যস্নেহের কথা প্রচার করেছে। ফিচিনোর অবদান ছিল এইখানেই যে, প্রেমের বাণীকে তিনি এরসের পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যোগ করলেন। খ্রীস্টের প্রেমের বাণীকে তিনি এরস আখ্যায়িত করলেন। আদমের স্খলনের ফলে মানুষের যে মর্ত্যত্ব স্বীকার করতে হয়েছিল, যে পাপবিদ্ধ চিত্তে পরিব্রাজক মানব ঈশ্বরের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা এই প্রেমের পথেই আবার ক'রে অর্জন করা সম্ভব বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আদম দ্বারা যীশুর নিষ্কাম চৈতন্য অর্জন করা সম্ভব হল প্রেমের সরণিতে। এরস-এর কৃপাধন্য হয়ে মানুষ পিতার ভবনে পিতার সখ্যে ফিরে আসতে পারে, প্রতীচ্যের নবজাগরণের

আর্টকে যদি আমরা এই মিশ্র তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করি তাহলে অন্তত প্রবাদপ্রতিম মাইকেল এঞ্জেলো, সান্দ্রো বটিচেলি, এংগ্র তথা মাতিসের ভাস্কর্যে মজে যেতে সমর্থ হই।

এরস-এর এই জাতে ওঠা, আর্টিস্টের কাছে একটা দিক উন্মোচন করে। যেখানে একাদশ ও দ্বাদশ শতকের ছবিতে ধর্মীয় বিষয়বস্তু ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল ফিচিনোর পরবর্তী যুগে গ্রীক্ ও রোমান, প্রাক খ্রীস্টীয় অবশ্যই প্লেটোনীয় বিষয়বস্তুর একটা অনুপ্রবেশ ঘটলো। কোটালের বানের মতো একটা প্রাচীন (নতুন) চিন্তাস্রোত কারু-শিল্পের গতিপ্রকৃতি পাল্টে দিল। চিত্রশিল্প হলো আরও মানবিক। চিত্রের বিষয়বস্তু হলো নিতান্তই মানুষ এবং তার আকুতি—সেই আকুতি বা স্নেহ যা প্লেটোর মতে মানবের শ্রেষ্ঠ মানসিক সম্পদ। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর শিল্পী জটু বা সিমাবিউর ক্যানভাসে তখন কেবল মাডোনা ও তার সন্তান যীশুর প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছে। তার উপর গোটা চিত্রে একটা কঠিন ধর্মভাব। ধর্মের অনুশাসন থেকে সেই ছবিতে এক পলকের নিস্তার নেই। ম্যাডোনার শিরস্ত্রাণের প্রত্যেকটা ভাঁজ সেখানে মেপে মেপে জ্যামিতিক বিন্যাসে আঁকা হয়েছে। কোথাও বা চোখের চাহনিতে বিস্ফোরণ। কোনও সুদূর আত্মিক বলয় থেকে মেরী দৃক্‌পাত করছেন এবং বলা বাহুল্য, সেই দৃষ্টির মর্মন্তুদ ভাব দর্শককে একটা মিষ্টিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে ঠিক। এই অভিজ্ঞতার সম্যক বিশ্লেষণ করা ভার। কবি ডান্টে যেমন বলেছিলেন, ঈশ্বরের অভিলাষেই মানবের শান্তি, সেই সত্যকেই এখানে অনুভব করা যায়। ঈশ্বরের অভিলাষে একাত্ম হলে যেমন ভীতি ও গভীর প্রশান্তি লাভ করা হয় ম্যাডোনার এই চক্ষু উন্মীলনে সেই ভীতি ও প্রশান্তির সংকেত। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে আঁকা জটুর-ই ফ্রেস্কোতে মানব-মানবীদের অবয়বে কিছুটা গতিপ্রকৃতি এসেছে। পেইন্টিং-এর গুণ এখানে বেশ কিছুটা বাস্তবিক, নমনীয়। নিহত যীশুর জন্য মেরীর যে ক্রন্দনবিলাপ, তাতে ধর্মীয় কঠোরতার জায়গায় মানুষি আচরণের ইঙ্গিত। এই গতিসঞ্চালন, আর্টের ক্ষেত্রে, সে যুগের একটা বড় প্রাপ্তি। এখানে গাম্ভীর্য আর অনুশাসনের কড়া পাহারা ভেঙে একটা নতুন ট্রাডিশন পরিকল্পনা করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে পঞ্চদশ শতকের নবজাগরণে দেখি বটিচেলির চিত্রশিল্প। উল্লেখ্য বটিচেলির 'ভিনাস'। রোমান পৌরানিক কাহিনীতে 'ভিনাস' হচ্ছেন সেই প্রাচীন গ্রীক দেবী অ্যাফ্রোডিটি যিনি উপরিউক্ত অর্থে প্রকৃতই মানবিক। তার সারাটা শরীরে লালিত্য। কটিদেশ ঈষৎ বাঁকানো। খয়েরি কেশরাশি দেবীর পিঠ বেয়ে নেমে এসেছে কোমলাঙ্গের উপর। ডান হাত মৃদু সঞ্চালনে কুচযুগলে গচ্ছিত। দেবীর ডান ও বাঁ-পাশে উর্বশী কিংবা অপ্সরা। সমুদ্রের তটে ভিনাস এক বিশাল ঝিনুকের উপর দণ্ডায়মানা। তার চারপাশে পুষ্পবৃষ্টি করা হয়েছে। বটিচেলির মহৎ কীর্তি বোধহয় ভিনাসের এক্সপ্রেশন। তার তাকিয়ে থাকার মধ্যে মিশ্রভাব, কতকটা কটাক্ষ কতকটা সচেতনতা, কতকটা কামিনী-মোহ আবার একটা দৈব ভাব। 'ভিনাসের জন্ম' নামের ছবিতে আবার একটা উৎসব-মুখরতা রয়েছে। ভিনাসের জন্মবৃত্তান্ত যে সততই একটা অলৌকিক ঘটনা তা ছবিতে প্রতিভাত। ভিনাসের প্রতিকৃতি যে দর্শকের ইন্দ্রিয়সমূহকে আরও অনুরক্ত করে রাখে তা বোধ হয় তিশিয়ানের 'ভিনাস অফ ইউরবিনা'তে প্রকট। চিত্রী তিশিয়ান তার লাস্যময়ী 'ভিনাস'কে এঁকেছিলেন ১৫৩৮

খ্রীস্টাব্দে ইয়ুরবিনোর ডিউকের জন্য। ক্যানভাসে ডিটেইলের কাজ চমকপ্রদ। যখন তিশিয়ানের ছবি প্রথম দেখি তখন ভিনাসের দৃষ্টিতে শৃঙ্গারের ব্যাসকূট ও স্নিগ্ধ সরলতা একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করি। এই ভিনাসের কটিদেশ কিঞ্চিৎ স্ফীত। অনেকটা গথিক চিত্রশিল্পের নারীর মতো। ভিনাস যে এখানে শায়িত আছেন, তার মধ্যে সাধারণ মানবীর দেহাকৃতি! গ্রীক ভাস্কর্যের যে দৈহিক গঠন সেই মার্জিত অঙ্গ সৌষ্ঠব এখানে পাওয়া যাবে না। মেদবহুল এবং গতিপ্রকৃতিতে ফরাসী চিত্রকর রেঁনোয়ার আনমোনা ভিনাসের প্রাথমিক। তিশিয়ানের ভিনাস তার ডান হাতে একগুচ্ছ সুরভিত ফুল ধরে আছেন এবং অন্য হাত তার লজ্জানিবারণরত। যে ভিনাসকে মর্ত্যলোকের অধিবাসী বলে জানা ছিল সেই ভিনাসকেই তিশিয়ান অমর্ত্য আর্টে চিত্রায়িত করেছেন।

কিন্তু প্লেটোতত্ত্বের যে দ্বিচারি ভিনাস, যার সংসর্গে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রেমই নয় বরং ইন্দ্রিয়ের অতীত কোন অলৌকিক প্রেম বা আর্তিকে মূর্তিত করা হয়ে থাকে, সেই আর্টের নজির পাওয়া যায় পরবর্তী কয়েকটা ছবিতে। বোধ হয় পরম মনোগ্রাহী ছবি ইন্‌গ্রসের 'ভিনাস'। কিঞ্চিত দীর্ঘায়িত শরীর। ভিনাসের পৃষ্ঠ ও কোটির এক নমনীয় চিত্রণ। এ ছবিতেই পাশ্চাত্য আর্টের তাত্ত্বিক প্যারাডক্স প্রকাশ পেয়েছে। কারণ যদিও ভিনাসের সৌষ্ঠব এবং গতিশীলতা দর্শকের রোমাঞ্চ করে দেবীর মাথায় জরি করা বস্ত্র পাগড়ির মতো করে বাঁধা। দর্শক ভিনাসের কপালে ও শিরস্ত্রাণে ম্যাডোনার ইঙ্গিত প্রণিধান করবেন। এই ছবির উর্ধ্বাঙ্গে চিত্‌প্রকর্ষ ঘটেছে। ট্রাডিশনের অন্তঃশীলা স্রোতে এখানে অনুভূতি ও তত্ত্ব একাকার। ফিচিনোর এরস-তত্ত্বে যে সমন্বয়সাধন করা গেছিল ইনগ্রসের ভিনাস তার ধ্বনিতে বাঙ্ময়। গোটা দেহসৌষ্ঠব এখানে চিত্রশিল্পীর ফর্মের কাছে পরাজিত।

নবজাগরণের ঝটিকা বয়ে গেলেও প্লেটোর বাণী কবি শিল্পীরা বারবার উচ্চারণ করেছেন। কেবল পৌরাণিক শান-শৌকত বজায় রাখবার জন্য নয়, প্লেটোর তত্ত্বে তথা গ্রীক শিল্পকলার ভাবনাকে কবি কিংবা ছবি-আঁকিয়ে বারবার তার ভাবের ঘরের সামগ্রী বলে মেনেছেন। কীট্‌সের কল্পনায় সেই দীপ্যমান সাধনা পরিপ্লুত। কবি এই বিরহ উচাটন সম্বন্ধে বলছেন যে, তিনি অন্তরে এরসের আগমনের জন্য একটা মন্দির নির্মাণ করে দেবেন—সেখানে দখিনা বাতাস, নির্ঝর, পাখি, অলিদল প্রতীক্ষা করবেন :

'And there shall be for thee
All soft delight
That shadowy thought can win,
A bright torch, and a casement at night.
To let the warm love in ...'

দ্বিতীয় পত্র ঃ

লেওকোনয়কে উদ্দিষ্ট হরেসের 'ওড'

নির্মাল্যবাবু ক্লাসিকাল সাহিত্যের উপর লেখার জন্যে আমায় ফরমায়েস করেছেন। আমি কবুল করলাম যে আমার কোন প্রাচীন ভাষা জানা নেই। তথাপি আমার পাণ্ডিত্য আক্ষরিকার্থ। কারণ যেহেতু যিনি পণ্ড করেন তিনিই পণ্ডিত সেহেতু আমি প্রকৃতই পণ্ডিতবর্গের পংক্তিভাজন। অন্তত ক্লাসিকাল আর্টের রূপরেখা যারা ক্ষণিকের জন্য হলেও পর্যবেক্ষণ করেছেন তারা তার পারফেকশন সম্বন্ধে কিছুটা অবহিত। ক্লাসিকাল সাহিত্যের নিসর্গ আত্মিক এবং আভাসপ্রাপ্ত। তাতে কোথাও ছেদ নেই, বাহুল্য নেই। পাঠক প্র্যাক্সিটেলেস নামক প্রাচীন গ্রীক ভাস্করের 'ভিনাস' মূর্তিটির কোন প্রতিচ্ছবি কল্পনা করবেন এবং আমার কথার সারমর্ম প্রণিধান করবেন। ভিনাসের অঙ্গসঞ্চালন সেখানে একটা স্থিরতা লাভ করেছে। আমাদের ধারণা হয় যেন এই আর্ট স্বতঃতই পারফেকশনের আর্ট। ভাস্করের কল্পনায় এখানে নিখুঁত পরিমাপ। বলা চলে নির্মম, শীতল পরিমিতিবোধ। এ হেন অপার্থিব সৌন্দর্যের প্রেক্ষিতে ক্লাসিকাল আর্টের সংক্ষিপ্তসার পণ্ডশ্রমে পর্যবসিত হবে এই অকপট ভাবনা আমায় নির্মাল্যবাবুর আমন্ত্রণ রক্ষা করার পথে বাধা হয়েছিল। অবশ্য আজ বলতে দ্বিধা নেই যে আমি যে অভয়প্রাপ্ত হয়ে ক্লাসিকাল সাহিত্য চর্চা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি তা আমার শিক্ষক শ্রীঅরুনকুমার দাশগুপ্ত মহাশয়ের চিন্তা অনুসরণ করে সম্ভব হয়েছে। ক্লাসিকাল সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে বিশালকায়। আমার চেষ্টা অন্যত্র প্রবাহিত, কিছুটা আমার শিক্ষকের শিক্ষণরীতি অনুসৃত। ক্লাসিকাল কথাটার যে একটা গভীর তাৎপর্য আছে সেটুকু আলোচনা করাটাই আমার আপাততঃ আয়াশলভ্য এবং যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে। আজকের সাহিত্য পাঠক নিশ্চয়ই রোমান কবি হরেস-এর নাম শুনে থাকবেন এবং তার ওডগুলি পড়ে থাকবেন। আমি হরেস-এর একটা ওডের থেকে কয়েকটা পংক্তি উদ্ধৃত করে ধ্রুপদী সাহিত্যের আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

হরেস ছিলেন প্রাজ্ঞ এবং তাঁর কবিতা নিতান্ত প্রতিভাপ্ররোহ নয়। তিনি তাঁর জীবনের এমন সময়ে এই ওডটি লিখেছেন যখন অন্তত এটুকু স্পষ্ট যে তাঁর প্রজ্ঞা তাঁর সমস্ত রচনাকে একটা সরল স্বচ্ছতায় বিকীর্ণ করে। ধ্রুপদী সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি তা অবশ্যই এই স্বচ্ছতা প্রকাশ করবার প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। পাঠকের বোধ হবে যে কবির কল্পনা, পূর্বোল্লিখিত প্র্যাক্সিটেলেসের স্থাপত্যকলার মতন, আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে।

পূর্বপ্রসঙ্গে আমি যে ভিনাসমূর্তির অপার্থিবতার কথা বলেছিলুম সেটা এক্ষেত্রে, অর্থাৎ কবিতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হরেস তার কাব্য নির্দেশ করছেন এক শোকার্তা, মৃত্যুর প্রতি আসন্নমানা এক বৃদ্ধার প্রতি। তাঁর নাম লেওকোনয়। লেওকোনয়কে হরেস তার জ্ঞানের ঝুলি থেকে দু'টো কথা উদ্ধার করে অভয় দিচ্ছেন : "দুম লোকুইমার, ফিউগেরিত ইনভিদা/আয়েতাস..."

অর্থাৎ, ওহে লেওকোনয় আমরা যে দু'টো কথা বলার অবকাশ পেয়েছি, সেই কয়েক পলের পরিসরেও ছলনাময়ী কাল অতিবাহন করেছে। অর্থাৎ কাল তার স্রোত অব্যাহত রেখেছে। আমাদের জীবনটা যেন ফুৎকারে কেটে যায় নিঃশব্দ চঞ্চল পদচারণায়। কাল ছলনা করে। আমাদের স্থিতি বা বেঁচে থাকার জাড্যকে সে কেবল নাশ করবার মতলব করে। এই সামান্য প্রস্তাব দিয়ে হরেস তার কাব্য শুরু করছেন। অথচ এই সরল বক্তব্য ছাপিয়ে তার বাক্যের অনায়াস চারণে একটা অলঙ্কার শোভা পাচ্ছে। কালকে এখানে পলাতকা নারীর সঙ্গে পরোক্ষ তুলনায় পরিণয় দেওয়া হয়েছে। এই আলাপচারিতা থেকে শুরু করেই হরেস তাঁর কাব্যের একটা মহৎগুণকে আমাদের কাছে প্রকাশ করছেন। তাকে এক কথায় বলা চলে সরলতা।

রোমান সাহিত্য আমার লাতিন ভাষায় শিক্ষা করা হয়নি। তবে মাষ্টারমশাই, শ্রীঅরুণ দাশগুপ্ত হরেসের এই ওড কবিতাটি বরাবর লাতিন ভাষা থেকে অনুবাদ করে পড়িয়েছিলেন। লাতিন ভাষাটি ছিল সুললিত, তরল স্ফটিকের মতন ধ্বনিত। জলপ্রপাতের জলকণা যেমন বিচ্ছুরিত হয় তেমন লাতিন স্বরপ্রক্ষেপের। লাতিনের মধুর বাচনের সঙ্গে ধ্রুপদী সাহিত্যের যোগাযোগ নিবিড়, বাক্যের যে মুহূর্তে জন্ম হয় তাতে শব্দ ও অর্থের কোন ভেদ থাকে না। একই সৃষ্টির নিয়মে শব্দ ও অর্থ সম্পৃক্ত হয়ে কবিতায় তার কৈবল্য লাভ করে। হরেসের লাতিন ওডগুলো সৃষ্টির এই নিয়মের সাক্ষী। কবির চিন্তা যদি এ ক্ষেত্রে স্ফটিক কিংবা মিনে করা বেলজিয়ান কাঁচের মতন তবে লাতিন সেখানে কণিকার মতন। ধ্রুপদী সাহিত্যের এই স্বচ্ছ সরলতা প্রত্যক্ষ করতে আমাদের বেশীদূর এগোবার দরকার পড়ে না। কারণ রবীন্দ্রনাথের পদ্যও এই সরল স্বচ্ছন্দ ভাষার পরাকাষ্ঠা। শব্দের বিক্ষেপকে রবীন্দ্রনাথ এমন করে সাজিয়েছেন যে তা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাপর এক বিশেষ রণন, ছন্দে সঞ্চারিত হতে থাকে। এই ছন্দময়তা যে কোন ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের একটা অপরিহার্য অলঙ্কার।

ওই দ্বিতীয় লাইনেই যেখানে কালের অমোঘ যাত্রার কথা হরেস স্মরণ করিয়েছেন তার অব্যবহিত পরেই বলা হয়েছে : "... কার্পে দিয়েম এত মিনিমুম ক্রেদুলা/পোসতেরো।" অর্থাৎ হে লেওকোনয় সময়ের সদ্ব্যবহার কর এবং আসন্ন দিনটিকে মোটেই বিশ্বাস কোরো না, কারণ কাল মহাপ্রতারক। কালের যাত্রায় আমাদের ঠুনকো অস্তিত্বের কতখানি তার সম্যক পূর্ণতা পাবে তা কেউ বলতে পারে না। অতএব 'কার্পে দিয়েম'। কাল যদি রমণী হন তো এ বেলা তার বস্ত্র টেনে ধরো। প্রকৃতপক্ষে এই উক্তিটির মধ্যে হরেসের দার্শনিকতার কয়েকটা দ্বিপাক্ষিক দিক প্রকাশিত হচ্ছে। হরেস, কথিত আছে, অল্প বয়সে পণ্ডিত নিওটলেমাসের শিক্ষায়তনে দর্শনের বাদবিতন্ডা শুনতে যেতেন। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের

প্রথম পাদে নিওটলেমাসের আখড়ায় তখন দুই দল তার্কিকের মধ্যে আলোচনা হত। এক হাতে ছিল অ্যারিসটটেল পন্থীরা এবং অপর হাতে ছিল এপিকিউরিয়সের ছাত্রেরা। এপিকিউরিয়সের জীবনদর্শন ছিল লোকায়ত। চার্বাকের সঙ্গে এই গ্রীক দ্রষ্টার কোথায় সাদৃশ্য ছিল তার বিশদ ব্যাখ্যা না করলেও বলা চলে যে এপিকিউরিয়স সর্বদাই জীবন ধারণ করবার কাজটাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেছিলেন। তিনি প্রচার করেছিলেন যে মানুষের পক্ষে আতারাক্ষিয়া, অর্থাৎ, একটা শান্ত সমাহিত ভাবকেই মানসের চরম প্রাপ্তি হিসেবে মেনে নিতে হবে। হরেস তার কাব্যে যখন সময়ের করপুট থেকে জীবনের ন্যায্য পাওনাটুকু আদায় করবার উপদেশ দিচ্ছেন তখন এপিকিউরিয়সের এই ভাবনাটাই সাহিত্যপাঠকের মনে প্রকট হয়ে আসে। অবশ্য হরেস-এর এই আত্মপক্ষ সমর্থন তার ধ্রুপদী রচনার গৌণ উপকরণ। কবির একমাত্র লক্ষ্য জীবনকে সুচারু করে গড়ে তোলা। তাঁর মতে আমাদের বিভূতি লাভ হয় যখন আমরা অবিচলিত চিত্তে আত্মস্থ শান্ত দিনযাপন করার কোন প্রেরণা অনুভব করতে সক্ষম হই। এই অবিচলিত আত্মসমাহিত ভাবসম্পদ যেমন এপিকিউরীয় মতে মানুষের সৌভাগ্যের ভাঁড়ারে ষোল আনা প্রাপ্তি তেমন তার একমাত্র ও অনন্য মুক্তিমার্গ। হরেস তাই লেওকোনয়কে বলছেন : "...সাপিয়াস, ভিনা লোকোয়েস/এতস্পাতিও রেভি স্পেন লঙ্গুম রেসেসেস।"

অর্থাৎ, শান্ত হও, প্রকৃত জ্ঞানের, শান্তির অন্বেষণ কর। যে শব্দ ব্যুৎপত্তির মূল থেকে আমরা 'সাপিয়াস' শব্দটা পাই 'সেপিয়েনস' কথাটাও সেই তাৎপর্য বহন করে। ইতালীয় নবজাগরণের সময় তখনকার পন্ডিতদের কাছে 'সেপিয়েনজা' ছিল মন্ত্রগুপ্তি, অর্থাৎ 'জ্ঞান'। প্রকৃত সত্যানুসন্ধানীকে এই জ্ঞান অর্জন করতে হতো। অনুসন্ধিৎসুর কাছে অগ্রগণ্য ছিল সিয়েনজা কিংবা বাংলায় যাকে বলতে পারি 'বিজ্ঞান'। তবে বৈজ্ঞানিকের শেষ দিগন্তেও বোধ হয় পক্ষান্তরে সেপিয়েনজার আকাশ পরিলক্ষিত হত, নক্ষত্র খচিত, ইন্দ্রনীল, শীতল। বলাবাহুল্য যে ষোড়শ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজন্যস্নেহধন্য পন্ডিতের এই আদর্শ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানুষি বিদ্যাচর্চার অঙ্গনে ছাত্রের একনিষ্ঠ অধ্যয়নের এই একমাত্র লক্ষ্য হরেস-এর পদাঙ্কচারণ বলেই বিবেচিত হত। যুগে যুগে ধ্রুপদি বা ক্লাসিসিষ্ট তার কাব্যচর্চার মধ্যে যে নৈপুণ্য অর্জন করতে পেরেছিল তা তাঁকে বেচে থাকতে সাহায্য করেছে। এবং সে সম্পর্কেই কবিতায় হরেস তার শ্রোতৃ লেওকোনয়কে আজ্ঞা করছেন। তাকে ভাবতে বলছেন। আশা নিয়ে অপেক্ষা করা বৃথা, যে সময়টুকু হাতে অবশিষ্ট তার মধ্যে আনন্দ করে নাও। পাত্রে মদিরা নাও। 'তু নে কোয়েসেরিস...।' গনৎকারকে জিজ্ঞেস কোর না কারণ তাতে লাভ নেই। দেবরাজ জুপিটার মানুষের জন্য ঠিক কতগুলো দিন ধার্য করে রেখেছেন তা কে বলতে পারে। স্বর্গের দেবতারা হয়ত এই মুহূর্তেই আমাদের জীবন অবসানের পরিকল্পনা করে রেখেছেন। হয়ত তিরহেনিয়মের জলোচ্ছ্বাসের মতন, প্রস্তরবক্ষে লহরীর ভাঙন ও বিক্ষিপ্ততার মতন আমাদের ক্ষণিকের অস্তিত্বকে নির্বাপিত করার ছক অঙ্কন করে রেখেছেন। লেওকোনয়কে হরেস বলছেন যে দুঃখের, শোকের দায়ভারটুকু আমাদের সহ্য করতে হবে। এই দুঃখকে উপেক্ষা করে কঠোর হাতে কালের প্রহরীকে নিরস্ত করতে হবে। আনন্দের মদিরা পান করো। যে আনন্দ শাশ্বত তাকে গ্রহণ করাটাই শ্রেয়।

হরেসের কাব্যে আমরা প্রাচীনের মন্দ্রকণ্ঠস্বর শুনেছি বটে তবে যে দুঃখময় অনুভবের মোকাবিলা করবার জন্য হরেস তাঁর কবিতায় উদ্যত হয়েছেন তাতে চটুলতা বা কথ্য ভাষার একটা সহজাত ভাব বজায় রয়েছে। এখানে কবি তাঁর ভাবের ঘর থেকে নেমে এসেছেন লোকালয়ে। তাঁর কবিতায় একটা নাটকীয়তা আছে—যাকে বলা যায় সরল দিনযাপনের নাটকীয়তা। মেকি কথোপকথন বা হাল্কা বক্তব্যের পংক্তি রয়েছে কিন্তু মেকি ভাববহুলতা নেই। হরেসের ধ্রুপদী জীবনদর্শনের প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর এক চিঠিতে যা আজ সাহিত্যের দরবারে আর্স পোয়েটিকা নামে চিরায়ত খ্যাতির স্থান পেয়েছে। তাঁর ছাত্রদের হরেস কবিতা লেখার নিয়মবিধি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। এখানেও সেই একই সৃজ্যমান ঢঙ। প্রধান বক্তব্য একটাই। কাব্যে পরিশীলতা বা পরিমিতিবোধ বজায় রাখতে হবে। এই পরিশীলতা সম্ভবত রোমানদের সেই বৃহৎ ধ্রুপদী জীবনচর্চার নামান্তর মাত্র। তবে এই পরিশীলতাই যে একমাত্র কাম্য সে কথাই হরেসের ওডে বারবার ফিরে এসেছে। লেওকোনয়কে লেখা কটা কথাতেও সেই ধ্রুপদী বোধ সর্বত্র কাজ করছে।

হরেস যে কাব্যবিধির নিয়ম লঙ্ঘন করার ধৃষ্টতা করেননি তার কারণ তার মানসিকতায় ব্যাপারটা একটা মহৎ স্থান অধিকার করেছিল। যে আচরণবিধি বা সংস্কৃতিবান আর্টের চৈতন্য তাকে অপরের সঙ্গে সহজ ভাববিনিময় করতে প্রবৃত্ত করত সেই আচরণবিধিকেই তিনি কাব্যের আদর্শ বলে উল্লেখ করেছেন। হরেসের কাব্যের মাধ্যমেই আমরা এই প্রত্যয়ে ফিরে আসি যে উঁচু দরের আর্ট মানুষকে রুচিশীল ও সরল জীবনযাপনের চৌকাঠে উপস্থিত করে।

তর্জমা

এই কথা বলার অবসরে ছলনাময়ী কাল হয়ত পলায়ন করেছে। এই দিনরজনীর আঁচলখানি টেনে ধর, আগামী দিনটিকে বিশ্বাস কোরো না। জিজ্ঞাসা কোরো না কতটুকু আয়ু তোমাকে বা আমাকে দেবতারা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। বেবিলনের গনৎকারের কাছে উপদেশ গ্রহণ করতে যেয়ো না। দুঃখকে সহন করতে শেখো। নচেৎ তিরেনিয়মের তরঙ্গে নিজেকে নিক্ষিপ্ত কর। জ্ঞান অন্বেষণ কর। পাত্রে মদিরা নাও। যে কটা দিন হাতে আছে সেটুকু উপভোগ কর। ছোট জীবনটুকু বড় আশাকে উপেক্ষা করুক।

তৃতীয় পত্র ঃ

তোমার সৃষ্টির পথ

'তোমার সৃষ্টির পথ' লেখা হয়েছে ৩০ জুলাই ১৯৪১। এ কবিতা যেটি জোড়াসাঁকোতে লেখা হয়েছে, সকাল সাড়ে ন'টায়, সেকথাও শেষে উল্লেখ করা আছে। রবীন্দ্রনাথের এইটেই শেষ লেখা কিনা সেটা আমার সঠিক জানা নেই। আপাততঃ ধরে নিচ্ছি, যেহেতু কবিতাটি সঞ্চয়িতা সংকলনের একেবারে শেষে স্থান পাচ্ছে, এটাই কবির শেষ কবিতা। মৃত্যুর কিছু আগে লিখিত। তবে তাঁর সারা জীবনের রচনায় যে আনন্দের উপাসনা তিনি করেছেন এ কবিতায় সেই একই চিন্তার নৃত্য, এই যে চোখে দেখা সমস্ত কিছুর রূপ পাল্টে যাচ্ছে এর মধ্যেও যে একটা অলৌকিক সুন্দর কিছু উপস্থিত থাকতে পারে এটা 'তোমার সৃষ্টির পথ' কবিতায় আরেকবার উচ্চারিত। তবে তাঁর জীবনের শেষপ্রান্তে এসে লেখা, যেহেতু এ কবিতায় তাঁর মানসের সমস্ত প্রশ্ন কোন অনন্ত উত্তরের দিগন্তে বিকীর্ণ হয়েছে, সেহেতু এ কবিতার মূল্য অন্য রকমের।

আমি যদি পাশ্চাত্য সাহিত্য পাঠকের সমালোচনা করার পদ্ধতি গ্রহণ করি তাহলে বলতে হয় যে 'তোমার সৃষ্টির পথ' কবিতাটায় এক রকমের ডায়ালেক্‌টিকাল চিন্তার অবতারণা করা হয়েছে অর্থাৎ কবিতার বিষয়-প্রসঙ্গে কবি একরকম অভিজ্ঞতার ভিত থেকে তার নির্মাণ শুরু করছেন আবার তার বিপ্রতীপ একটা চিন্তা টেনে আনছেন। এই দ্বন্দ্বের উপর নির্ভর করেই কবিতাটার বুনোট। কবির ভিতরে পার্থিব অভিজ্ঞতার যে বিষাদ তার কাছে তিনি হার মানবেন না। তিনি এই বিষাদের, এই স্খলন আর বেঁচে থাকার যে ক্রাইসিস, সেটা সম্পূর্ণ দেখছেন, সেটাকে তার বিরাট চেহারায় উপলব্ধি করছেন, কিন্তু সেটাই যে সত্যি নয়, তা যে ছলনা, তথাপি তা যে অন্য কোন ঋজু সত্যের ক্ষণিক বহিঃপ্রকাশ, সেই প্রত্যয়ে নিশ্চল থাকার চেষ্টা করছেন, এটাই এ কবিতার চিন্তার গঠন।

আমি যদি প্রাচ্যের সমালোচনার ধারা গ্রহণ করি—যদিও এটা সত্যি যে প্রাচ্য সমালোচনার কোন সুচিন্তিত ধারা আছে কিনা সেটা আমাদের কাছে এখনও পরিস্কার নয়। তাহলে কবিতাটার এক অন্যবিধ বিশ্লেষণের কথা ভাববো। প্রাচ্য সমালোচনার ধারণা আমরা এখনও সৃষ্টি করতে পারিনি। আমাদের শ্লথতার জন্যেই বোধহয়, আমরা আমাদের বিশ্লেষণের প্রয়াসকে আমাদের পৈতৃক শাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করতে পারিনি বা সেই শাস্ত্রের

তাৎপর্যকে অনুসরণ করে নির্মাণ করতে পারিনি, এটা একটা খুব বড় অবক্ষয়ের চিত্র। তবে সে প্রসঙ্গে না গিয়ে বলতে পারি; তার জটিলতা বা গভীরতায় প্রবেশ না করে, আমাদের শাস্ত্রীয় অভিধায় দেখলে রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতার অন্য এক মূল্য। সারা কবিতায় একটা শান্ত, সমাহিত ভাব, 'তোমার সৃষ্টির পথ' এক স্তিমিত মহিমায় ভাস্বর। এখানে ছলনার পৃথিবীর সকল প্রতিচ্ছবি যেন নিয়ন্ত্রনাধীন। সব বেদনা আর প্রলয়ের অবশ্যম্ভাবীতায় যে নিরন্তর একাগ্রতা সেই আনন্দে কবি সমাহিত, যেন বৈচিত্র্যের অন্তরে তিনি ধ্যানের আসন পেতে বসেছেন। যে কুয়াশা তাঁকে ঘিরে রয়েছে তার ভিতরে কবি সম্পূর্ণ স্থিতধি।

'তোমার সৃষ্টির পথ' শুরু হয়েছে কবির সেই একান্ত নিজস্ব ভাষায় যা আমাদের বারে বারে কবিকেই মহৎ বলে চিনিয়ে দেয়, কারণ সে ভাষা কবি নিজে রচনা করেছেন। ভাষারীতির থেকে ভেঙ্গে তিনি যে ভাষা সৃষ্টি করেছিলেন তা ছিল পালিশ করা, আধুনিক। এ এক এমন ভাষা যা আমাদের অন্তরে চিত্রিত হয়। প্রথম স্তবকে 'তোমার সৃষ্টির পথ'— 'রেখেছ আকীর্ণ করি/বিচিত্র ছলনা জালে', সেই ভাষার সুচারু গঠনের দৃষ্টান্ত, সৃষ্টির পথ যে বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ এটা কবির উপলব্ধি থেকে বলা, তবে এটা প্রতিপাদ্যও বটে, এটা একটা প্রশ্ন, এমন এক প্রশ্ন যা মানুষের অনুধ্যানের উৎসে প্রতিস্থিত। আমাদের মাপা বুদ্ধিতে এরকমই মনে হয় যে, আমরা আমাদের চারপাশের অস্তিত্বকে বুঝে উঠতে পারিনি। আমরা যে জীবনের বিরাট প্রশ্নগুলোর কোন সদুত্তর খুঁজে পাইনি তার কারণ হয়ত আমাদের অতি-রিক্ততা। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি তার সৃষ্টির মূলে এই প্রবঞ্চনা নিহিত রেখেছেন। আমাদের যুক্তির প্রখরতা, আমাদের প্রশ্ন, পরিপ্রশ্ন আর সবকিছুকে বিশ্লিষ্ট করে দেখার প্রবণতা আমাদের কখনই আশ্বস্ত করতে পারে না, কারণ রুদ্ধ প্রশ্নের দ্বারে রয়েছে যেন শূন্য, পরিত্যক্ত আঁধার। কিন্তু দিবাকর যে আলোর স্রোতে এই বিপুল জগৎকে পরিপ্লুত করেছেন সেটা আমরা আমাদের চোখ থাকতেও অনুভব করতে পারিনা। আমাদের বেঁচে থাকার উৎসে রয়েছে একটা 'প্যারাডক্স', নালিশ করে লাভ নেই জেনেও পুত্র যেমন পিতাকে বলতে পারে তেমন করে বিধাতাকে কবি বলেছেন 'এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত'। ভাষার যে ব্যঞ্জনাশক্তি থাকতে পারে কবিতায় তার প্রয়োগ। মহত্ত্বকে চিহ্নিত করা। এর ভিতরে একটা আনন্দের মহিমা রয়েছে, যে অর্থ আমরা অনায়াসে অর্জন করতে পারি তার মূল্য নেই বললেই চলে, বিধাতার মহত্ত্বকে চেনার মধ্যে ঠিক এমন একটা কুহক ভেদ করতে হয় যার জন্যে আমাদের বহির্মুখীনতাকে ত্যাগ করতে হয়, একটা আত্মিক প্রান্তর দিয়ে হেঁটে যেতে আমাদের যেমন বহু প্রতিকূলতা মেনে নিতে হয়, তেমন করেই আমরা এই মহত্ত্বের পরিমাপ পেয়ে থাকি। এ জগতের উৎসে যেমন মহাদ্যুতি সূর্যের উপস্থিতি, তেমনি আমাদের অজানার সীমান্তে কোন কিছু জানার প্রত্যয়। নাবিকের সমুদ্র অভিযানের রাত্রিতে সূর্যোদয় দেখার নিশ্চয়তা কবিতার সপ্তম ছত্রে উল্লিখিত। আমাদের 'তরে রাখনি গোপন রাত্রি'।

'সঞ্চয়িতা'র একেবারে শেষে যে গ্রন্থ পরিচয় আছে, তাতে বলা আছে যে কবির 'তোমার সৃষ্টির পথ' কবির শেষ দুটি পদ্যের একটি। কিন্তু এটাও ঠিক যে এ কবিতা কবি

সংশোধন করে যেতে পারেননি। সংশোধন না করতে পারার প্রসঙ্গ আমার মনে যে কারণে এসেছে সেটা কিছুটা চটুল। তবুও যেহেতু এই ভাবনাটা আমার অবচেতন থেকে এসেছে, আমার মেনে নেওয়া বা আমার পরিশীলিত সাহিত্যবোধের পরিচায়ক হিসেবে নয় সেহেতু সেকথা এখানে টেনে আনলাম। আসলে কবিতা পাঠ আমার দৃষ্টিভঙ্গির পুরোটা নির্দেশ করুক এমনটি চেয়ে আমি সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। এতকথা বলা কেবল 'ছলনাময়ী' শব্দটার জন্য, তৃতীয় লাইনে কবি যাকে 'তুমি' সম্বোধন করেছেন তাকে বলেছেন ছলনাময়ী, আমাদের কবির ঈশ্বর ভাবনাকে নারীকল্পে দেখার আমন্ত্রণ রয়েছে কিনা সেটা ভেবে দেখা দরকার, যদি যিনি ছলনা করছেন তিনি 'ছলনাময়ী' হন তাহলে একটা ব্যত্যয় ঘটে। যেখানে গীতাঞ্জলিতে, এমনকি পূজা পর্যায়ের নানান কবিতায় বিধাতাকে তিনি রাজা বা প্রভু বলে ডেকেছেন, এখানে তেমন নয়। এখানে তিনি ছলনাময়ী, নারীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা আমার চোখে । বোধহয় তাঁর উপন্যাস সাহিত্যে নারীকে তিনি সামগ্রিক দেখেছেন, তবে বর্তমানের নারীবাদীরা যে নারীর পুরো নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার কথা বলেন এবং যেখানে নারীকে তারা অন্ততঃ পুরুষের সমতুল্য বলতে অগ্রনী, সে চিন্তার আভাস আমি রবীন্দ্রনাথের এই সব অন্‌টলজিক্যাল, আমার ক্ষুদ্র পাঠক্রমের পরিসরে দেখিনি। ইতিহাসে যেভাবে নারীকে সভ্যতার বেড়াজালে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে সেটা লজ্জা বা নির্লজ্জতার এক মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত বলা চলে কিনা তার আলোচনা এ লেখার বিষয় নয়। তবে 'তোমার সৃষ্টির পথ' কবিতায় এই একটা লিঙ্গাত্মক অভিধায় আমি রবীন্দ্রভাবনা সম্বন্ধে অনেক কিছু পাল্টে যেতে দেখছি, এখানে একটা বিতর্কের অবকাশ পাওয়া যায় বলে মনে করছি। হয়ত বা 'ছলনাময়ী' এখানে সৃষ্টি বা জননী।

কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে অন্য এক অপার্থিবতা আমাদের কল্পনাকে বিচ্ছুরিত করে। কল্পনার যেরকম চিত্র আমরা দেখে থাকি—নিতান্তই আমাদের কল্পনার চোখে তা সকলের ক্ষেত্রে এক কিনা তা আমার জোর করে বলার জো নেই। তবে একটা চিত্রক অনুভূতি আমাদের পক্ষে সম্ভব নইলে, অন্তত চিত্রকাব্যের কথাই ধরা যাক, সমাজের প্রত্যেকটি ভিন্ন মানুষের কাছে কবিতার এই দৃশ্যগুলো একই ব্যঞ্জনায়, একই অনুরণনে কল্পনা করা সম্ভব হত না। যেমন বটবৃক্ষ যার শাখা-প্রশাখা থেকে প্রাচীন অন্ধকারের অপসারণের কোন আশা নেই। কোন জ্যোৎস্নাসিক্ত রাত্রিতে আমরা তাকে গভীর বেদনায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, হয়ত বা—এই যে এক চিত্র আমি কল্পনা করলাম এ কি নির্বিশেষ প্রত্যেক পাঠকের মনের চোখেতেও কিছুটা ধরা দিল না! ধরা না দিলে কবিতার অনুভব কি কোনদিন সম্পূর্ণ হোত? দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে কবির শব্দবোধ আমাদের সেই কল্পনার পৃথিবীতে ফিরোয় যা একান্তই রবীন্দ্রনাথের। বিধাতা যে পথে আমাদের তাঁর সত্যের কাছাকাছি নিয়ে চলেন সে পথ আলোকিত করেছে তাঁরই সৃষ্টি করা জ্যোতিষ্ক। এই জ্যোতিষ্কের পথ স্বচ্ছতার, এতে নির্বেদ নেই, এতে কাঁটা নেই, এ পথে কোন প্রশ্ন নেই। অন্তরীক্ষের পথ কেবল ইথারের। নীল, অন্ধকার। এখানে শীতল বাতাস বইছে। এখানে জ্যোতিষ্ক মানুষের পথকে প্রচ্ছন্নে আলোকিত করে রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের বিরাট সাহিত্যকৃতীতে তার চিন্তার স্বাক্ষর সর্বত্র এক। তাঁর ভাবনা তাঁর সরল অনুভবের নিয়ম মেনে সবকিছু গড়ে তুলেছে, বিধাতাকে নিয়ে তিনি যেভাবে ভেবেছেন তা এই শেষ কবিতা গুচ্ছে বিদ্যমান একটা যাজ্ঞ্যবল্কীয় দর্শনে। ওই একই কথা, বিধাতা নিজেকে গোপন রেখেছেন তবু এও ঠিক যার চোখে তিনি নিজেকে উন্মোচন করলেন তাকে তিনি আলোক-ধৌত অন্তরে দেখা দিলেন। এই আলোক ধৌত অনুভব কাল্পনিক বটে কিন্তু এভাবে কল্পনা করার একটা তাৎপর্য আছে। কবির অন্তরে বিধাতা আলোক ধৌত হয়ে নিজেকে প্রকাশ করছেন। এর অর্থ নিতান্তই সহজ, অর্থাৎ কবি কল্পনার চোখে সত্যিকে দেখেছেন। 'সত্যেরে সে পায়/আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে'। নৈয়াইকেরা বিশ্লেষণ করেছিলেন কোন্ কোন্ উপায়েপৃথিবী সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হতে পারে, সম্যক্ জ্ঞান, অর্থাৎ ধরা যাক ওই যে বনানী ঘেরা পাহাড়ের সারি আমি দেখতে পেলাম সেটা যে যথার্থই পাহাড়ের সারি এবং অন্য কিছু নয় সেটা আমি কেমন করে বুঝলাম? যে পরীক্ষা করে আমি কোন জ্ঞাত বস্তুর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারলাম, সেটাকেই বলে নৈয়াইকতা বা ন্যায়। আমরা প্রত্যক্ষ করে জ্ঞান পেতে পারি, আমরা অনুমান করে তা পেতে পারি। কিন্তু কল্পনা করেও যে ধরিত্রীর গোপন করা সুন্দরকে আমরা সত্য বলে অনুভব করতে পারি, একথা তাঁরা কোথাও ব্যক্ত করেননি। প্রতীচির মনীষীরা কল্পনার কত স্তুতি করেছেন। জীবনানন্দ তাদের থেকে কল্পনা প্রতিভার তত্ত্বটুকুর মর্মার্থ গ্রহণ করেছিলেন, যে কল্পনা প্রতিভায় কবি মানুষের অস্তিত্বের একটা রূপরেখা নির্মাণ করতে পারেন তা যে কোন তুচ্ছ ব্যাপার নয়, বরঞ্চ সেই প্রতিভা যে রাত্রির কালো কিংবা আকাশের নীলকে আমাদের ঠিক কালো বা নীলের মত করে অনুভব করতে শেখায় একথা তিনি মেনেছিলেন। যদি আজ প্রতীচীর জ্ঞানের থেকে প্রাচ্য ন্যায়শাস্ত্রে কিছু সংযোজন করতে হয় কল্পনাকে আমাদের কাজে লাগে। রবীন্দ্রনাথ নৈয়াইক নন। তবে এই নৈয়াইকতার দৃষ্টান্তই তার কবিতার খসড়ায় খসড়ায়, এই আলোর খোঁজকেই অবশ্য উপনিষদ মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে চিহ্নিত করেছিলেন। হিরণ্যগর্ভ আমাদের 'বিড়ম্বিত' করে—কবি যেমন বলেছেন আমাদের কাছে নিজেকে গোপন রেখে, ছলনা করে, আমাদের একাগ্রতাকে বিক্ষিপ্ত করে যিনি পালিয়ে যান তিনি কখনই অন্য কোন রাজ্যে গিয়ে তাঁর আসন কায়েম করেন না, তিনি মেঘের আড়ালে থেকে আমাদের অন্তরে ধরা দেন।

একটা প্রবঞ্চনার প্রশ্ন 'তোমার সৃষ্টির পথ' কবিতাটায় খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছে—একটা সংশয়, বিধাতা কি মানুষকে প্রবঞ্চনা করেছেন? মৃত্যুর চৌকাঠে দাঁড়িয়ে এ এক ভীষণ প্রশ্ন, কিন্তু এই অস্তিবাদীতার থেকে তার মুক্তির পথ তিনি আবার পেয়েছেন। এক অন্তিম লেখনীতে কবি বলেছেন—

> অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
> সে পায় তোমার হাতে
> শান্তির অক্ষয় অধিকার।

আমি আমার প্রাচ্য মননশীলতার অভিজ্ঞতাটুকু কাজে লাগিয়ে এই কথাগুলোর উপর একটা সংক্ষিপ্ত টীকা লিখতে উদ্যত হয়েছি। শান্তির অধিকার অর্জন করার মধ্যে একটা মানসিক একাগ্রতা, একটা নিরবচ্ছিন্নতা কাজ করে। কবি যে অভিজ্ঞতার পথে হাঁটেন তা অত্যন্ত প্রয়াসলব্ধ। কবির সারা জীবনের সঞ্চয় তাঁর কাব্যের থেকে অনেক অনেক বড়। সেই বিরাটকে অনুসরণ করা কেবল কোন এক ব্যক্তির নয়, সমস্ত সভ্যতার কাছে একপ্রকার ঋণশোধ। কারণ কবির অতিক্রান্ত পথেই যেহেতু শান্তি, এ শান্তির ব্যাখ্যা করা দরকার। যে সমাধিতে পৃথিবীকে নিজের চিত্তের পরিসরে চেনা যায়, শুধু সেটুকুতে নয়, একাগ্র চলায় শান্তি, বিবর্তনের পথে শান্তি, 'তোমার সৃষ্টির পথে' অশেষ যাত্রাপথে শান্তি।

৪

নব্য বঙ্গদর্শন কি ও কেন?

লক্ষ্মীর হাট/নয়া অর্থনীতি

বাড়ীর পাঁচালি বইটা জীর্ণ হলে শ্বাশুড়ীঠাকরুণ নতুন একখানা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজার ব্রতকথা আনতে বললেন। এখন শ্বাশুড়ির বয়স হয়েছে। মেঝেতে বসলে উঠতে পারেন না। কোমরে বাত। এদিকে লক্ষ্মীপূজার পাঁচালি পাঠ করতে গেলে পুত্রবধূর মেজাজ গরম। বউমা পূজো-আচ্চার ধার ধারে না। আজকালকার মেয়ে, তাদের হালচালে ভক্তিভাব কম, শ্বাশুড়ী ব্রতকথা পড়েন এই বেশী। বটতলায় বসে কোন টুলো পণ্ডিত যে পাঁচালি কম্পোজ করেছেন, কোন অজ্ঞাতনামা কবিয়াল যেটি লিখেছিল, শ্বাশুড়ী নির্জলা উপোস করে সারাদিন পর সেই লক্ষ্মীব্রত পাঠ করে নিজের অভক্তি প্রশমন করলেন। বটতলার ছাপাখানায় যে ব্লকে ব্রতকথার মলাট ছাপানো হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে নারায়ণ জায়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মী টঙে চড়ে বসেছেন, হাতে সঞ্চয়ের ঘট। লক্ষ্মীপ্যাঁচা আমোদ করে দেখছে। ধান ক্ষেতে বাড়বাড়ন্ত ফসল। এ চিত্রের ভিতরে কলেজের অধ্যাপকেরা, সরকারের উঁচু পদের অফিসার, আর ষ্টক এক্সচেঞ্জের দুঁদে দালালেরা কোন ইকনমিক্ ক্যাপিটাল খুঁজে পাচ্ছেন কি?

বিদেশী কোম্পানি লগ্নি নিয়ে দেশে এসেছে। বোঁচা জাপানি, মাটো জার্মান, চালু ইংরেজ আর বক্কেশ্বর মার্কিনেরা টাকার থলে নিয়ে লোভ দেখাচ্ছে। লক্ষ্মীদেবী মলাটের ধানক্ষেত ছেড়ে কোথায় যাবেন ঠাওর করতে পারছেন না। এখন বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী। কবেকার কথা অথচ আজকাল চালানো হচ্ছে। বাঙালীর ব্যবসা করার কত কত নিদর্শন, ইতিহাসে রয়েছে। বাণিজ্য তরী, তোপ, বন্দর, ফুটো পয়সা। দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ আর পূর্বদিকে বর্মা থেকে যবদ্বীপ সব জায়গায় সে কেরামতি করেছিল। একেই বলে মার্কেট ইকনমি? বাজারে যেমন চাহিদা তেমন ব্যবসা করলেই মস্ত লাভ। বাজার-ই যেন নিয়ন্ত্রণ করছে। লগ্নি আসছে, যাচ্ছে। চাহিদা মেটাতে কাজ হচ্ছে—কর্মসংস্থান। তাতে টাকা আসছে। লোকে শ্রম ঢালছে। উন্নতি হচ্ছে। পদ্মাসন নয়, বাজার যেন লক্ষ্মীর পট। মানুষ যেমন পায়ে হাঁটে, হাতে টিপে যেমন ধানের নাড়া পোঁতে বা যেমন ইটের পিঠে ইট গেঁথে অট্টালিকা নির্মাণ করে, মেহনতি খালাসির মত জাহাজ চালিয়ে ভিন্‌দেশে নিজের পণ্য দ্রব্য রপ্তানি করে, যুদ্ধে কামান দাগে আর হৈহৈ করে একত্র প্রয়াস করে, তেমন করতে করতেই তার জীবনের সামগ্রী সুলভ হয়।

পক্ষান্তরে প্রাচীনকালে যে ইকনমি ছিল তাতে মানুষের প্রয়াশ প্রাধান্য পেত। বাংলায় যে পূজা-পার্বণ তাতে নিয়মবিধি ছিল সাবেকি। লোকেদের সংস্কারে, অনুষ্ঠানে এই সকল পূজা-আচ্চার নিয়মবিধি নিষ্ঠাভরে মানা হোত। দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতি পাড়ায় চাটুজ্যেদের বাড়িতে শুনেছিলাম এককালে অনেক রমরমা ছিল, হাঁকডাক, এখনও সেই রেশটুকু পড়ে আছে। তাদের বিরাট দালান বাড়ি ভেঙে যাচ্ছে, পলেস্তারা খসে পড়েছে, বাড়ির কোণে অশ্বত্থ গাছ শেকড় গেড়েছে। এদিকে লোকজনের মন সর্বত্র বর্তমান কালের কেতাদস্তুর দেখে উড়তে লেগেছে আর ওদিকে চাটুজ্যে বাড়িতে পূজোপার্বণ নিয়ে হাঁকডাক রমরমা করছে। চাটুজ্যেরা আবার লক্ষ্মীপূজা করেন না, কালীপূজার ভূত অমাবস্যার পরে তাদের অলক্ষ্মী বিতরণ হয়। আমি যেমন অল্প বয়স থেকে আশ্বিনের শুক্লাপূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা দেখেছি এখানে দেখলাম তার অন্যথা হয়েছে। অলক্ষ্মী বিতরণের পার্বণ নাকি বেদশাস্ত্রে কিছু বর্ণিত আছে। তবে এহেন কোন প্রাচীন বৈদিক উপাসনার সঙ্গে অনেক আদিবাসী ও লোকোৎসবের নানা আচার-ব্যবহার একত্র এসে জুটেছে। ফলে দেখলাম কতরকম কাণ্ড, সকলে মিলে বলছে লক্ষ্মী এসো, অলক্ষ্মী পালাও। পুরুত ঠাকুর পাটকাঠি জ্বালানোর নির্দেশ দিয়েছে আর তার ফলে পুরুষ-স্ত্রী সবাই মিলে পাটের মুখে আগুন দিয়ে বাড়ির পিছন দিকে জ্বলন্ত নারকেল ছোবড়া পুঁততে চলেছে। যত অশান্তি, দুর্ভোগ, দত্যি, দানো, অমঙ্গলের প্রতিভূ সব চাটুজ্যেদের দালান বাড়ির পিছন দিয়ে চম্পট দিলো, এবার যদি পৈতৃক বাড়ি মেরামত হয়। শুক্লপক্ষের শশীকলার ধীর উন্মেষের সাথে সাথে চাটুজ্যে বাড়ির রূপ খোলতাই হচ্ছে, এমনটি যেন ঘটে। দালানের পাশে বাড়ির যে সিঁড়ি নেমেছে তার উপরে চাটুজ্যেদের উচাটন-বিক্ষিপ্ত গৃহিণী দাঁড়িয়ে থাকে এক মানবীয় নীতির প্রতিভূ হয়ে—একটি ইকনমিক্সের প্রতীক।

এমনিতে মা লক্ষ্মীকে বাঁধার কতরকম জল্পনা-কল্পনা করা হয়েছে কিন্তু এ হতভাগ্য বাঙালি জাতির দুর্দশা ঘুচল না। লক্ষ্মী চঞ্চলা, আজ আছেন তো কাল নেই, পাঁচালিতে লেখা, যে গৃহিনী লক্ষ্মীকে রোজ ভাত বেড়ে দেন, স্বামীর সেবা করেন, এবং ব্যাভিচারে লিপ্ত হন না এবং যে স্বামী প্রত্যহ সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরেন এবং যার গৃহে এহেন নিষ্ঠার ফলে সুখ শান্তি বিঘ্নিত হয় না তার ঘর ছেড়ে লক্ষ্মী হরকিস্ বেরুবেন না। কে বলে লক্ষ্মী চঞ্চলা, কেবল তার অবহেলা করলে মানুষের ঘরে অর্থের আকাল পড়ে। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে যে বরাতের দোষ দেয় বা লক্ষ্মীকে চঞ্চলা বলে তার অশেষ দুর্ভোগ। এ স্থানে বলা চলে যে আজ লক্ষ্মীর আখ্যানে অল্পবিস্তর পরিবর্তন হয়েছে। এখন কেবল গৃহস্বামীর ভাতের যোগাড় ছাড়াও মানুষ আরও কত কি নিয়ে ভাবতে শিখেছে। তবে হা-ভাতে কি আর হাল ফ্যাশনের আহ্লাদি বোঝে নাকি তার আকাশে উড়বার ফুরসৎ হয়। তবে কিসে মানুষের মঙ্গল হয়, কেমন উপায় করলে দারিদ্র্য, ভেদাভেদের অবসান হয়—এ সব নিয়ে চিন্তা। কারণ চিন্তা না করলে ঝক্‌মারির শেষ। তাই লেখক একটা ছোট লক্ষ্মীপুরাণের নব্যকল্পনা লেখার উপদেশ দিচ্ছেন। কেউ যদি এর পয়ার বা নাট্যপালা রচনা করতে চান তো করতে পারেন। এতে যে থিওরিটিকাল ভাবনা অনুপস্থিত থাকবে সে কথাও কেমন করে বলি। তার মূলে থাকবে—শুধু বাজার নয়, মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি।

ফল্গুতটে জীবন দেহপিঞ্জরেতে টান।
উদরে রাক্ষস বসে গ্রাস করে ধান।।
মানবের ললাটে লেখা এই কিঞ্চিৎ বিধান।
খিদে না মিট্‌লে পরে ঘটে জীবন অবসান।।
অন্ন, শাক, মাছ, দিনমানে এক বার।
প্রয়োজন অন্ততঃ এই অর্থশাস্ত্রের সার।।
ক্ষুধা নিবৃত্তি হলে ঘরেতে শয়ান।
স্বপনে সজ্জাদ্রব্য, সখ, যন্ত্র দেখে তো নয়ান।।
সূর্যের দিকচক্রে ঘটে কর্মের উন্মেষ।
কর্ম পেলে মানুষের মুক্তি শেষ মেশ।।
সেবার ইপ্সা নিয়ে যে কাজ করে দশমাস।
ধনে, ধানে সমৃদ্ধ হয় সে ব্যক্তির নিবাস।।
সুযোগ সদ্ব্যবহারে যে শ্রমদান করে।
বুদ্ধি ব্যয় করে বৈকুণ্ঠের বরে।।
সে করে অর্থনীতির শুষ্ঠ পালন।
তারই কীর্তি কীর্তিত হয় জগৎ লালন।।

ব্যক্তি ও সাহিত্যপ্রয়াস

বাঙালা সাহিত্যের বারোয়ানা যে বর্তমানে অবক্ষয়ের দৃষ্টান্ত তা বলা বাহুল্য। বিশেষ করে যখন রকমারি পত্রপত্রিকা, পুস্তিকা, কারিগরি করা রঙিন বা সাদাকালো ছাপার অক্ষরে পরিস্ফুট, বর্ণাঢ্য লেখমালার সম্ভারে সুসজ্জিত সংবাদপত্রের বিপণি দিন দিন বাড়ছে, তখন দেখছি আরও হতাশাব্যঞ্জক সাহিত্য লেখা হচ্ছে। প্রত্যেক দিন যে লেখা বেরুচ্ছে তাতে না আছে মননের বিষয়বস্তু, না আছে ষ্টাইলের নমুনা। আর বিশেষ করে তত্ত্বসাহিত্যে যে গোঁজামিলের বস্তু চালান করা হচ্ছে তাতে সমাজের ভিতরকার একটা বোধির সংকট চোখে পড়ে। আজকাল খাসামাল বলতে আমরা প্যাকেটের চটকদারিকেই মেনে নিয়েছি। কিন্তু চটকদার মাল জাতের হয়েছে কিনা তা কে বলবে? এবং এও অনস্বীকার্য যে সাহিত্যে কতটা প্রসাদগুণ বর্তেছে, তাতে কল্পনার পরিমাণ কতটা নিরীক্ষণের বা ডিটেইলের নৈপুণ্যে সমৃদ্ধ হয়েছে, তাতে মূল্যবোধ কতটা গূঢ়, কতটা নৈর্ব্যক্তিক হয়ে দেখা দিয়েছে, সেটার উৎকর্ষের বিবেচনা করতে হয়। ব্যক্তি ও পরিভাষায় যাকে বলে 'এক্সপ্রেশন' অর্থাৎ ভাবপ্রকাশ—তার সম্পর্কটি কি? ভাষার প্রকৃতিই বা কি? ভাষা কাকে বলে? ভাষার দ্রব্যগুণই বা কি? এমন সব প্রশ্ন বর্তমান প্রাবন্ধিকের মনে উদ্ধৃত হয়েছে বটে এবং এই অবসরে তার নাতিদীর্ঘ ব্যাখ্যা করা যাক।

আমি প্রথমেই কবুল করেছি যে আজকে সৎসাহিত্যের অভাব, সৎকাব্যের অভাব, নিঃশ্রেয়স প্রসাদগুণের অনুপস্থিতি, বাঙালির ক্লিন্নকূট, অবসাদগ্রস্ত চৈতন্যের ফসল। আজ কচিৎ সেই সরল অনুভূতি ও রচনাশৈলীর দৃষ্টান্ত মেলে যা কৃতবিদ্যের অথচ মার্জিত,

যাতে পণ্ডিতি আছে অথচ পণ্ডশ্রম নেই, যাতে বিশেষ করে বুদ্ধির প্রমাণ আছে অথচ বুদ্ধির অহমিকা নেই। তবে যেহেতু এতক্ষণ বাঙালির তাত্ত্বিকতার ক্ষেত্রে আমি অভিযোগের পাহাড় নির্মাণ করেছি, তখন আমাকেই এর যাথার্থ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। আমি আগেই অনুমান করেছিলাম যে ব্যক্তির চৈতন্য আর তার সৃজনশীলতার মধ্যে একটা যোগাযোগ আছে এবং তদুপরি আমার মনে হয়েছিল যে এই ব্যক্তির বোধিতেই সব সৃষ্টি, সব আর্ট, সব কলানৈপুণ্যের কারণ নিহিত রয়েছে। পাঠক বলবেন যে এটি নতুন কথা নয়—তবে পাঠক হয়ত জানবেন না যে এই কথাটি অন্যথায় আজকের পণ্ডিতমহলে প্রায় অচল। প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিক বলবেন যে পরিবেশই মানুষের সাংস্কৃতিক আধারকে তৈরী করছে, সেই তার শিশুকাল থেকে এবং এই বহির্বিশ্বের থেকে মানুষ যা শিখেছে তাকেই নবরূপায়ণে আমরা দেখতে পাচ্ছি সৃষ্টিতে, সাহিত্যে, রঙ্গমঞ্চে। কিন্তু এতো জগৎকর্তাকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখা হল। আমরা প্রত্যহ নিজেদের অন্তরে ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব অনুভব করছি—আমাদের বিচারে যেটা সঠিক ভাবছি সেটাকে বেঠিকের সঙ্গে সংঘাতে হাজির করছি। এই চয়ন করার সম্ভাবনার মধ্যেই রয়েছে সেই গোপন সূত্র যা প্রকৃতই ব্যাখ্যা করতে পারে কেন মানুষের প্রচেষ্টাতেই কীর্তির স্বাক্ষর রাখা যায়। মানুষই পারে, তার ভিতরের ইচ্ছেশক্তি প্রয়োগ করে সাম্রাজ্য পত্তন করতে-ক্ষমতার নয় শান্তির, ধ্বংসের নয় সৃষ্টির, শিল্পের। মানুষের প্রবৃত্তির সঙ্গে এই সৃষ্টির সম্পর্কের ইঙ্গিতই এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম এবং বাঙালি সমাজে তার দৃষ্টান্ত সাতচল্লিশ সনের পর এখন তলানিতে এসে ঠেকেছে।

অ্যানথ্রপলজিস্টের চোখ দিয়ে দেখলে স্বীকার করতে হয় যে সমাজের বাস্তবিক অস্তিত্ব রয়েছে এবং যেমন সহচর পাখি বা মৌমাছি যূথবদ্ধ হয়ে বা সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে বেঁচে থাকে তেমন একটা উন্নতশীল পর্যায়ে মানুষের দুনিয়াদারি—বুদ্ধিমান, সংবেদনশীল, ক্ষিপ্র, ধীমান। তবে অ্যানথ্রপলজিস্টের দৃষ্টিতে যা চোখে পড়বার ব্যাপার, সমাজতাত্ত্বিকের ক্ষেত্রে তা নাও পড়তে পারে। মানবের বোধ কেবল অনুকরণের নয় কারণ এই ব্যাপক নভমণ্ডলের অনুমতিক্রমে যখন পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে এবং চরাচর ও নক্ষত্রখচিত অন্তরীক্ষে মাটি, জল, রৌদ্র ও বাষ্পের অনিরুদ্ধ নৃত্যে মানব কেবল তার স্থান অধিগ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকেনি বরঞ্চ প্রত্যেক মুহূর্তে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করতে প্রয়াসী হয়েছে এবং তার সৃষ্টির কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে তখন সে আদতে ভৃত্য বা দমনীয় নয়। এই যে মানব-চেতনার এক বিশেষ ভাব বা বিশেষ দৃষ্টি তাকে আমরা সমাজ বলতে পারি। সমাজ শব্দটি বস্তুতঃ একটা বিশেষ বোধ যা মানুষের অনুভূতি বা অনুভবের উপর নির্মিত হয়েছে। বর্তমান প্রাবন্ধিকের একান্ত ব্যক্তিগত মত, সমাজ কোন নির্দেশিত পরিবেশ বা বৃহদ্‌পরিবার নয়।

পাঠক নিশ্চিন্ত হবেন, অর্থাৎ তিনি যদি প্রকৃতপক্ষে যুক্তিকামি এবং নিরপেক্ষ হন, যে মনু বর্ণিত সমাজের উৎপত্তিকে আমি এখানে নস্যাৎ করছি বটে। উপর্যুপরি আমি বিশ্বাস করি যে ঋক্‌ ও মনুসংহিতার সমাজের যে অপৌরুষের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ যে তত্ত্ব বলে যে সনাতনধর্মে ধর্মের পৃথক বর্ণগুলি ব্রহ্মার বিভিন্ন অঙ্গ থেকে সৃষ্ট হয়েছে তা নিতান্তই অলীক এবং অবৈজ্ঞানিক। সৃষ্টিকর্তার বিধানেই যে সমাজের নানা সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে এবং এই সামাজিক অস্তিত্বের যে কোন অপরিণামদর্শী শ্রেষ্ঠত্ব

থাকতে পারে, তা কবুল করতে আমরা নারাজ। অর্থাৎ, সমাজ পিতৃপুরুষের দান সে অর্থে নয় যে অর্থ আমরা পুরোহিত তথা ব্রাহ্মণ শিক্ষকের কাছে জেনে এসেছি। সমাজ নামের কতগুলি শৃংখল বা নিয়ম বা অনুসৃত আচার ব্যবহার, শব্দ, সংকেত, বিচার, তর্ক বা সিদ্ধান্ত হতে পারে সে ব্যাপারে আমাদের আপত্তি নেই কিন্তু তার অনড় ও অনমনীয় শাসনতন্ত্রে আমাদের আস্থা নেই।

প্রকৃতপক্ষে সমাজ ব্যাপারটা মানবের এই এক বহির্মুখী অভিজ্ঞতা বা অনুভবের মধ্যে চিহ্নিত ও নির্ণীত হয়ে চলেছে। পাঠক লক্ষ্য করবেন, সকালে ঘুম ভেঙে আমরা ক্রিয়া বা কাজের জন্য বা প্রবৃত্তি অনুযায়ী যে পদক্ষেপ গ্রহণ করি—যে সঙ্কল্প বিধান করি (যেমন ধরুন জলদি আপিসে যেতে হবে, ট্রেন ধরতে হবে, পয়সা নিতে হবে) সেইটেই সামাজিক সত্যের উৎস। আমার অন্তরেই যে আমার সামাজিক অস্তিত্বের এক সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে, আমার নিয়মানুবর্তিতা ও নিত্যনৈমিত্তিক অভিজ্ঞতার তাড়নায় বা ফলশ্রুতিস্বরূপ সেইটেই আমার সামাজিক চেতনা এবং সেই চৈতন্যের উৎপত্তির মধ্যেই সমাজের মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে বলে আমার ধারণা। অর্থাৎ, আমি আমার কর্তব্যচয়নের মধ্যে দিয়েই সমাজের মূল্যবোধ বা উৎকর্ষ নির্ধারণ করছি। এই 'আমি'-কে সংসারের হাটে রাজা করে দেওয়াটা তত্ত্বের খাতিরে, আমাদের খুব পছন্দের। এই 'আমি'-কে প্রাধান্য দেওয়া হয় বলেই বোধহয় আজ য়ুরোপীয় ভাষাতাত্ত্বিকের সাথে একটা বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া যায়—কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে নয়। এই মুহূর্তে আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে প্রথমেই—ওই যে ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখার এই যে বোধ, ওই চৈতন্য, ওই সামাজিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার যে উচাটন ও প্রবৃত্তি, ওইটিই রয়েছে আমার অস্তিত্বের মূলে। এই অস্তিত্বকে নিয়েই আমাদের সংসার, আমাদের জাগতিক অভিলাষ, সুখ, দুঃখ, বিলাপ বা বিপ্রলব্ধ, এই অস্তিত্বকে নিয়েই আমাদের প্রত্যয়, আমাদের ভীতি, এই অস্তিত্বই আমাদের সব থেকে প্রিয় বস্তু এবং মৃত্যু আসে আসুক বা না আসুক যে অস্তিত্ব এতদিন রসেবশে থেকেছে তার বিলুপ্তি আমার শোকের কারণ। এই অস্তিত্ব সমাজে বা সামাজিক চৈতন্যে অস্তিত্বের মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করছে। এই অবসরে আমাদের মনে রাখা দরকার, যে সমাজ নামের আচার ব্যবহারের বোধ বা সংকেত আমার চৈতন্যে কাজ করছে এবং আমার কাজ করবার বা সংবেদনশীলন হওয়ার ইচ্ছাকে প্রকাশ বা প্রতিভাত করছে তাতেই আমার সামাজিক মূল্যগ্রহণ ও বন্টন করা সার্থক হচ্ছে। আমার চৈতন্য থেকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমার ভাল বা মন্দ কাজ করার অবকাশ তৈরী হচ্ছে, শুভ প্রশান্ত জ্ঞানের পরিস্থিতি কায়েম করার পরিবেশ তৈরী হচ্ছে। আমার এই ইচ্ছা, এই বাসনা, এই সৎপ্রবৃত্তির অনন্ত সম্ভাবনা এবং সে বিষয়ে প্রত্যয় আমাকে ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃত মানুষ করে তুলছে। আমার প্রচেষ্টায় যে প্রত্যক্ষ বাধ্যতা বা নিয়মানুবর্তিতার রূপ দেওয়া যাচ্ছে সেইটেই আমার সমাজদর্শনের প্রতিপাদ্য। এই অস্তিত্বের তত্ত্বে যে স্বাধীনতা আছে, যে সৃষ্টি আছে, যে শুভ ভাবনা আছে তাকে হারিয়ে ফেলা সবচেয়ে মূল্যবান মণিমুক্তো হারিয়ে ফেলার সামিল।

এখন স্বভাবতঃই বিচক্ষণ পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন এই যে অস্তিত্ব—রবীন্দ্রনাথ বোধহয় এই অস্তিত্বকেই 'সাহিত্যের পথে' 'আমি' বলে অভিহিত করেছিলেন—তা কি কোন অবিচল সত্যিকারের বস্তু না কি তা কোন দৃষ্টির ভুল। এই আমি কি বাইরের

সবকিছুর থেকে পৃথক। সবকিছুর পূর্বে তার অবস্থান? এ ক্ষেত্রে সেই যুক্তিকামিতার পুনরুল্লেখ করে বলতে পারা যায় যে, দেকার্ত যেমন প্রচার করেছিলেন, তেমনভাবে নয়—আমাদের অভিমত হচ্ছে, 'আমি' ততটা স্বতন্ত্র নয় যতটা তার সম্পর্কে ভাবা যেতে পারে কারণ মানবের এই 'আমি' চৈতন্যটি সে তার জন্মের পরে অর্জন করতে পারে। এই যে সংসারে মানুষ তার স্থান পেয়েছে এবং সে সমাজের অন্তর্গত বৈ নয়, তদুপরি এই 'আমি' বোধটি যে কখনই সম্পূর্ণ মুক্তির অযোগ্য, তা নিঃসংশয়। এই তত্ত্বটা পরিষ্কার করে জানা চাই—কারণ মানুষকে এই সংসারের পরিসরেই বেঁচে থেকে তার জীবনের অর্থ, তাৎপর্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এই সমাজ, সংসার, আবহ মোটের উপর মর্ত্যের প্রতীক, ইহলৌকিক। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বলা যায় মানবের যে বিশেষ অস্তিত্ব তা আসলে তার মানসিক চিন্তার প্রয়োগিক রূপ—তার মানসিক উত্তরণ। এই মানসিকতা আছে বলে সে তার বাইরের জগতের প্রতীকগুলোকে অনুমান বা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হচ্ছে এবং সেই অস্তিত্বের অভিরুচি অনুযায়ী সবসময় সেই প্রতীকবিশ্বের প্রতি সংবেদনশীল হতে পারছে। এই সংবেদনশীলতাই তাকে 'সামাজিক' করে তুলছে। গোটা প্রকৃতি, গোটা জগৎটাকে মানুষ নিজের মধ্যে পায়। সেই রসদ নিয়েই সে ভাবতে শিখছে—সেভাবেই সে ভাবতে বাধ্য। অথচ সে সেইটুকু নিয়েই নিজের জীবন, নিজের পরিবার, নিজের শ্রেণীস্বার্থের জন্য ভাবতে পারে, নতুন বিন্যাস তৈরী করতে চায়।

এই স্বল্প পরিসরে আমি প্রধানতঃ অস্তিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছি এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই অস্তিত্ব বোধই পারে বারে বারে সৃষ্টির দরজাকে খুলে দিতে। বস্তুতঃ মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে আমরা জানতে পারি সেখানে ঝাড়বাতি ঝুলছে, দেউটির দীনতা সেখানে আঁধারকে ছায়া ফেলতে দেয়নি। সেখানে পিলসুজ সহস্রদীপের—তা হয়ত মানবের অজানা অন্তরের কোন অগোচর দেবস্থানকে আলোকিত করে রাখছে। এই সব প্রতিশ্রুতিই মানুষের আর তার কল্পনার যথাযথ সম্মান। যে মানববিজ্ঞান মানুষের এই আবিষ্কার করার ভাবটাকে খর্ব ক'রে তাকে যন্ত্রের মতো বিশ্লেষণ করতে চাইছে সেই বিজ্ঞানকে হার মানতে হবে কারণ তা নিতান্তই পক্ষপাতদুষ্ট। মানুষের গোটাটার মধ্যে এই স্বপ্নসচেতন দিকটাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। তবে এতটা আশাবাদী না হলেও ক্ষতি নেই। যতক্ষণ যে ব্যাখ্যার অংশ ভাগ হয়েছিল তাতে অস্তিত্বকে বড় বলার কারণ ছিল এবং এই অস্তিত্বের প্রাথমিক সংকেতকে চিহ্নিত করে এখন ইতি টানব। অতএব বলা যায় যে এই অস্তিত্ব কোন ধ্রুবক অস্তিত্ব নয়। এমন নয় যে যেমন এই কাঁচের পেয়ালাটা আছে তেমন আমিও আছি। শখ হলেই সেই কাঁচের পাত্রকে স্পর্শ করা যায়, তাকে তুলে পর্যবেক্ষণ করা যায়, করতলে তার মসৃণ গাত্রটি উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু 'আমি' নামক এই বোধটির কোন বর্তমান নেই। তার তেমন অস্তিত্বই হয়ত নেই যেমন কাঁচের পেয়ালার আছে। এই 'আমি' প্রজ্জ্বলিত বা রূপায়িত হয়ে ওঠে। বলতে পারি এই মুহূর্তেই তা আমির হয়ে ওঠাটাকে কতকটা তির্যক, আন্দাজ বা অনুমানের সাহায্যেই বোঝা যায়, সরাসরি নয়। অতএব সেইসব মুহূর্তে যখন আমি কোন অন্যায় করছি, কোন অবিচার করছি বা গর্হিত কাজ করছি তখন এই 'আমিকে' আমরা অনুভব করতে পারি। যখন আমরা দান করি, সংযম করি, তখন আমাদের অনুভূতিতে এই আমি উদ্ভাসিত হয়। এই 'আমি'-র বোধ হল ক্ষণিকের। বেঁচে থাকাটাই অতীতের, ক্ষণিকের। তা কালের নিয়মে স্রোতে স্রোতে ভেসে

গেছে। কিন্তু এই অনুভূতির সম্ভাবনা, ভাল লাগা, ভালবাসা, শোক পাওয়া বা হিসেব চুকিয়ে দেওয়ার মধ্যে তা বারে বারে ফিরে আসছে, যদিও চলে যাওয়ার জন্যে। এ যেন নীতিশাস্ত্রের কথা। কিন্তু এই নীতিপরায়ণতাই বোধহয় সব সংস্কৃতির শীর্ষে, মানবিক চেতনার আশ্রয়ে বিরাজ করছে। এই চেতনার ফলে শব্দের মধ্যে সেই প্রসাদগুণ সন্নিবিষ্ট হয় যা উন্নত ও চিরকালের।

মোসায়েব ম্যানুয়াল

কত লেখক, কেউ মোসায়েবদের ইতিহাস লিখলেন না। মোসায়েব কাকে বলে? মোসায়েবদের নানা জাত। কেউ লম্বা, চোখে চশমা, নমস্কার করে সর্বদা দাঁত বের করে আছেন। কেউ বেঁটে, মাথায় টাক, বড় মন্ত্রী আমলার টেবিলের কোণা দিয়ে কচ্ছপের মত চেয়ে থাকেন। যারা মোসায়েবি করে স্বার্থসিদ্ধি করতে চান তাদের জন্যে একটা ছোট ম্যানুয়াল লিখবার চেষ্টা করালাম। তবে এখানে কবুল করা দরকার যে মোসায়েবির ক্ষেত্রে ট্রেনিং ভাল খাটে না। যারা মোসায়েব হন তারা অনায়াসেই এর কায়দা রপ্ত করতে পারেন। তারা মুরুব্বিও বটে। যে বড় সায়েবের মোসায়েবি করেন তিনি জুনিয়রকে ভাল মানুষ পেলে তার উপর মুরুব্বি করেন।

বঙ্কিম থেকে বিবেকানন্দ প্রত্যেকে বাঙালির চাটুকারিতা নিয়ে অল্পবিস্তর লিখেছেন। মোসায়েবের নব্য আখ্যান লিখতে গেলে বোঝা যায় যে মোসায়েবের চরিত্র কালের পরিক্রমায় পাল্টায়নি বরং এমনটা বলা যায় যে কালে কালে তারা নতুন কলেবর পরিগ্রহ করে এসেছে। মোসায়েব ফিচেল লোক, এমনিতে পরিপাটি, তৎপর এবং দন্তব্যঞ্জন করে থাকেন। অন্তরে কর্কট সে চট করে অপর কর্কটকে ঝুড়ি থেকে পালাতে দেয় না।

মোসায়েবের যখন কোন কাজের দরকার পড়ে তখন সে ভোর থাকতে ওঠে। চান, জলখাবার সেরে সে তার উপরওয়ালার কাছে ছোটে। আবার উপরওয়ালা তেমনি বদমায়েশ, আঁচিল মোসায়েব তার শ্রীবৃদ্ধি করেন। উপরওয়ালা হাসেন তো মোসায়েব হাসেন, উপরওয়ালা কাউকে অনুমতি দিলে মোসায়েব বলেন সে কথা শুনলে তার লাভ হবে। উপরওয়ালা কাউকে বারণ করলে মোসায়েব তাকে মিষ্টি ধমক দেন। যারা অতঃপর মোসায়েবি করে তার অফিসারের ফেভার পেতে চান তারা এই অভ্যাসটি ভাল করে করবেন। সাহেব যখন সকলের সামনে কিছু বলেন মোসায়েব তার কথার ফাঁকে তাক রাখেন। সাহেবের পরেই তিনি পোঁ ধরবেন, ফোড়ন দেবেন বা জিভ কাটবেন। সাহেব অহংকারের চোটে হাওয়াতে ভাসমান হবেন। মোসায়েবের কার্যসিদ্ধি হবে। যে জাতের চাটুকারিতা করে বিস্তর ক্ষতি হয়েছে তার এখনও চোখ ফুটল না। গুবরে কীটের মত তাদের চরিত্র, বড় চিন্তা করলে পর তারা অপরকে বোকা বলে, ছ্যা ছ্যা করে। সেইসব কীটেরা তাদের রোজনামচায় কেবল স্বার্থসিদ্ধি আর ভাতের যোগাড় করছে। তাদের ছেলেপুলেরাও তেমনি হবে আশ্চর্যের কি, বারফাট্টাই করতে করতে গুবরে রসাতলে তলিয়ে রইল।

৫

বৈয়াকরণ জাক্ ডেরিডা ও তাঁর বিনির্মাণতত্ত্ব

আজকালকার যা হালচাল তাতে বিলেত থেকে একটা ফর্মুলা পাচার হলে সেটাকে নিয়ে বেশ হেটকারি করা হয়। টোলের পণ্ডিত তো গেছে কিন্তু কলেজ য়ুনিভার্সিটির কতিপয় মাইনে করা—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অকর্মণ্য কিংবা পণ্ডিতমণ্য—শিক্ষকদের দেখা যায় যে তারা কটা পাচার করা বিলেতি বা ফরাসি কন্‌সেপ্ট্ নিয়ে, সুগন্ধী দ্রব্যের মতো, বেশ আহামরি করছেন। তা ভাল। 'সায়েবদের থেকে কিছু শেখার নেই' এমনটা বলা চলে না। জাক্ ডেরিডার যে কতিপয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছি তা দেখে আমার তো বেশ মালুম হয়েছে যে তাতে রীতিমতো শেখার রসদ রয়েছে। তা নিয়ে চর্চা করলে আমাদের নতুন মলাটে জ্ঞানের উপলব্ধি হতে পারে। বস্তুতঃ সংসারি মানুষ বা মুটে মজুরের তত্ত্বের দরকার পড়ে না। তারা কর্মের জগতের লোক। কর্ম মহতী। তত্ত্ব যার কাছে চলে তার কাছে আজকের আলোচনা অবান্তর হবে না।

বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলে জাক্ ডেরিডাকে নিয়ে উৎসাহ ছিল যথেষ্ট। ১৯৯৫ সনে তাঁর কলকাতায় আসা, বইমেলা উদ্বোধন করা, ইত্যাদির সম্ভাবনায় সেই উৎসাহ প্রায় হুজুগে পরিণত হয়েছিল। অথচ এটা প্রায় সর্বসম্মত যে তাঁর লেখায় দন্তস্ফুট করা কঠিন। কথার ধুম্রজাল রচনা করার অভিযোগ তাঁর সম্পর্কে অনেকেই করেছেন। ডেরিডা সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে নানা তর্কবিতর্ক হয়েছে। একটা প্রতিকূলতার আবহাওয়াও তৈরি হয়েছে। এজন্য ডেরিডা নিজেই কিছুটা দায়ী। বোধগম্যতা যদি লেখাপত্রের মাপকাঠি হয় তাহলে মানতেই হয় ডেরিডার রচনা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু দর্শনশাস্ত্র—যা ডেরিডার বিষয়—সহজ বা সরল নয়। আবেগবর্জিত কঠোর যৌক্তিক চিন্তা এবং বৌদ্ধিক সমীক্ষার নিরিখে তার বিচার প্রয়োজন। কোনো সমাদৃত চিন্তক যদি কিছু বলেন তার উচ্চারণ অনুধাবন করার চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়।

ডেরিডার জন্ম হয়েছিল ১৯৩০-এ, আলজিয়ার্সের শহরতলি, এল-বিয়ারে, এক পেটি-বুর্জোয়া ইহুদি পরিবারে। ডেরিডার লেখাপড়া শুরু পারীর নামী শিক্ষায়তনে। দর্শনে ব্যুৎপত্তি অল্পবয়স থেকেই। ছাত্রাবস্থা থেকেই কলম নিয়ে কেরামতি করতে শুরু

করেছিলেন, সে-ফন্দিফিকিরের প্রমাণ প্যারিসের বুদ্ধিজীবী মহল্লায় আজও বিদ্যমান। প্রচুর লিখেছেন তরুণ বয়স থেকেই। বয়স বাড়লেও উদ্যম কমেনি, বরং বেড়েছেই। যুবক ডেরিডা যে সব বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতেন তা অবশ্যই তাঁর সময়ের আলোচ্য বিষয়, কিন্তু এটাও ঠিক, তখন, বিশেষ করে ফরাসি দেশে পুরনো সব দার্শনিক তত্ত্ব বাতিল করে নানাবিধ নতুন তত্ত্ব চর্চিত হচ্ছে। এই শতকের একেবারে গোড়ার দিকে একটা ভাবান্তর সংঘটিত হচ্ছিল। আর যে সকল তাত্ত্বিকেরা তখন ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি, এককথায় যে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের গায়ে মানববিজ্ঞান নামটি দিয়ে তকমা এঁটে দেওয়া যায়, সেইসব ক্ষেত্রে একধরনের বিপ্লব ঘটিয়ে দিচ্ছিলেন, তাঁদের তালিকার উপরে ছিলেন দু'জন স্বনামধন্য পণ্ডিত—সস্যুর ও লেভি-স্ট্রাউস। ডেরিডা মনোনিবেশ করেছিলেন সস্যুরের লেখায়, তাই সস্যুরের গ্রন্থের সমালোচনা দিয়ে শুরু করলেন তিনি। যাঁর তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তাঁর শাস্ত্রের গোড়াপত্তন, অর্থাৎ যার তত্ত্ব ডেরিডা প্রথম বিশ্লেষণ করেন, তার ভিতরে কয়েকটা প্রশ্ন উত্থাপন করে তাকে খণ্ডন করবেন বলে, বা বিনির্মান করবেন বলে, তিনি হলেন সুইস্ ভাষাতাত্ত্বিক ফার্ডিনান্ড সস্যুর।

পূর্বে উল্লেখনীয়, সস্যুর এক নব্য ভাষাতত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। তাঁর নিজের কোন লেখা গ্রন্থ না থাকলেও, যে বইটি নিয়ে পণ্ডিতমহলে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল তা তাঁর তন্নিষ্ঠ ছাত্রদ্বয়ের ক্লাশনোট। আধুনিক ভাষাতত্ত্বে যাকে বলে বাক্ কর্তৃত্ব, তার ধারণা এই সস্যুরেই অবদান। বাক্ অর্থাৎ শব্দই একমাত্র প্রমাণ। শ্রোতা বা পাঠক কোন বিষয় সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করে তা একমাত্র এই ভাষার দ্বারা বা বাক্যের দ্বারা করা সম্ভবপর। সস্যুরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'কুর্স দ্য জেনেরালে লিঙ্গিউইসতিক' বইটিতে সস্যুর একটি দুঃসাহসিক মন্তব্য করেন। সস্যুর বললেন যে ভাষাবিজ্ঞান সার্থক হয় যদি ভাষাকে শব্দের ক্ষেত্রবিশেষ বলে বিবেচনা করা হয়। পাশ্চাত্যদর্শনে এই অন্তর্দৃষ্টির সমাদর খুব একটা করা হয়নি, অন্তত আধুনিক যুগের ব্যাকরণের ক্ষেত্রে। সস্যুরের অভিমত এই যে একটি শব্দ ও অর্থের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক থাকে। তিনি শব্দের নাম দিলেন 'সিগনিফায়ার' এবং তা যে-অর্থ চিহ্নিত করে তাকে বললেন 'সিগনিফায়েড'। ভাষাতত্ত্বে এই কথাগুলির অন্তর্ভুক্তির আরেকটি তাৎপর্য আছে। সস্যুর বললেন সিগনিফায়ার ও সিগনিফায়েডের সম্পর্ক তথাকথিত শব্দ ও অর্থের সম্পর্কের (বা কার্যকারণের) যে ধ্রুপদী ধারণা সে রকম নয়। প্রথাগত দর্শন শব্দ ও শব্দার্থকে যে উপমায় বারবার বিধৃত করেছে তা হলো দেহ ও আত্মার অবিচ্ছেদ্য সংযুক্তি। অর্থ যেন আত্মার মতো শাশ্বত, অবিনশ্বর। অর্থই উচ্চারিত শব্দের কারণ, ধারক ও অন্তর্নিহিত নিরূপক। সস্যুর জানালেন যে এ ধারণা অমূলক। তিনি ভজালেন সিগনিফায়ার ও সিগনিফায়েড অসম্পৃক্ত, সিগনিফায়ার সিগনিফায়েডকে সৃষ্টি করে একটা বিশেষ সম্পর্ক ও সংগঠনকারী সূত্র মেনে। একটি সিগনিফায়ার বা সংকেত অন্য আরেকটির সঙ্গে একটা শৃঙ্খল স্থাপন করে। সংকেতের ক্ষেত্রান্তরে সিগনিফায়ারগুলি পরস্পর পার্থক্যে একটি সিগনিফায়েড চিহ্নিত করে। 'লাল' শব্দটির অর্থ 'লাল', অর্থাৎ 'থামুন' কারণ যানবাহনাদির প্রথানুযায়ী 'লাল' সংকেতটি 'হরিৎ' বা 'পীত' থেকে ভিন্ন বা পৃথক। ডেরিডা এই বৈপ্লবিক ব্যাখ্যায় আপত্তি

তুললেন, বললেন সিগনিফায়ার সাংকেতিক ক্ষেত্রের পরিসীমাতে একটি বিমুক্ত সম্ভাবনা। এমন নয় যে একটি সংকেত-এর অর্থ তার এক অপরিহার্য অঙ্গ। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচিত হবে। এখন শুধু মনে রাখা প্রয়োজন যে, যেহেতু ডেরিডা সস্যুরকে এবং সস্যুরের অর্থনির্মাণতত্ত্বের ব্যাখ্যা নস্যাৎ করেছেন, সেহেতু ডেরিডাকে স্বভাবতঃ পোস্ট-স্ট্রাকচারালিস্ট বা নির্মাণবাদ-পরবর্তী ভাষাতাত্ত্বিক আখ্যা দেওয়া যথার্থ।

সস্যুর ছাড়া অন্য যে ব্যক্তিত্ব ডেরিডার রচনার প্রেক্ষিতে অপরিহার্য, তিনি অবশ্যই হাইডেগার, জার্মানিতে যাকে নাৎসিরা শেষ পর্যন্ত নাৎসি-বিরোধিতার জন্য সুড়ঙ্গ খুঁড়তে পাঠিয়েছিল। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই হাইডেগার জনপ্রিয় অধ্যাপক, তখনি ধীরে ধীরে লিখছিলেন 'বিইং অ্যাণ্ড টাইম', যদিও তা প্রকাশিত হয় তড়িঘড়ি করে। তবু হাইডেগার গুরুত্ব পাচ্ছেন এই কারণে যে তিনি পাশ্চাত্য দর্শনের মৌলিক চিন্তাগুলি সম্পর্কে যে সব সাড়া জাগানো প্রশ্ন তুলেছিলেন তাতে একদিকে যেমন বনেদি দর্শন বা মেটাফিজিক্সের আহ্লাদিত হবার সুযোগ ঘুচে গেছিল, তেমনি অন্যদিকে ডেরিডার মতো আক্রমণাত্মক চিন্তকদের তা যথেষ্ট ইন্ধন জুগিয়েছিল। হাইডেগার যে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন তাতে পাশ্চাত্য দর্শনের স্রষ্টা স্বয়ং প্লেটোই যেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। অবশ্য শুধু প্লেটো কেন? অ্যারিস্টটল তার মেটাফিজিক্স আর নিকোম্যাকিয়ান এথিক্সে যে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়েছিলেন, যা গ্রীক দর্শনে 'তো অন' এই দুটি শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়, এবং ইংরেজিতে যা হলো 'বিইং', এবং বাংলায় যাকে 'অস্তিত্ব' বা 'সত্য', বোধহয় 'সত্য' বলে তর্জমা করার যৌক্তিকতা আছে, তার উপরে রেখাপাত করবার সামিল হয়েছিল। যা বেশ কয়েক সহস্রাব্দ আগেকার পারসি, মিশরীয় বা ইহুদিদের নিজস্ব তত্ত্ব মনে করা হতো, সে সব বিষয় হাইডেগারের লেখায় নিহিত হলো। 'বিইং' শব্দের তাৎপর্য এই প্রেক্ষিকায় বিচার্য। হাইডেগার অস্তিত্বের প্রশ্ন তুললেন। অস্তিত্ব কী? অন্যত্র দার্শনিকদের রচনায় এ প্রশ্ন করা হয়েছে বটে, তবে হাইডেগার ছিলেন পটু বৈয়াকরণ, তাই তিনি ভাষাতত্ত্বকে তার প্রেক্ষিত করলেন। হাইডেগারের প্রশ্ন অস্তিত্ব অথবা অস্তিত্বের চেতনা ও ভাষার প্রশ্ন। অন্যভাবে বলা যায় হাইডেগারের মত হলো অস্তিত্বের সত্যকে ঘিরে মানুষ যে সব জিজ্ঞাসা উত্থাপন করেছে তা সম্ভব হয়েছে ভাষার সাহায্যেই। ভাষা ব্যবহার না করে যেহেতু কোনো প্রশ্নই করা সম্ভব নয় তাই অস্তিত্বের প্রশ্ন, 'বিইং' এর প্রশ্ন, জার্মান ভাষায় যাকে বলে 'জাইন'-এর প্রশ্ন, অস্তিত্ব সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নই করা হোক না কেন, তা শব্দ অর্থাৎ বাক্য ব্যবহার করেই করতে হয়েছে। হাইডেগারের এ যুক্তি অখণ্ডনীয়।

হাইডেগারের মূল পদ্ধতিটি, অর্থাৎ ভাষাচর্চা করে 'জ্ঞানোন্মোচন' করা, হিরণ্যগর্ভে সন্ধান করতে প্রবৃত্ত হওয়া, তাতো প্লেটো, অ্যারিস্টটলরাই করে গেছে। তারা যা বলেছিলেন, তার মূল কথা হলো যে 'তো অন' অর্থাৎ 'বিইং'-এর প্রশ্ন অন্যান্য আরও প্রশ্নের উপর নির্ভরশীল। অ্যারিস্টটলের 'মেটাফিজিক্স' 'বিইং' সম্পর্কে 'বিইং' বা অস্তিত্ব, অর্থাৎ অব্যয়, বিমূর্ত 'বিইং' নয় বরঞ্চ তা নানাবিধ প্রশ্ন অবতীর্ণ করে। এক, অস্তিত্বের জ্ঞান কি স্বয়ংসম্পূর্ণ, না কি তা বস্তুর উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ তা কি এ বিশ্বপ্রপঞ্চের বহুবিধ বস্তু, উপাদান, প্রাণী, ব্যক্তি ইত্যাদির একটি গুণবিশেষ? দুই, অস্তিত্ব কি কোন কালোত্তীর্ণ চেতনা নাকি

তা কালক্রমে প্রকাশ পায়। তিন, অস্তিত্বই কি একমাত্র সত্য? হাইডেগারও এই হরেকরকম প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, তবে এও জানতেন যে অ্যারিস্টটলের আসল জিজ্ঞাসা ছিল অস্তিত্বের মূলকে নিয়ে। হাইডেগার এখানে নিজস্ব চিন্তাধারার স্বাক্ষর রাখলেন, বুঝতে চেষ্টা করলেন কী করে অস্তিত্বের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌছতে গিয়ে দেখা গেল, যদিও অস্তিত্বের প্রশ্ন একমাত্র ভাষার দ্বারাই করা যেতে পারে, প্রশ্নটি গঠন করা সমস্যাব্যঞ্জক। 'জাইন উণ্ড্ ট্সাইট' বা 'বিইং অ্যাণ্ড টাইম'-এ হাইডেগার বলেছিলেন 'অস্তিত্ব মানে কি তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, কারণ যে মুহূর্তে আমরা অস্তিত্বের অস্তিত্বশীলতা নিয়ে প্রশ্ন করি, তখন অস্তিত্বশীলতা কি তা অনুধাবন করতে সক্ষম হই মাত্র, কিন্তু অস্তিত্বশীলতার নিরাভরণ বা প্রকৃত—অর্থাৎ এসেনশিয়ল্—স্বরূপ দেখতেই পায় না। এমনকি কেবল এক নিরঞ্জন অস্তিত্বশীলতার ধারণা কেমন করে উপস্থাপিত করা যায়, কোন দিগ্বলয়ে, কোন সীমান্তে তার উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়, তাও বোধগম্য হয় না। অস্তিত্বশীলতার এই আংশিক ও অনিশ্চিত অনুধাবন একটি বাস্তব সমস্যা।' অর্থাৎ অস্তিত্বশীলতা আমরা কেবল আঁচ করি, অর্ধস্ফুট কথায় তা কিছুটা ব্যক্ত করবার চেষ্টা করতে পারি। অস্তিত্বের সত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে গেলেই আমরা বুঝি যে অস্তিত্বশীলতার একটা আধা রকমারি জ্ঞান আমরা অর্জন করেছি মাত্র। এটি একটি অনির্বচনীয় ব্যাপার। বাক্যের সাহায্যে, শব্দের কারসাজি করে আমরা যে অস্তিত্বশীলতা অনুধাবন করতে চলেছি সেই প্রয়াসের পরেও অন্বেষণ শেষ হয় না। কারণ আমরা দেখি অস্তিত্বের বোধ ভাবার পটেই প্রতিভাত হয়ে রয়েছে। হাইডেগার এই অস্তিত্ব চেতনার নামকরণ করলেন 'ডাসাইন'। 'ডাসাইন' কী, তা বোঝাতে গেলে বলতে হয় অস্তিত্বের প্রতিভাত হওয়াই 'ডাসাইন'। বাস্তবজগতের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উপকরণ নিজেদের মধ্যে একটা সম্পর্ক নির্মাণ করে এবং সেই সম্পর্কের একটা ক্ষণিক বিকাশ যখন পৃথিবীর বিবর্তনে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাকে বলা যায় 'ডাসাইন'। কোন এক মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করে বলে অস্তিত্ব কালের প্রবাহের উপর নির্ভর করে। হাইডেগার বলেছেন যেহেতু অস্তিত্ব কালের স্রোতে বিকশিত হয়, তা একদিকে যেমন অস্তিত্বশীল, তেমনি অস্তিত্বশীলতার পূর্বে তার কোনরকম অস্তিত্বই থাকে না, অর্থাৎ তা অনস্তিত্বশীল। অতএব, হাইডেগারের যুক্তি অনুযায়ী অস্তিত্বের অনুভব একমাত্র অনস্তিত্বের প্রেক্ষিতে সম্ভব। অস্তিত্ব তার পরিপার্শ্বের বিস্মৃতি, আঁধার ও আবহমানতার অনস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং নেতিবাচকতার পিঠে চড়েই সে উপস্থিত হতে পারে। আবার প্লেটো একটা তত্ত্ব প্রণয়ন করেছিলেন, যার প্রতিপাদ্য বিষয় হোল 'লোগোস'। ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থিত করে বলি—পরে খ্রিষ্টান ধর্মশাস্ত্রে লোগোস শব্দটি কার স্থান পেয়ে যায়। সাধু যোহন লিখেছিলেন সৃষ্টির 'আদিতে রহিয়াছে লোগোস', অর্থাৎ শব্দ। কথাটির তাৎপর্য পাশ্চাত্য দর্শনে বহু-আলোচিত। ঈশ্বর লোগোসের দ্বারা সৃষ্টি করেন। লোগোস বা শব্দই অস্তিত্বের যে ধারণা তার নিরূপক। কার্যকারণ অনুযায়ী শব্দ অস্তিত্বের পূর্বে, অস্তিত্বের প্রমাণ। অর্থাৎ লোগোসই উৎস বা উৎপত্তি, বা ইংরেজিতে 'অরিজিন'। হাইডেগার যে 'ডাসাইন' বা অস্তিত্ববোধের কথা বলেছেন তা এই লোগোসের উদ্ঘাটন।

ডেরিডার নিজস্ব চিন্তাভাবনার প্রথম প্রকাশ 'অফ গ্রামাটোলজিতে', এই বইটিই এখনো পাঠকের কাছে বেশি আগ্রহের। তার কারণ বোধহয় এই যে, এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার পরই নির্মাণতত্ত্বের পরিণতি কী হতে পারে তার হদিশ মিলল। 'অফ গ্রামাটোলজি' প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। 'অফ গ্রামাটোলজি'-তে যে ডেরিডাকে পাওয়া যায় তিনি মূলতঃ ভাষাতাত্ত্বিক। এখান থেকেই, অর্থাৎ যেখানে ডেরিডা সস্যুর দর্শিত ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণ করলেন, সেখান থেকেই আমাদের আলোচনা শুরু করা চলে। সৃষ্টির আদিতে একটা পরম কারণ থাকে। ডেরিডা এই পরম কারণের নামকরণ করলেন 'প্রেজেন্স', মানে যা সদা উপস্থিত বা 'বিদ্যমান'। ডেরিডা বলেছেন পাশ্চাত্য দর্শনের সর্বত্র দার্শনিকেরা এই পরমকারণ বা 'প্রেজেন্স'-এর ধারণাকে লালন করেছেন। কার্যের আগে কারণ—এটাই যেন দর্শনশাস্ত্রের একমাত্র সূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডেরিডা বলেছেন ''সর্বকালের মেটাফিজিক্স এ কথায় বলে, প্লেটো থেকে রুশো, ডেকার্ত থেকে হুসেরল্, যে মন্দের আগে ভালো, নেতির আগে ইতি, মিশ্রণের আগে খাঁটি, জটিলের আগে সরল, স্থূলের আগে সূক্ষ্ম, নকলের আগে আসল। এটাই যেন দর্শনের একমাত্র অপরিবর্তনীয়, গম্ভীর ও ফলপ্রসূ বিধান।'' অধিকন্তু ডেরিডা এও বলতে ছাড়লেন না যে এই উপস্থিতি বা 'প্রেজেন্স'-এর ধারণা মানুষের দর্শনবোধকে রোমাঞ্চহীন করে দিয়েছে। এমনকি উপস্থিতির বিধান এতই কঠোর যে তার যত কিছু তাৎপর্য, সবই হারিয়ে গেছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন এই যে ডেরিডা যে বললেন 'প্রেজেন্স' বলে আদতে কিছু নেই, তা কি গ্রহণযোগ্য? যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে উদাহরণ স্বরূপ জিজ্ঞাসা করা যায় যে আমরা যারা 'আমি' হিসেবে নিজেদের চিনি সেই 'আমি'-র পিছনে যে ব্যক্তিবিশেষ তার কি কোন 'প্রেজেন্স' নেই? 'আমি' কি সংকেতের ঘূর্ণিতে নির্মিত এক প্রচ্ছায়া। আবার ভাষাতত্ত্বের একটি দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যায়। সস্যুরের যুগান্তকারী লেখাতেও 'প্রেজেন্স'-এর রূপকল্প হাজির। ডেরিডা সস্যুরের নির্মাণতত্ত্বে স্ববিরোধের চেহারাটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ডেরিডা বললেন সস্যুর যে সিগনিফায়েড-এর কথা বলেছেন, তাতে মনে হয় যেন শব্দার্থ যেন এক ধ্রুবক, অর্থাৎ শব্দার্থই শব্দের উপস্থিতি বা মূল্য নির্ধারণ করে। যা আমাদের চিন্তার মধ্যে বিদ্যমান। যদি সস্যুর দেখাতে চেয়েছিলেন যে শব্দস্রোতই শব্দার্থ উৎপন্ন করে অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে শব্দার্থই শব্দের আভাস নির্ণয় করে। বলা যায় যে সস্যুরও মানুষের ভাষা নির্মাণ করার প্রক্রিয়াতে মানসকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন; অর্থাৎ সস্যুর যা নস্যাৎ করবেন বলেছিলেন, তা নিয়েই তিনি গোলকধাঁধায় পড়েছিলেন। যে অর্থপ্রাধান্য বর্জন করে তিনি ভাষাবিজ্ঞানে শব্দ বা সংকেতকে সর্বপ্রধান স্থান দেবেন বলেছিলেন সে স্থানে শব্দার্থবোধই তার পাথেয় হয়েছিল।

আরো কৌতুকের এই যে, ডেরিডা বললেন সিগনিফায়েড বা শব্দার্থটিও যেহেতু শুধুই একটা উচ্চারিত শব্দ তাই তা নিজেই একটা সিগনিফায়ার। মোট কথা সিগনিফায়েড কোন-প্রকারেই কোন বিমূর্ত ধ্রুবক নয়; অতএব, প্রাজ্ঞের যত ভাবনা তা নিতান্তই সিগনিফায়ারের প্রকাশ, সংকেতই একমাত্র বিদ্যমান, সংকেতের সংক্রমণেই মানুষের জ্ঞান। না আছে 'সৃষ্টি', না 'শান্তি', না 'স্থিতি'; 'শুভ' নেই, 'অশুভ'ও অন্তর্হিত, বিশ্ববীক্ষা

অতএব শুধু সংক্রামিত সংকেতের, সৃষ্টির বা বিলুপ্তির লীলাক্ষেত্র। ডেরিডার মতামত, আমাদের ভর্তৃহরির মতো, ভাষা ছাড়া মনে বাস্তবজগতের অবয়ব তৈরি হয় না। অর্থাৎ শব্দ বা সংকেত ছাড়া কোনোক্রমেই কোনো কনসেপ্ট অথবা বস্তু বা সত্য ব্যাপারটিকে আমরা নির্মাণ করতে সক্ষম নই। সেই ডেকার্তের পর থেকেই অভিজ্ঞানের প্রশ্নে বিভাজন হয়ে গেছে। বিশেষ করে ডেভিড হিউম এবং অন্যত্র এম্পিরিসিস্ট্‌রা বুঝিয়েছিলেন যে চোখে-দেখা জগৎ আর আসল জগৎ এক নয়। আপাতঃ আর অন্তরের সম্পর্ক সংস্থাপন করতে বা ভাঙতে তারা উদ্যত ছিলেন, অতঃপর তারা কোন অদৃশ্য বা বিমূর্ত, বা গুপ্ত বা অন্তরর্নিহিত অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। ইদানীং চলছে এই আপাতঃ জগতের দর্শন, প্রত্যুৎপন্ন বাক্‌দর্শন, শব্দদর্শন বা সংকেত দর্শনের। বাক্ নির্মিত চৈতন্য শুধু দার্শনিকের নয়, সকল প্রকার জ্ঞানের কুলদেবতা ওই বাগ্‌দেব।

ডেরিডা রুশোর লেখা পাঠ করার সঙ্কল্প গ্রহণ নিয়েছিলেন 'অফ্ গ্রামাটোলজি'-র একটি অধ্যায়ে। এই যে দর্শনশাস্ত্র বা মেটাফিজিক্সের পিছনে লুকনো প্রেজেন্স, শাস্ত্রের সদা উপস্থিত চিত্তকল্প, এই আইডিয়াটা খণ্ডন করার চেষ্টা ডেরিডা প্রথম থেকেই করেছেন। সংক্ষেপে বলা যায় রুশোর লেখা 'এসে অন্ দি অরিজিন অব্ ল্যাঙোয়েজ' এও ওই একই কথা। অরিজিন, উৎস, বীজ, প্রথম, একমেবদ্বিতীয়ম আর শব্দব্রহ্ম—এইসব একই ভাবনা; যেন ব্রহ্মা নিদ্রাভঙ্গ করে ভোরবেলা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। রুশো বলেছিলেন ভাব যদিও অচিন্ত্য, তবু এই অব্যক্ত, নিরঞ্জন ভাবলোকের স্পর্শে শব্দ ধ্বনিত হলো। রুশো আরো বলেছিলেন সংগীতেরও আধার যেহেতু ভাব, সাংগীতিক স্বরও ভাবলোক আশ্রয় করে ফেরে। ভাবের উপস্থিতি যেখানে, সেখান থেকে সংগীত ও শব্দের নির্ঝর নেমে এসেছে; দুইয়ের উৎপত্তি যেহেতু এক, তাই সভ্যতার উৎসে স্বর ও শব্দ সেহেতু সামান্য। তাই শব্দকে সাংগীতিক মনে হয়। ইতিহাসের প্রত্যুষে কান পাতলে সংগীতের কলতান শোনা যায়। এমন 'প্রেজেন্স'-ভিত্তিক দর্শনে ডেরিডার প্রবল আপত্তি। তিনি বললেন রুশোর বলার ভঙ্গিতে মনে হয় মানুষের ভাষা প্রথমে সত্য ও সুন্দর আর ইতিহাসের পরবর্তীকালে রুগ্ন, ক্লিষ্ট হয়েছে। ডেরিডা বললেন, রুশো ভাল করেছেন, যেন উৎসের মধ্যে কোনো দোষ ছিল না। কারণ জেনেসিস-এ যেন পতনেরও শুরু, ধ্বংসের ভাঙনেরও উৎস- "মনে হয় (রুশো বলছেন) জেনেসিস-এ যে মানুষের স্খলনের কথা লেখা ছিল না, যেন উৎসের পরে বিনাশ সৃষ্টির বাইরে থেকে সংযোজিত হয়েছিল"। এক অর্থে উৎস এবং অন্তকে ডেরিডা একত্রে স্থান দিলেন। খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরা এ কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। খ্রিষ্টান ইতিহাসের প্রাক্‌কালে মানির দ্বিবিধ বিদ্যা থেকে অগাস্টিন বা অ্যাকুইনাস্ এই ধরনের ব্যাখ্যার সাহায্যে যিশুর বাণীকে তা থেকে অসম্পৃক্ত করেছিলেন। আলো যেন অব্যয় আর অন্ধকার যেন তাকে আক্রমণ করার জন্য নিঃশব্দে বসেছিল, এ-কথা মানি শিখিয়েছিলেন। অগাস্টিন বলেছিলেন ব্রহ্মাণ্ডে দ্বৈতসত্তা আছে এ-কথা উঁচু মার্গের দর্শনে মেলে না। শুধু ভালো আছে, শুভ আছে-এক আছে, নচেৎ নয়। আলোই চিরন্তন এবং আঁধার কেবল অনুপস্থিতি ছাড়া আর কিছু নয়। তবে ডেরিডা যে এভাবে ঐক্যের কথা বলেছেন তা নয়।

উৎপন্ন বীজ যেমন মহীরূহতে আকার নেয়, তারপর ফল দেয়, আবার বীজ উৎপন্ন করে মৃত্তিকায় প্রোথিত করার স্বাবলম্বী নক্‌শা করে, আর এই করেই প্রজননের পরিবর্ধ অব্যাহত রাখে তেমন করে চলে সংকেত বা শব্দ। ডেরিডা বললেন 'উৎস', 'অরিজিন', 'প্রেজেন্স', কথাটা বা সংকেতটির অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের জননের যে সাংকেতিক বাক্-ব্যাখ্যা তারও এই প্রজনন ধর্মিতা রয়েছে। কারণ রুশো যে অরিজিন বা উৎসের কথা বলেছেন, তা নিয়ে আমরা বালখিল্যের মতো কথা বলতে পারি মাত্র। উৎসকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করি শব্দের শৃঙ্খলে, কিন্তু সেই উৎস কি ধরা দিয়েছে? আসলে উৎসে ফেরার যে ইচ্ছা আমরা লালন করি, তা নষ্ট্যালজিয়া মাত্র। উৎসকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শুধু শব্দের পর শব্দ, অন্তহীন শব্দরাশি উৎকীর্ণ হচ্ছে। শেষ কথা বলতে গেলেও পুনরায় কথার মালাই গাঁথতে যাওয়া হয়। 'অফ গ্রামাটোলজি'-তে ডেরিডা একেই বলেছেন সাপ্লিমেন্ট। এই মুহূর্তে মানুষের রচনা প্রক্রিয়া যখন স্তব্ধ হলো তখন উৎপত্তিতে ফেরবার প্রয়াসে আমি আবার লেখা শুরু করলাম; আলোচনা যত অগ্রসর হয়; যেন এক অদৃশ্য নির্মাণ বৃক্ষের সৃষ্টি হয়। এ প্রক্রিয়ার কোন শেষ নেই। ডেরিডা এ প্রক্রিয়ায় রসমিশ্রিত কৌতুক উপলব্ধি করলেন। তিনি বললেন আনন্দ, 'জেউ', যে-অর্থে সংকেতে মজে থাকা যায়। এই বীজ চরিত্র ব্যাখ্যা করার জন্য ডেরিডা একটি গ্রন্থের নাম দেন 'বীজধর্মিতা', লা দিসেমিনেসিওঁ। ইংরেজিতে ডিস্‌সেমিনেশন। তাঁর নিজের কথায় এ-গ্রন্থের সারসংক্ষেপ করা যায়, 'প্রথম শুক্রকীট প্রথম জনন বা ইনসেমিনেশন তা কেবলই ডিস্‌সেমিনেশন বা প্রজনন। গর্ভধারণ করা মাত্র শুক্রাণু নতুন এক প্রাণের ট্রেস, যাকে বলে সাক্ষ্য বা পথানুসরণের চিহ্নমাত্র, যা পূর্ববর্ত্তী সকল বৈশিষ্ট্য হারিয়ে থাকে। যদি আমরা ভাষার কথায় ধরি (ডিসকোর্স, বা টেক্সট অর্থাৎ পাঠ্য) কিংবা যদি কোনো সত্যিকার 'বীজ' বপনের কথাই ধরি, এই দুটো পদ্ধতিতেই আসলে এক অতীত বিস্মৃত, নবনির্মিত বীজাণু, আবার এক নতুন শব্দ বা পাঠ্য সৃষ্ট হওয়ার প্রক্রিয়া বা সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়। সংকেত যার ধর্ম অনেকটাই বীজের মতো, তা বীজের মতোই সর্বত্র প্রক্ষিপ্ত হয়ে, অন্যত্র উপ্ত হয়ে ওঠে। ডেরিডার এই উক্তি মনে করিয়ে দেয় প্যারাবল অব সোয়ার-এর কথা। এ-গল্প বলেছিলেন খ্রিষ্ট। চাষি বীজ ছড়াল, কিছু বীজ নষ্ট হলো, কিছু উপ্ত হলো। বীজের ভিতরেই গ্রন্থিত ছিল শব্দব্রহ্ম। এ-গল্পের জের টেনে বলা যায় ডেরিডা হয়ত প্রকৃতপক্ষে, মিস্টিক সাধক। সংকেতের স্বয়ংক্রিয়তার পিঠে পিঠে সংকেতের অন্তহীন উদ্ভব, একেতো প্রাণশক্তিরহিত বলে মনে করা যায় না। ডেরিডা কি তবে সৃষ্টির রহস্য অনুসরণ করছেন? অর্থাৎ যেন একঅন্তঃশীল প্রাণের দায়ভাগ বয়ে ডেরিডা রচনা করছেন। তবে একথা ঠিক যে ডেরিডা পড়তে পড়তে এ বোধ যদি জন্মায় তাহলে পাঠককে সেজন্য দোষ দেওয়া যাবে না। কেননা ডেরিডার লেখনীর একপিঠে এই অব্যক্ত রহস্যের প্রমত্ততার উন্মুখতা। আবার ওপিঠে অন্য চিত্র। সংকেত বিজ্ঞান নিছক বাস্তব বিদ্যাও বটে। সংকেত ব্যতীত কিছু নেই। সংকেতের ধর্ম যেন এই যে তা তার পূর্বজ ক্ষেত্র ছেড়ে কেবল নব্যবাক্য নির্মাণ করতে পারে। ডেরিডা যেন দু-নৌকায় পা রেখেছেন। সিগনিফায়ার বা বাক্ নবনির্মাণ করে, প্রত্যাবর্তন করা তার পক্ষে অসম্ভব। তার উপর তার বুদ্ধির পদ্ধতিও যেন কতকটা

আঁচ করা যায়। এক অর্থে তা বীজের মতো, অন্য-অর্থে, সংকেতের বিনির্মিত উৎপ্রেক্ষায় গঠিত হয় সংকেতের ক্ষেত্রান্তর।

'ডিফারন্স' বা বৈকল্পের তাৎপর্য ডেরিডা আলোচনা করেছেন 'পোজিশনস্'-এ। 'অব্ গ্রামাটোলজি'-র অনেক পরে প্রকাশিত হয় ডিস্‌সেমিনেশন, ১৯৭২-এ। সে বছরই বেরোয় 'পোজিশনস্'। এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে ছাপা হয়েছিল ডেরিডার সঙ্গে রঁসের কথাবার্তার বিবরণ। ডেরিডার বাক্‌দর্শন ঠিক দার্শনিকের দর্শন নয় কারণ তিনি যে একজন তাত্ত্বিক, এ কথা ডেরিডা নারাজ। তাঁর কাজ কেবল দর্শনগ্রন্থ পাঠ করা এবং এযাবৎ মেটাফিজিক্সের যে সব সন্দেহাতীত সত্যকথায় লোকে আত্মতুষ্ট থেকেছে তা খতিয়ে দেখা। 'পোজিশনস্'-এ রঁস তাকে সংকেত বা সিগনিফায়ারের বৈকল্প বা ডিফারন্স নিয়ে প্রশ্ন করেন। তাছাড়া ইংরেজিতে ডিফারেন্স শব্দটির সঙ্গে ডিফারন্স বা বৈকল্পের সম্পর্কটিই বা কী? এ প্রসঙ্গে ডেরিডার মতামত স্পষ্ট। তাঁর লেখাগুলিতে পূর্বোক্ত ট্রেস, বলা যায় পদাঙ্ক, পদচিহ্ন এবং ডিফারন্স বা বৈকল্প প্রায় একই কথা। ডেরিডার মন্তব্য, 'এক, বৈকল্প মানে স্বেচ্ছায় বা আপনা থেকেই অপসৃত হওয়া, দেরি করিয়ে দেওয়া বা অন্যস্থানে অর্পণ করা। দুই, এই দেরি করার পদ্ধতিতেই বৈকল্প বিকল্প কিছু তৈরি করে; অর্থাৎ একটি শব্দ আরেকটি থেকে বিকল্পিত হয় বা পৃথক অস্তিত্ব লাভ করে শব্দের বৈকল্পের দ্বারা। তিন, বৈকল্প যেহেতু বিকল্প সৃষ্টি করে তার একটা সৃষ্টিশীল ক্ষমতা থাকে। বৈকল্পই শব্দ বা যে কোনো সংকেতের সেই রহস্যময় গুণ যা বৈচিত্র্য উদ্ভব করে। অতএব বৈকল্প এক নিয়ামক শক্তি। শুধু বিকল্প বলতে আমরা এত কিছু বুঝি না। খালি পার্থক্য বা বৈপরীত্যের কথা ভাবি।

এই যে শক্তি প্রবাহ বা পার্থক্যের উৎপাদক ধর্মের কথা বলা হলো, একে আবার সেই বীজধর্মিতার প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। যার দ্বারা বিকল্প প্রতিভাত হয় সে শক্তির নাম রাখা হয়েছে বৈকল্প। ট্রেস বা পদাঙ্ক একই ভাবনা বা কথা। ট্রেস হলো যাকে বলে শব্দের পদচিহ্ন। যেমন যেমন শব্দ লিখিত হয় তেমন তেমন সে একদিকে তার অতীত বা সংলগ্ন শব্দের ক্ষেত্র অবদমন করে অগ্রসর হয়, আবার অন্যদিকে অন্য শব্দের সঙ্গে সংযোজিত হয়। শব্দ উচ্চারণের মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়। সে সংকেতের অপর এক অনাম্নী, অজানা রহস্যময় সংগঠন সার্থক করে তোলে। যেন আঁচড় কাটা হলো, ভাষা প্রক্ষিপ্ত হয়ে নিজ সজীবতায়, মহাজাগতিক এক চেতনার প্রান্তে নবনির্মিত হচ্ছে এবং কেমন করে এই যাদু ঘটে চলে তা কখনোই অল্প কথায় ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ নির্ণয় করতে গেলেই প্রত্যুৎপন্ন শব্দ তার অনুসন্ধানের লক্ষ্য ছেড়ে, অনুসন্ধানের পদাঙ্ক বিনির্মিত করে সংকেতের অন্য বিন্যাস সৃষ্টি করে, তাকে করায়ত্ত করা যায় না। অতএব যদি কেউ একরোখা বাস্তববাদী অথবা এম্পিরিসিস্ট হন, যদি তাঁর ন্যূনতম সাযুজ্যবোধ থাকে, তিনি মানতে বাধ্য হবেন যে সত্য কেবলই শব্দ বা সংকেতপ্রমাণ। অনুমিত সত্যই হোক, পরোক্ষই হোক, প্রত্যক্ষই হোক যা সত্য তা নিতান্তই শব্দ বৈকল্পেই প্রকাশিত। সংকেত যে তার আপন ক্ষেত্র বিনির্মিত করে, আবার নবনির্মিত করে—এ-ব্যাকরণ কখনো লঙ্ঘিত হয় না। এই অটুট ব্যাকরণই বোধহয় ব্যাকরণ বিজ্ঞান। ডেরিডা তার নামকরণ করেছেন সায়েন্স অব্ রাইটিং, বা গ্রামাটোলজি বৈকল্প যার চরিত্র।

ডেরিডার রচনার দুটি দিক বিবেচনা করা বাদ রইল। এ-দুটো দিক যেহেতু বাঙালি বুদ্ধিজীবির প্রিয় বিষয়, তাই তা নিয়ে একটু কথা বলা দরকার। এক সাহিত্য। পাঠককুল সাহিত্যে বিনির্মাণ নিয়ে নাজেহাল। অবশ্য এ-নিয়ে স্বয়ং ডেরিডার উত্তেজিত হবার বিশেষ কোনো কারণ নেই, প্রাথমিকভাবে নিজেকে তিনি দর্শনশাস্ত্রের পাঠক হিসেবে চেনেন। এ সত্ত্বেও তাঁকে অন্য সংজ্ঞায় চেনানোর প্রয়াস হয়েছে, ফলে তাঁকে, দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকার ডিকনস্ট্রাকশনের মিডলম্যানেরা সাহিত্যে পোষ্ট-স্ট্রাকচারালিজম্ নিয়ে গলদ্ঘর্ম। তবে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না, কেননা এ কথা ভাবা অযৌক্তিক যে সর্বসাধারণের ডেরিডার অন্তর্দৃষ্ট থাকতে হবে। সাহিত্যপাঠে বিনির্মাণের জন্য অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন কি? এ প্রশ্নের উত্তর 'মেটাফর' কথাটির পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়া যেতে পারে। অন্তর্দৃষ্টি এক ধরণের ওস্তাদি, মেটাফরকে ধরার কায়দা, ভাষার মেটাফরসিটি অর্থাৎ রূপকনির্ভরতা হল উপমা গুণ। কথাটার অর্থ, হেগেল যেমন বলেছিলেন তা হলো, কোনো নির্দিষ্ট শব্দকে তার সাধারণ সাদামাটা প্রেক্ষিত থেকে একটা আধ্যাত্মিক বলয়ে প্রেরিত করা। অর্থাৎ যদি বলা হয় 'শূন্য মন্দির মোর' তা হলে ধরে নিতে হবে যে 'মন্দির' শব্দটিকে একটি স্থান বিশেষ-এর অর্থপ্রেক্ষিত থেকে সরিয়ে মনের বিরহভাবের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ডেরিডা এ-মত খণ্ডন করেন তাঁর 'মার্জিন্স অব্ ফিলজফি' বইটিতে। 'হোয়াইট মিথোলজি' অধ্যায়ে ডেরিডা বলেছেন হেগেল যে এই শব্দের প্রতিসরণের কথা বলছেন, তা আসলে শব্দের এক ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হওয়া। 'আধ্যাত্মিক' নামাঙ্কিত কোন ক্ষেত্রে—নৈব নৈব চ। আদতে এই ধারণার ধ্রুপদী ব্যাখ্যা অ্যারিস্টটলের। ডেরিডা অ্যারিস্টটলের উপমার সংজ্ঞা তার রচনায় বিধৃত করলেন, মেটাফরের অর্থ কোন একটা শব্দকে তার স্বাভাবিক স্থান থেকে অপসারিত করা এবং অন্য-কোনো স্থানে উপস্থাপিত করা। এরও একটি লজিক আছে। গ্রীকভাষায় যাকে বলে আনালোগোন। বাংলা করলে বলতে হয় সাদৃশ্য। অর্থাৎ এই সংকেতটি অপর-একটি সদৃশ সংকেতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলো। ডেরিডা মেটাফরের এ-বৃত্তান্ত অস্বীকার করলেন না বটে, তিনি দেখালেন যে প্রকৃতিতে সাদৃশ্যর উদাহরণ অপ্রতুল নয়, এবং মেটাফর নিতান্তই একটি শব্দকে অন্য একটি সদৃশ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করার পদ্ধতি। তবে অ্যারিস্টটল আরো বলছেন যে, শব্দসায়রে এই যে গুপ্ত লুক্কাইত বা অনির্বচনীয় সাদৃশ্য, তা নির্ণয় করাই প্রতিভা এবং প্রতিভাবান ব্যক্তিই নাকি উপমা ব্যবহার করতে পারে। ডেরিডার উপসংহার এই যে সেক্ষেত্রে প্রতিভাবান ব্যক্তি এই লুক্কায়িত সাদৃশ্য প্রনিধান করছে, সংকেতের পাশ থেকে সংকেত তুলে অন্য মালায় গাঁথছে। কিন্তু যে সাদৃশ্য লুকনো, বা অনির্বচনীয় সে সাদৃশ্য সে কেমন করে ব্যক্ত! এই অদৃশ্য সাদৃশ্য, যে সাদৃশ্য প্রকৃতপক্ষে অবর্তমান, তাকে অনুভব করা সম্ভব হয় কী উপায়ে তা কে বলবে?

এই প্রশ্ন উত্থাপনের পরেই ডেরিডা মেটাফরসিটির আরেক দিক নিয়ে মন্তব্য করছেন এবং এই সুযোগে ভালেরির 'ইন প্রেইজ অব্ ওয়াটার', 'জলকীর্তন' নামে একটি প্রবন্ধের বিনির্মাণ করছেন। জলকে, যেমন পাশ্চাত্ত্য মেটাফিজিক্সে, পাশ্চাত্ত্য পুরাণেও, সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, ভালেরিও তেমনি তাঁর জলের গুণকীর্তনে বলেছেন—সেই সত্যের রূপ নির্ঝরের মতো, একটি উৎসস্থল থেকে তা নিঃসৃত হচ্ছে আর তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা মেটাচ্ছে।

ভালেরি বললেন, হে জল-দেবতা আপনাকে প্রণাম। ডেরিডা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এই সরলীকরণকে অস্বীকার করলেন। বললেন, ভালেরি শুধু এ প্রবন্ধে নয়, কাব্যে, গল্পে, কথকতায় বারবার এই উৎসের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু উৎসের দিকে নির্দেশ করতে গিয়েই সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। উৎস বা সত্য আসলে কী, তাতো ভালেরি বর্ণনা করতে পারেননি, বরং উল্‌টে উপমার পাহাড় নির্মাণ করে সেই সত্যের কেন্দ্র থেকে পরিযায়ী হয়েছেন। একের পর এক সত্যপুরাণ; সত্য যেন জল, নির্ঝর, অন্তঃশীলা ইত্যাদি ইত্যাদি। কেবল তা সত্য নয়। শুধু তাই নয়, ডেরিডা বললেন তৃষ্ণার্তের যা তেষ্টা মেটায়, সেই জল বইছে বটে, পরন্তু তা কোন গঙ্গোত্রি থেকে নির্গত হয়েছে কে বলবে! যে স্থানে সেই কূপ ভালেরি খনন করেছেন সে স্থানের ভৌগোলিক অস্তিত্বই নেই। অথবা বলা যেতে পারে যে তার অস্তিত্ব রয়েছে কেবল শব্দের ইন্দ্রজালে, বিন্যাসে, পাঠ্যে। অতএব এই সংকেত শৃঙ্খলাই সত্যের স্থান। অর্থাৎ উৎসের স্থান, অস্তিত্বের আধার, সেই নিরাভরণ ও বাস্তবিক অনস্তিত্বের সংকেতপটে। এ আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে অস্তিত্বের মায়াব্যাখ্যায় সংকেতের প্রান্তে তা উদ্‌ভাসিত হয় বটে, তবুও এ এক অখণ্ডনীয় বিপদ যে সে প্রান্ত হতে সত্যের অবিসম্বাদিত, প্রমিত উপস্থিতি নির্ণয় করা চলে না।

আরেকটি জরুরি প্রসঙ্গ আলোচনা করা প্রয়োজন। ডেরিডার এক সতীর্থ জে. এল. হুডেবিন ডেরিডাকে একটি প্রশ্ন করেছিলেন—ডেরিডাকে পর্যুদস্ত করতে না পারলেও প্রশ্নটি ডেরিডাকে মাথা ঘামাতে বাধ্য করেছিল। হুডেবিনের সরল জিজ্ঞাসা ছিল এই যে বিনির্মাণ আর মার্কস্‌বাদের সম্পর্ক কি! অর্থাৎ মার্কস বর্ণিত ইতিহাস বিনির্মাণ করলে কী দাঁড়ায়! ডেরিডা এ প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন যে তা নয়। বাস্তব ইতিহাসকে বিনাশ করার যে অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে তোলা হয়, সেটি কিছুটা অমূলক। মার্কস্‌বাদ সম্পর্কে ডেরিডার যা মতামত, ইতিহাস সম্পর্কেও অনেকটা তাই। ডেরিডা নিজেই সংক্ষেপে তা বাতলেছেন। মার্কস্‌বাদ নিয়ে ডেরিডার মন্তব্য কিছুটা এ রকম। ডেরিডা মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুললেন এই মর্মে যে 'বস্তু' প্রকৃতপক্ষে 'বস্তু' নয়। অতএব 'বস্তু' প্রকৃতপক্ষে কি? এ প্রশ্নের উত্তরে নিজেই বললেন বস্তুকে যেন পাঠক কখনোই অবিসংবাদিত সিগনিফায়েড বা একটি অস্তিত্ববান ঘটবিশেষ বলে ভেবে না বসেন। বস্তু কথাটিও সিগনিফায়ার, একটি শব্দ মাত্র। তাই বস্তুর বাস্তবিকতা ডায়ালেকটিকসকে নিয়ন্ত্রণ করে এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়। লেনিনও যদিও বলেছেন বস্তুর প্রাধান্যেই ইতিহাস বিবর্তিত হয় তবুও এ কথা ডেরিডা কষ্টিপাথরে যাচাই করবেন। বস্তুবাদের ভাষিক উপস্থাপনের বাইরে একটা বহির্জগৎ মেনে নিতে ডেরিডা নারাজ। তার জায়গায় তিনি বাস্তবিকতার একটি সাংকেতিক ব্যাখ্যা এবং রূপান্তরের কথা ভেবেছেন। ইতিহাসের প্রশ্নেও ডেরিডার উত্তর প্রায় সমার্থক। ইতিহাসের মূলসূত্রটি কী তা বড়ো কথা নয়, ডেরিডার কাছে সূত্র নির্মাণের ইতিহাসই বড়ো কথা। একদিকে ডেরিডার এ উক্তি যেমন ইতিহাস বা মার্কস্‌বাদের পরিপন্থী, তেমনি অন্যদিকে ইতিহাস ও মার্কস্‌বাদকে তন্নিষ্ঠচিত্তে গ্রহণ করে তার একটা পরিবর্তন সাধন করাই এর এক উদ্দেশ্য। ডেরিডা একে একটা প্রকাণ্ড প্রকল্প বলে অভিহিত করেছেন। এ কাজ ডেরিডা নিজে করেননি, বরং পরবর্তী প্রজন্মের হাতে ন্যস্ত করা সাব্যস্ত করেছিলেন।

৬

বিনির্মাণ ও সাহিত্যতত্ত্ব

প্রাচীন বৈয়াকরণ, পণ্ডিতেরা বলেছিলেন পদ্যের সব রস নিহিত রয়েছে উপমায়, শব্দার্থে। এই বিষয়টি নিয়ে নীতিদীর্ঘ আলোচনা করলে আমাদের কাব্য নিয়ে ভাবনা ফলপ্রসূ হবে, আমাদের এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করবে। কবিতার যারা সহৃদয় পাঠক, তারা স্বীকার করবেন যে কবিতার মাধুর্য তার বাক্যের বিন্যাসে, ভাবনায়, অর্থে উন্মোচিত হয়ে ওঠে। কবিতা সম্বন্ধে এইটেই বোধহয় সারকথা, নতুন করে যাকে বলতে পারি 'অর্থপ্রতীতি'। কারণ কি সেই চমৎকার অনুভূতি যা কবিতায় আমরা অনুভব করি, যার স্বাদ আমাদের ক্ষণিকের জন্য মোহিত করে রাখে। সঠিক করে বলার দায় থেকে ছাড়া পেলে বোধহয় আমরা তাকে সম্মোহনও বলতে পারি—লৌকিক বাস্তবকে তা তুচ্ছাতিতুচ্ছ করে রাখে, পর্যবসিত করে, কারণ সমাজ-সংসার, বা এই কায়িক অস্তিত্বের ব্যয়ভারকে পরাজিত করে সেই সুন্দর বারে বারে আত্মপ্রকাশ করছে। কবিতার যে এই সম্মোহনশক্তি রয়েছে তার দৃষ্টান্ত কেবল কবিতার মধ্যেই পাওয়া যাবে বলা বাহুল্য—এই অনুভূতি বাক্যের বিন্যাসে কোন অব্যর্থ শৃঙ্খলায় রচিত হয়ে থাকে। তবে কেবলমাত্র ছন্দে নয়, যে কোন রচনা, গদ্য, সাময়িকী বা এমনকি কোন ঘোষণাপত্র বা বক্তৃতার মধ্যে তা আত্মপ্রকাশ করতে পারে। একমাত্র শব্দই সেই সুন্দরের অনুভূতিকে বয়ে নিয়ে চলে যেমন করে নৈবেদ্য বা নির্মাল্যের সৃজনে আমরা অর্পণের অদৃশ্য ভাব মাধুর্য প্রত্যক্ষ করি।

অর্থাৎ কবিতার এই সৌন্দর্য, এই সম্মোহনী ভাব একান্তই কবিতার বাক্‌বিন্যাসে নিহিত। কবিতার শব্দ যা কবিতার শরীরকে গঠন করে তা পাঠকের অনুভবকে স্পর্শ করে। তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সেটাই স্বাভাবিক। মানুষের প্রকৃতিতেই এই অনুভূতির উদ্ভাসিত হওয়ার সহজাত প্রবণতা আছে, সে বিষয়ে সে ক্ষমতা অর্জন করেছে। শব্দের যে এই অতীন্দ্রিয়, অপরিমেয় গুণ আছে তা খুব সহজ কথা নয়—শব্দের মধ্যে অনন্ত গভীরতা, অনন্ত বোধ। পাঠক যতি কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডী-বর্ণনার কথা স্মরণ করেন, সেই চন্দনশোভিত ভালে শ্বেত কণিকা যেমন উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত, চণ্ডীর হাতের মুদ্রানৈপুণ্যে সেই পুষ্প বা অস্ত্রের সংবর্ত, কিরীট, দেবীর চোখের রহস্যব্যঞ্জনা ইত্যাদি, তাহলেই দেখবেন শব্দের কি সেই শক্তি, কি সেই অর্থপ্রাচুর্য, ইঙ্গিত, ভাব; শব্দের কি সেই সম্মোহিনী; শব্দের কি সেই অলৌকিক উদ্ভাস, যা কবির বর্ণনায় বিস্তৃত এই রূপকে প্রত্যক্ষ করতে আমাদের সাহায্য করছে। শব্দই কবিতার গুণ নির্ণয় করে এবং সেই কারণেই

শব্দের প্রতি এত গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। সেই কারণেই বোধহয় শব্দকে বৈয়াকরণ উপাস্য বলে মনে করছেন এবং তাকে সত্যের, সুন্দরের, এমনকি অনাদি ব্রহ্মের প্রমাণ বলে মনে করেছেন। বস্তুত শব্দই পাঠক বা শ্রোতৃর কল্পনাকে নতুন করে সজাগ করে তুলছে, আন্দোলিত করছে। শব্দের এই অসীম গুণের জন্য তার প্রতি যে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে তা নতুন কথা নয় এবং যুগে যুগে কবি, মনীষীরা শব্দের সাধনা করেছেন।

কাব্যের অলঙ্কারের মধ্যে যে শব্দ প্রয়োগটি সবচেয়ে শ্রুতিমধুর, সবচেয়ে ব্যঞ্জনাময়, তা বোধহয় 'উপমা'—অর্থাৎ সেই তুলনা যা শব্দকে নতুন অর্থ প্রদান করে। ইংরাজী সাহিত্যে এই পদটিকে বলা হয়েছে 'মেটাফর' এবং লক্ষ্যণীয় যে শুধু ইংরাজী সাহিত্য নয়, প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন কাব্যে 'মেটাফর'-এর ব্যবহার সর্বত্র চোখে পড়ে। স্বয়ং অ্যারিষ্টটল এ বিষয়ে টীকাভাষ্য লিখে গেছেন এবং আজকে যে উত্তর-আধুনিক প্রবন্ধ সাহিত্যের একটা বিশেষ দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি তার প্রতিপাদ্য বিষয় অবশ্যই 'মেটাফর'। সেই প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হওয়ার আগে নাবিক যেমন জলের স্রোত নিরীক্ষণ করেন, তেমন করে আমাদের প্রসঙ্গানুযায়ী আলোচনা শুরু করতে হয়। বস্তুত আমরা জানি যে অলংকার শাস্ত্রে 'উপমা', 'রূপক' তথা 'উৎপ্রেক্ষা'-র মতো অলংকারগুলিকে অর্থ সম্পর্কিত বিশেষ শব্দপ্রয়োগ বলে মনে করা হয়েছে—এদের অর্থনির্ভর অলংকার বলা হয় এবং নিছক বাকচাতুর্যের অলংকারের থেকে (যেমন 'অনুপ্রাস') এদের পৃথক করা হয়েছে। অন্ততঃ এই পার্থক্যের ফলে কাব্যগুণ সম্বন্ধে একটি বিশেষ অভিনিবেশ লক্ষ্য করা যায় এবং নিঃসন্দেহে মনে করা যায় যে অর্থের মাহাত্ম্যের মধ্যে কাব্যের উন্মোচন সম্ভব হচ্ছে এবং নেহাৎ শব্দপ্রক্ষেপ নয় বরং আরও কিছু আছে যা কবিতার অন্তর্নিহিত জগতে সুন্দরের বোধকে নিরূপণ করে এবং তাকে উচ্চারণের সামান্যতা দান করে। অর্থাৎ ধরা যাক, সেই উপমাটির কথা, যা সকলেরই জানা, যেখানে কবি বলছেন 'তোমার ক্ষণিক প্রেমই অন্তিমের অব্যয় পাড়ানি'। সেখানে প্রেম চিত্রিত হচ্ছে কিন্তু তাতে এক অলীক অস্তিত্বের ভাব ব্যক্ত হয়েছে বলে বোধ হয়; যেন সেই 'অন্তিমের' কোন রূপ আশ্রয় করে। অর্থাৎ 'অন্তিম' এখানে কোন রমণী বিশেষ যে তার পদাঙ্ক বা সাক্ষর রেখে গেছে। 'অন্তিম' সেই রমণী বিশেষ, আলোক সুন্দর স্থাপত্যের মতো। এখানে লক্ষ্যণীয় যে 'অন্তিম'—এই শব্দটির আভিধানিক তাৎপর্য ছেড়ে আমরা অর্থপ্রতীতির নতুন রহস্যময় বলয়ের ভিতরে প্রবেশ করেছি। এই স্থানবিশেষ নিতান্তই আমাদের মানসের এমন কোন অভিজ্ঞতার সঙ্গম যেখানে শব্দ আরও ব্যাপক, আরও গভীর ভাবে অর্থসম্পৃক্ত হয়েছে। কবি এখানে প্রেম সম্পর্কে তার চেতনার কথা জাহির করছেন পাঠকের কাছে এবং কল্পনার হিসেব নিকেশ করতে গিয়ে তার দিবাস্বপ্নকে স্বাধীনতা দিয়েছেন যাতে করে প্রেমের মুহূর্তটিকে পাঠকের কাছে সচিত্র, বাঙ্ময় করে তোলা যায়। তার জন্য তিনি 'অন্তিম'-সঙ্গে রমণীর তুলনা করছেন এবং তার ক্ষণস্থায়ী, রূপসী, ব্যাভিচারি ভাবের প্রসঙ্গ টেনে আনছেন। শব্দের এই রূপকতা বা উপমাধর্মীতাকেই সম্ভবত প্রাচ্যের আলংকারিক 'মেটাফর' বলছেন। 'মেটা' অর্থাৎ অতি বা 'পরা' এবং

'ফেরেইন' অর্থাৎ যাকে বহন করা হয়েছে। অতিবাহিত হয়েছে যে শব্দ, যে শব্দ অর্থবাহিত হয়ে প্রতীত, উদ্ভাসিত হয়েছে।

'মেটাফর' কবির অত্যন্ত প্রিয়। মণির মত তার দাম—কবির কাজ কারিগরের। সে মণি-মুক্তো দিয়ে যে কুণ্ডল তৈরি করছে, নক্সি জড়োয়ার হার গাঁথছে, তাতে সেই প্রীতি উপচে পড়ছে, শোভার প্রাচুর্যে, রোশনাইতে। এই সেই অলংকারগুণ যা সুন্দরকে বিধৃত করে। এই অপসারিত শব্দের নতুন ব্যঞ্জনা, নতুন ধ্বনি, নতুন বোধি, যার জামানত রয়েছে কেবলমাত্র কবির অন্তরে তা হরকিস্ ফুরোবার নয়। 'মেটাফর'-এর দৃষ্টান্ত আছে রবীন্দ্রকাব্যে এবং 'সোনার তরী'-তে সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে যা আরও পরে লেখা নানা কবিতাগুচ্ছের নানা রূপকে বিধৃত করে—এমনকি এও বলা যায়, 'লিপিকায়' এক আশ্চর্য কাল্পনিক পট এক নতুন চিত্রকাব্যে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে 'সোনার তরী'-তে যে ফসল কবি জোগাড় করেছেন, যে শস্যের ভাঁড়ার আসলে তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ, সঞ্চিত ধন, সেখানে শব্দের নানা মূর্তিত রূপের মধ্যে একাকিত্বের এক অনুভূতি আমরা স্পর্শ করতে পারি। 'সোনার তরী'-তে যে দ্বীপ থেকে দীপান্তর যাত্রা, এ পার থেকে নৌকায় করে অন্য কোন দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা—এ সবই অর্থগুণে মানসের অন্য কোন ইতিহাস সৃষ্টি করে। কিন্তু বস্তুতঃ আরও তাৎপর্যপূর্ণতা দেখি 'লিপিকা'-র সেই গদ্যকবিতায়, যেখানে কবি দরজার দুই পাল্লাকে, দুই সখার সাথে তুলনা করেন এবং একে অপরের পরিপূর্ণতার অপেক্ষায়, যেন প্রেয়সী কিংবা প্রেমিকের মতো উপস্থাপিত করেন। 'লিপিকা'-য় শব্দার্থ অলীক, নাটকীয়, ঐক্যের অনুসৃত। এই 'লিপিকা'-তেই এক অর্থে বাঙলা আধুনিক কাব্যের বাস্তব চেতনাকে আমরা দেখতে শুরু করেছি, দ্রব্য বা সংসারের আটপৌরে জিনিসগুলো এখানে কল্পনার অদৃশ্য পরতে তলিয়ে অদ্ভুত সব চিত্র সৃষ্টি করেছে। এই নতুন বর্ণনাই কাব্যকে আধুনিক করে তুলেছে—কারণ পরিণাম ও মুক্তির নতুন তত্ত্ব, অসারতা আর নির্জীব কাঠিন্যের অন্ধকার ভেদ করে বজ্র বা আলোকরশ্মির প্রকাশ, পাঠকের মনকে আচ্ছন্ন করেছে—এই সব নিয়ে আধুনিক কাব্যের শব্দ বাঙ্ময় হয়েছে। 'লিপিকা'র সেই কবিতাটির কথাই যদি ধরি যেখানে এক তাপস তপস্যার আয়োজন ছেড়ে দিলেন, স্বর্গের অমর্ত্য বরদান ছেড়ে দিলেন কেবল অবলা কাঠকুড়ানির হাতের সেবাটুকু গ্রহণ করবেন বলে, তার মধ্যেই এক নতুন কাব্যমহিমার সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক সেই কাঠকুড়ানির লিজেণ্ড বা মিথ্ হালহকিকতের। শব্দের উপমায় একটা বিশেষ মিথ বা কাহিনী বর্ণনার মধ্যে একটা মানবিক নৈকট্য ব্যক্ত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'য় যে ব্যক্তিগত ভাবনার কবিতার, মতামতের কবিতার আমরা হদিশ পাই, কালের অব্যর্থ নিয়মে দেখছি সেটাই বাঙলা আধুনিক কাব্যের নতুন, বিশেষ ধারা হয়ে গড়ে উঠল। জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'—এই একই কল্পনাপ্রবণতার প্রমাণ। যে উপমা বা 'মেটাফর'-এর আলোচনা করছিলাম তা বনলতার বর্ণনায় চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করছে। 'চুল তার অন্ধকার বিদিশার নিশা'। 'লিপিকা'-য় ততটা নয় যতটা জীবনানন্দের কাব্যে আমরা সুনিপুণ 'মেটাফর'-এর দৃষ্টান্ত পাই। 'বনলতা সেন', তা তিনি যিনিই হন যে এই বিশেষ কেশরাজির অধিকারি ছিলেন আমরা বাস্তবে মানতে নারাজ। কিন্তু কবির

কল্পনাই শ্রেষ্ঠ কারণ সেই কেশরাজির সৌন্দর্য বিবৃত রয়েছে বিদিশা নগরীর রাত্রির অনুভবের মধ্যে। এই যে শব্দ যা আমাদের জানায় যে বনলতা সেন-এর কেশদাম যেন বিদিশার নিশা তা আপাত দৃষ্টিতে স্ববিরোধী, কারণ কেশ কেমন করে নিশা হতে পারে এবং তাও এই প্রায় অচেনা নগরীর তা হাটে-বাজারের মানুষের বুদ্ধিতে আসবে না। কিন্তু কবির সেই বিলাসিতা করার অবকাশ আছে—আর পণ্যের দরে নয় বরং আনন্দে, খুশিতে, নিষ্প্রয়োজনে বনলতা সেন এমনই রহস্যের পাত্রী হয়েছেন যে তার কেশরাশিতে এক ঘোর নিশা প্রকট হয়েছে। শব্দ এখানে হাকিমের খবরদারি মানবে না। শব্দের অর্থ এখানে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সেখানে আমরা বাস্তবের স্ববিরোধকে অস্বীকার করেছি, বনলতার চুলকে বিদিশার নিশা বলে মেনে নিয়েছি, তার মুখে শ্রাবস্তীর কারুকার্য উপস্থিত ও বিদ্যমান জেনে বিলাপ করছি না। এই হল মেটাফরের গুণ যে তাতে আমাদের চেনা জানা সংসারের সব বাঁধা নিয়ম ভেঙে যায় আর আমাদের সন্ধান দেয় সেই ঐক্যের যাতে এই ক্লিন্ন, ক্লিষ্ট সংসারের সব বাটোয়ারা করা জিনিসগুলো, সেই সব সংকেতগুলো বদলে যায়, মিলে যায়, অন্য হয়ে ফিরে আসে। কবিতার মধ্যেই সেই বিলাসের সুযোগ ঘটে যাতে আমরা ভাবতে শিখি যে শব্দের ও শব্দের মধ্যে যে বিরোধ তা নিতান্তই ক্ষণিকের, আমাদের 'অন্নপানদোষদুষ্ট' দৃষ্টির প্রভাব। আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জীবনকে পিছনে ফেলে আমরা ঐক্যের সন্ধান পাই। যে অনন্ত অর্থ বা ইঙ্গিতের সম্ভাবনা আমাদের জন্যে অপেক্ষারত বলে জেনেছি। কেমন করে শব্দ এই বাঙ্‌ময়তা অর্জন করতে পারে তা আমাদের আলোচ্য বিষয়-বিশেষ করে একটা প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে। প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ডেরিডা-তাঁকে বিশ শতকের অন্যতম বড় দার্শনিক বলে মনে করা হয়েছে। আগে যখন ডেরিডার লেখা আলোচনা করেছি তখন আমার পরিণত হওয়ার অবসর ছিল, আজ আরও স্পষ্ট দৃষ্টি নিয়ে তার প্রবন্ধ পাঠ করতে পারি। ডেরিডার নৈয়াইকতার জুড়ি মেলা ভার, তাঁর শব্দপ্রমাণের যে প্রাথমিক পদক্ষেপ, তাঁর বক্তব্য। যে শব্দই অভিজ্ঞতা অর্জনের একমাত্র উপায় ও আধার এবং শব্দের প্রক্ষিপ্ত রূপেই, শব্দের সংক্রমণেই যে আমাদের বাইরের জগৎ সম্বন্ধীয় সব অভিজ্ঞা বা প্রশ্ন তৈরী হয়, তার মূল্য, অন্ততঃ যুক্তি বিচারে গ্রহণযোগ্য বটে কিন্তু তা সত্ত্বেও বোধ করি তার তত্ত্বে কিছু ফাঁকি আছে যেটা আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি।

বস্তুতঃ 'মেটাফর' নিয়েই কিন্তু ডেরিডা আলোচনা করেছেন 'হোয়াইট মিথোলজি'-তে। তাঁর ব্যাখ্যার শুরু অবশ্যই অ্যারিস্টটলকে উদ্দেশ্য করে। সে কথায় আসার আগে এই মেটাফরের রহস্য উন্মোচন করা দরকার। 'মেটাফর'-কে অতএব বলা হচ্ছে শব্দের সঙ্গে শব্দের যে মিল, যে অব্যক্ত ধ্বনির মাধুর্য বিরাজ করছে, তার দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ কবি যখন না-ফোঁটা গোলাপ আর নবাঢ়ূঢ়া রমণীর মধ্যে কোন সাদৃশ্য অনুধাবন করেন তখন তিনি 'মেটাফর'-এর প্রভাব কায়েম করছেন। কবি যখন বেদনায়, সহমর্মীতায় 'পূর্ণিমার চাঁদে'-র সঙ্গে 'রুটি'-র সম্পর্ক কায়েম করেন তখন তিনি প্রকৃতির এই প্রায় পরস্পর বিপরীত ধারণাগুলিকে একত্রে স্থান করে দিতে সক্ষম হচ্ছেন। অ্যারিস্টটল তাই ভজিয়েছিলেন-পোয়েটিক্‌স-এ কবি এই দুটি ভিন্ন শব্দের মধ্যে এক অব্যক্ত, অদৃশ্য সম্বন্ধকে

অনুভব করতে পারেন এবং সে জন্যই তিনি কবি। কবি সৃষ্টির পার্থক্যের ভিতরে, ভিন্নতার ভিতরে, অনন্য বৈচিত্র্যের ভিতরে এক ঐক্যের সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছেন। কবি মনীষীর এই সেই বীক্ষা যাতে করে সে জানে যে বহুর মধ্যে, বিপরীতের মধ্যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে, বিক্ষিপ্তের মধ্যে একটা ঐক্য আছে। সৃষ্টির এই একদেশদর্শিতাই সৃষ্টির নিয়ামক। অতএব শব্দ যদিও এই বৈচিত্র্যের বা বৈপরীত্যের সংকেত তথাপি শব্দের অর্থগুণেই বা শব্দের স্ফোটশক্তিতেই সৃষ্টির একতা আমাদের গোচর হচ্ছে। আর এই ঐক্যের সংস্পর্শে আসতে পারলে আমরা সৃষ্টির উৎসারে অংশগ্রহণ করতে পারছি। আমরা 'মেটাফর' বা উপমার বর্ণনায় সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করছি বটে এবং যতক্ষণ সেই সত্য বা একতাকে অনুভব করতে পারছি ততক্ষণই আমরা সেই একক সৃষ্টিশীলতার উপাসনা করার একটা ছাড়পত্র পেয়েছি বলে মনে করতে পারি। গ্রীক দার্শনিক উপরন্তু আরও নিশ্চিত করে বলেছিলেন যে একমাত্র কবিই পারেন এই আপাত-বিপরীত শব্দার্থের একতাকে অনুভব করতে। যে মানুষ অষ্ট প্রহরের দরকার মেটাতে কাজ করে তার কাছে পৃথিবী খণ্ডিত হয়ে আছে। কাটাকুটি করা, ঘরে বসে সাজানো, পরিপাটি করা। কিন্তু কবির কাছে শব্দ সব কাঁচের মতো স্বচ্ছ, একে অন্যের সঙ্গে অর্থের প্রতীতিশক্তিতে মিলে যায়। কবির এই দৃষ্টি কবিকে সাধারণের থেকে অন্য মান অর্পণ করে। কবি শাব্দিকেরও বাড়া, কারণ সে শব্দের উৎসে সচকিতে দেখতে পাচ্ছে অর্থনির্মিতির কারিগরকে, 'শব্দের অন্তরের সেই শব্দ' বলে এলিয়ট যা ব্যক্ত করেছিলেন 'লিটল গিডিং'-এ।

শব্দের এই অর্থনির্মিতির ক্ষমতা অত্যন্ত সূক্ষ্ম উপলব্ধির ব্যাপার। এই অর্থনির্মাণ তাহলে কেমন করে সম্ভব হয়? মেটাফরের ক্ষেত্রেই। ধরা যাক, শব্দ যে অর্থ সৃষ্টি করে, নতুন অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে, তাতে এমন মনে করবার কারণ নেই যে শব্দ ও অর্থ দুটি পৃথক সত্তা। এবং পূর্বেই বলেছি আমরা মানি যে শব্দ হচ্ছে অর্থের বাহ্যিক বা কায়িক রূপমাত্রা। আমরা বিশ্বাস করি যে, মেটাফরেই যেমন হয়, শব্দের সঙ্গে শব্দের যে অদৃশ্য সম্পর্ক, যা নিতান্তই ভাব ও অর্থের, তা কবির চোখে ধরা দিয়েছে। অথচ উত্তর-আধুনিক তাত্ত্বিক বা ভাষা তাত্ত্বিক (যেমন ডেরিডা), মনে করেন যে এই সম্পর্কের, অর্থাৎ শব্দের সঙ্গে শব্দের অবগুণ্ঠিত এই মিলের বাস্তব কোন অস্তিত্ব নেই। নব্যতাত্ত্বিক বলছেন যে এই গূঢ় সম্পর্ক যদি সত্যিই থাকে তা শব্দের সূত্রেই অনুধাবন করা সম্ভব। সেই বিমূর্ত যোগসূত্রের প্রমাণ একমাত্র শব্দই বটে। শব্দের দ্বারাই আমরা এই কল্পিত সম্বন্ধের কথা জানতে পারি। বিশেষ করে ডেরিডা বলছেন শব্দই শ্রেষ্ঠ ইঙ্গিত ও প্রমাণ। তাছাড়া শব্দসংকেত ছাড়া অর্থের প্রতীতি সম্বন্ধে আমরা ধারণা করতে পারি না। এই শব্দের কুহক ভেদ করে অন্য কোন বলয়ের প্রতি ইঙ্গিত করার যে প্রবণতা আমরা কাব্যতাত্ত্বিকের তত্ত্বে পেয়েছি, কাব্যতাত্ত্বিকের কবি সম্বন্ধে সেই অন্তরীণ দৃষ্টির সংবাদ সবই ভ্রান্ত ধারণা। ডেরিডার মতে উপমা শব্দের উচ্চমার্গের অর্থ ইঙ্গিত করে না। উপমা কেবল অন্যতর বা নতুন একটি শব্দবিন্যাস বা শব্দ শৃংখলা। কারণ শব্দই প্রমাণ এবং শব্দের যে ধ্বনিত, সুন্দর, ভিন্নমাত্রিক কোন সত্তার প্রতি ইঙ্গিত করার ক্ষমতা আছে তা যুক্তির সোপানে টিকতে পারে না।

বিনির্মাণ তাত্ত্বিকের এই সিদ্ধান্ত প্রায় স্ববিরোধী মন্তব্যের সামিল, কারণ যদিও তিনি বলছেন যে অব্যয় অর্থ বলে কিছু নেই, বাক্যের শব্দ শৃংখলাই স্বততঃই একমাত্র প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা যায়, আমাদের মনে হয় যে শব্দ কেবল আভিধানিক অর্থের বাহক নয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে তার স্তরের তারতম্য ঘটে। আমাদের কথোপকথনেই এই প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্তের প্রতুল। যখন 'সোনা' বলা হয় তখন সে 'সোনা'-র মূল্য নির্ভর করে প্রেক্ষিতের উপর। এই প্রেক্ষিতজ্ঞানই বোধহয় অর্থের একমাত্র নির্ণায়ক। বৈয়াকরণ যাকে স্ফোট বলেছেন তা বোধহয় শব্দার্থের এই চালিকাশক্তি এবং তা শ্রুত বা লিখিত শব্দের থেকে পৃথক কোন সত্ত্বা নয়। অতএব বণিকের কাছে 'সোনা' হতে পারে দরদামের বা গয়নার কাঁচামাল কিন্তু মায়ের কাছে 'সোনা' হল আপনার থেকে স্নেহের সম্পদ, সেই 'সন্তান', বড় আদরের, রাজার ধনও যার সমতুল নয়। আবার 'সোনা' মানে নিতান্ত শখের কোন দ্রব্য হতে পারে। শুনেছি গৃহস্বামী গিন্নির জন্য ইলিশ এনে বলছেন 'খাঁটি সোনা' এনেছেন। ভাষাবিজ্ঞানীর কাজ 'সোনা'-র এই সামাজিক হ্রাস বৃদ্ধির উপর নজর রাখা, সোনা কেবল সোনা নয়, যা মাটির তলা থেকে খনিমজুর খনন করে তুলে এনেছেন। সোনার মূল্য কেবল দরদাম বা ষ্টক এক্সচেঞ্জের নয়, সরকারি সঞ্চয়ের হিসেব খতিয়ান নয়, তার মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে মানুষের বাক্‌পটুতায়। 'সোনা'-র এই যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা তা তাত্ত্বিক ডেরিডার কাছে নেহাৎ ছলনা হতে পারে। ডেরিডা বলছেন এটা অর্থ সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস (কারণ 'সোনা' এই শব্দটিই কেবল বিদ্যমান)। অথচ কবির কাছে সোনার স্বর্ণকারিতাই কাজের কাঁচামাল, শব্দের এই ব্যঞ্জনা, এই ধ্বনিবৈচিত্র্যই পাঠকের কাছে সমাদরের বস্তু। ডেরিডা যদিও বলবেন যে বনলতার 'চুল' 'বিদিশার নিশা'-র সঙ্গে আদৌ কোন অর্থের অদৃশ্য সূত্রে যুক্ত নয় বা আদৌ যে সেই তুলনার কোন প্রত্যক্ষ ভিত্তি নেই আমরা যারা কবিতার মজদুরি করি তারা জানি এই বিভ্রান্তিকে মেনে নেওয়া কতটা জরুরি।

ডেরিডার রচনাতে পাচ্ছি এই প্রত্যয়হীনতার কথা। তিনি যদি ইদানীন্তন ভাষাতত্ত্বের প্রতিভু হন তিনি তবে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ তত্ত্বের নিয়ামক নন। এ কথা সত্যিই যে ডেরিডার অন্ততঃ এই একটি জায়গা অত্যন্ত অকাট্য। শব্দই প্রমাণ এবং শব্দই বিদ্যমান। শব্দ ছাড়া কোন অব্যয় 'অস্তিতি' অর্থাৎ 'বীইং' নামক কোন প্রমিত, আধারের কল্পনা নিরর্থক। শব্দের এই মহান অনুশাসন যদি একমাত্র সূত্র হয় তাহলে কোন মহাজাগতিক কারণ বা সত্যের ধারণাকে আমরা নস্যাৎ করতে প্রবৃত্ত হই। এই ঈশনিরপেক্ষ চিন্তার মধ্যে একটা সততা, প্রকৃতি ও মহাপৃথিবী সম্বন্ধীয় একটা ভীতি আর নৈরাশ্য কাজ করে যা মানুষকে মানুষের জ্ঞাত জগতের সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত, সঠিক মতপোষণ করতে সাহায্য করে। এইখানেই বিনির্মাণতত্ত্বের অপরিমেয় মূল্য। কিন্তু এইখানেই সংসারের জটিল ও সুন্দর কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য নিঃশেষিত হয় না। তাই বিনির্মাণ তত্ত্বের শব্দনিরূপণ মেনে নিলেও আমাদের শব্দের বৈচিত্র্য ও ভ্রান্তিকর অস্তিত্বের সত্যকে, ক্ষণিকের জন্য হলেও, মেনে নিতে হয়। একটি দৃষ্টান্ত আমাদের বক্তব্যকে আরও সুদৃঢ় করে প্রতিষ্ঠা করবে বলেই বিশ্বাস করি। অতএব ডেরিডার মতে যদি শব্দই একমাত্র প্রমাণ হয় তাহলে 'সুখ', 'দুঃখ',

'ভাল', 'মন্দ', 'সুবিচার', 'অবিচার', 'শুভ', 'অশুভ', এ সব নিতান্তই শব্দ এবং এই সব অনুভূতি, গুণাগুণ বা সত্যাসত্য সবই প্রক্রিয়াকরণ, এই সব অনুভূতি শব্দের অংশভাগ। যিনি অপরিণামদর্শী তাঁর পক্ষে এ কথা তাৎপর্যবহ বটে কারণ শব্দই তা উন্মোচিত করে যে কেবল প্রতীতি রয়েছে কিন্তু অস্তিত্বশীল কিছু নেই 'শুভ', ও 'অশুভ', এই দুটি কেবল শব্দ, নচেৎ নয়। কেবল মাত্র 'শুভ' বোধ শ্রেয়, এমন কথার কোন গুরুত্ব নেই কারণ 'শুভ' বোধটিও মানুষের গোটা শব্দঅভিজ্ঞার একটি মুহূর্ত। বিনির্মাণ তাত্ত্বিক বলবেন এই মুহূর্ত জ্ঞান হয়ত সম্ভব কিন্তু অব্যয়, অস্তিত্বমান 'শুভ' কোন 'চিরন্তন' বা 'অন্তিম' আধার নয়। অথচ এতৎসত্ত্বেও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আমাদের বেঁচে থাকার মধ্যে একটা দায় আছে, একটা ন্যায়-অন্যায় বোধ আছে। আমাদের বিবেক আছে আর জবাবদিহি করবার অবকাশ সৃষ্টি হয়। অতএব আমরা জানি এই সংসারে বিনির্মাণ তাত্ত্বিকের নিরাসক্ত দৃষ্টি পাওয়ার আগে সুখ দুঃখের, শুভ অশুভের নিরশন করতে হয়, আমাদের শুভ কাজ করতে হয়। শান্তি প্রতিষ্ঠা করার সঙ্কল্প করতে হয়। এই অস্তিত্বের বিড়ম্বনার মধ্যে দিয়েই আমাদের মুক্তির আকাশে উড্ডীন হওয়া সম্ভব। বস্তুতঃ আমরা খেচর নই কিন্তু খেচরের ধর্মেই আমাদের সিদ্ধিলাভ। ধরিত্রী আর আকাশের সংযোগ আমাদের স্থাপন করতেই হয়েছে। আমরা শব্দের উচ্চারণেই সুখ দুঃখ ও সত্য মিথ্যার পরীক্ষা করতে সক্ষম হই এবং সেই পরীক্ষা ছাড়া আরও মহৎ অস্তিত্ব-বিষয়ক শিক্ষার স্তরে পৌঁছনোর অনুমতি পাই না। যে অর্থপ্রতীতির বুকে শুভাশুভের বোধ তার অব্যয়, নিরাসক্ত ভাবের অনুসন্ধান সম্ভব কেবলমাত্র এই শব্দের বৈপরীত্যের ভিতর দিয়ে।

শব্দ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ডেরিডা নিজে অবশ্য শব্দের আরেকটি গুণ নিয়ে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। আমাদের এ পর্যন্ত আলোচনায় কিঞ্চিতধিক আলোকপাত করলেও বর্তমানে সে উক্তির প্রতি মনোনিবেশ করা যায়। শব্দের যে কাব্যগুণ অর্জন করার ক্ষমতা আছে এ কথা কেবল প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটল নন—জার্মান পণ্ডিত হেগেলও বাতলেছেন। ডেরিডা স্বয়ং দেখছি এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। স্বয়ং অ্যারিষ্টটলই শব্দ ও অর্থের এই অবিভেদ্য সম্পর্ককে তাঁর কাব্যতত্ত্বের প্রাথমিক সত্যি বলে মেনে নিয়েছেন। শব্দই যে অর্থের বাহ্যিক বা শ্রুত রূপ, দেহ যেমন আত্মার বাহ্যিক বা কায়িক প্রকাশ, সেটা অ্যারিষ্টটলের কাব্যবিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য—অথচ এই প্রাথমিক ভাবনাটিকে উত্তর-আধুনিক তাত্ত্বিক বা যাকে বাঙ্লা ভাষায় বিনির্মাণতাত্ত্বিক বলা হয়েছে, তিনি অস্বীকার করেন। প্রকৃতপক্ষে অ্যারিষ্টটল বলেছেন যে 'মেটাফর' এক বিশেষ ধরণের শব্দপ্রয়োগ, একটি শব্দের যদি আরেকটি ভিন্নার্থক শব্দের সঙ্গে সংযোগ ঘটে তাহলে সেখানে 'মেটাফর' সংশ্লিষ্ট হয়েছে মনে করা যায়। বস্তুতঃ ঠিক এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করেছিলেন ফরাসী ভাষাতাত্ত্বিক জাক ডেরিডা। এই দুরূহ বিষয়টি আলোচনা করার আগে 'মেটাফর' কথাটির তাৎপর্য পুনর্বিশ্লেষণ করা উচিত। 'মেটাফর'-এর সংজ্ঞা কি?—মেটাফর হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে অ্যারিষ্টটল যাকে বলেছেন 'সমশব্দ' বা অ্যানালজি। সমশব্দের তত্ত্ব ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে এমনকি ব্যাকরণেও নেই বললেই চলে। এখন গ্রীক দার্শনিক বলেছেন যদি এমন চারটি শব্দ থাকে, অর্থাৎ চারটি সমশব্দ

থাকে যাতে প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির একটি সম্পর্ক থাকে এবং তৃতীয়টির সঙ্গে চতুর্থটির একটি সম্পর্ক থাকে সে অবস্থায় দ্বিতীয় শব্দটিকে তৃতীয় বা চতুর্থ শব্দটি দিয়ে স্থানান্তরিত বা অপসৃত করা যায়। এখন দুটি শব্দ 'মরু' ও 'উট' বলা বাহুল্য সম্পর্কিত তো বটে। আবার 'জাহাজ' ও 'সাগর' তেমনই সম্পর্কিত। অ্যারিষ্টটলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'উট' শব্দটিকে যদি 'জাহাজ' শব্দটি দিয়ে অপসৃত করা যায় তাহলে আমরা পাচ্ছি 'মরুর জাহাজ'। এখানে 'উট'-কে আমরা মরুভূমির বুকে গতিমান কোন জাহাজ বা জলযানের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। মরুভূমির এই জলযান সেই উড্ডীন ও নিরাসক্ত উট, যার উপরে নির্ভর করতে হতে পারে, কোন বেদুইন দিদৃক্ষা সহকারে যাত্রা করেন।

হেগেল উনিশ শতকের জার্মান ভাষাতত্ত্বের অন্যতম জনক। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য তার ট্র্যাজেডি সম্বন্ধীয় আলোচনা। প্রাবন্ধিকের ব্যাক্তিগত মতে হেগেল পক্ষপাতদুষ্ট লেখক এবং তার অধিকাংশ তত্ত্বকেই আমাদের বৃহৎ অপটু খৃষ্টীয় দর্শন বলে বোধ হয়। এক্ষেত্রে তার তত্ত্বের একদেশদর্শিতা এত প্রকট হয়ে ওঠে যে তাতে নৈপুণ্যের অভাব ঘটে। নৈয়াইক যেমন ন্যায় বিচারকে মানবের জ্ঞান অন্বেষণের প্রধান বা প্রাথমিক উপকরণ বলে মনে করেন, তেমন করে দেখলে হেগেলের তত্ত্বে কিছু অসামঞ্জস্য চোখে পড়ে—বিশেষ করে তার ডায়ালেক্টিকের তত্ত্বে পরিণতি বোধটা বেশী বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ের অন্তর আমি এই মুহূর্তে স্পর্শ করতে চাই না, বরং হেগেলকে ডেরিডা যেমন করে পাঠ করেছিলেন সে দিকে দৃষ্টি নিবব্ধ রাখতে পারি। সেখানেই দেখতে পাচ্ছি শব্দ বিষয়ক মন্তব্য। এখন হেগেল প্রায় গ্রীকদের মতানুসারেই বলেছিলেন বোধহয়, যে কাব্যে শব্দ নতুন অর্থের বলয়ে, নতুন কল্পনায় স্থানান্তরিত হয়। এই স্থানান্তরকরণ বা শব্দের অপসারণ শব্দকে কাব্যগুণে সমৃদ্ধ করে। এই তত্ত্বের তাৎপর্য বোধকরি কিছুটা মানব আত্মার অন্তর্নিহিত সত্যে, বোধির ধর্মেই নিহিত রয়েছে। আমরা এভাবে ভাবতে পারি এবং হেগেলীয় ডায়ালেক্টিকের ধারণা এ প্রসঙ্গে অবান্তর নয় যে আমাদের মানসের উৎকর্য সাধন হয় মানসের প্রত্যাবর্তনে। সম্ভবত এই প্রত্যাবর্তনেই আত্মা বা জীব কোন বিশ্বজনীন, জায়মান অস্তিত্বের সঙ্গে বিপ্লবতায় মিলিত হচ্ছে। মানবের ক্ষুদ্র আত্মা, ক্ষুদ্র অস্তিত্ব, মহৎ কোন চৈতন্যের সকাশে হয়ত ফিরে আসে। কবি যখন তার মানসের এই বিশালতার বোধ নিয়ে শব্দ প্রয়োগ করেন বা সাহিত্যে শব্দ সংস্থাপিত করেন এবং এমন উপায়ে শব্দকে ব্যবহার করতে পারেন যাতে সেই শব্দ সেই মহৎ অস্তিত্ব বা 'বীইং' বা 'সেলফ'-এর নৈকট্যে উচ্চারিত হতে পারে, তখন শব্দ কাব্যগুণ সমৃদ্ধ হয়েছে বলে মনে করা হয়। শব্দকে যখন এই প্রক্রিয়ায় অর্থ প্রদান করা হয় তখন তা মেটাফরে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ শব্দকে যখন মানসের উচ্চতর বৈভব প্রদান করা হয় তখন তার মধ্যে কাব্যগুণ আত্মপ্রকাশ করে। শব্দ রস সম্পৃক্ত হয়। এইখানেই বোধহয় হেগেলের রসতত্ত্ব সার্থক হয়ে উঠেছে। রস বস্তুতঃ টানাপোড়েনের ভাববিপ্রলাপ নয়। শব্দের মধ্যে এই যে আধ্যাত্মিক আস্থা স্থাপন একেই উপমার রস বলা যায়। কি সেই প্রক্রিয়া যার জন্যে শব্দের এই নতুন তাৎপর্য অর্পণ?

অথচ উত্তর-আধুনিক কালের দার্শনিকেরা আজ বারংবার বলছেন যে, শব্দের ব্যাপারে

এই ভেদজ্ঞান শব্দ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয় না। উত্তর-আধুনিক বিনির্মাণতাত্ত্বিক বলছেন হেগেলের মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয় কারণ শব্দকে এই উপরিউক্ত প্রক্রিয়ায় স্থানান্তরিত করা যায় না। কারণ ঐ সেই অব্যয়, আধ্যাত্মিক লোক বা স্থান সত্যি বিরাজ করছে কিনা, সত্যিই এমন কোন বৈকুণ্ঠ আছে কিনা যা সকল রসের আধার, সকল সৌন্দর্যের আধার, বৈভব, সকল ঐক্যের প্রমাণ, তা কে বলবে? তবে ডেরিডার মত বিনির্মাণ তাত্ত্বিক দেখছি আরও কঠিন, কঠোর শব্দসন্ধানী, তার মতে কেবল শব্দই সৌন্দর্য। শব্দের অন্তরে কোন ভাব নেই, কোন আত্মা নেই, কোন শাশ্বত অর্থ বা সিগ্‌নিফায়েড নেই। অবিনশ্বর বা ধ্রুব বলে কিছু নেই। কেবল শব্দই বিদ্যমান। শব্দ এক ও নিরপেক্ষ। তাতে উঁচু-নীচু বা ভাল-মন্দের পার্থক্য নেই। তাতে অধ্যাত্ম বা আধিভৌতিকের বৈপরীত্য নেই। শব্দের স্বরূপই অতএব সেই অনবদ্য সূত্রের ব্যক্ত রূপ। উত্তর-আধুনিকতার যে প্রমাণ মার্গ, বৈয়াকরণ যাকে শব্দ বলেছেন, তাতে এই সূত্রের উল্লেখ পাচ্ছি কিন্তু যারা কবি, যাদের কাজ মনোরঞ্জন করা, তাদের কাছে এ তত্ত্ব অচল, কারণ শব্দের নানা ভাবের প্রকাশ নিয়ে কবির কারবার। সমাজের জন্যে সে শব্দের ছলনা সৃষ্টি করছে। সে মায়ার খেলায় খেলতে বসেছে। কবি মিথ্যাচারী কিন্তু তার মিথ্যাচার মূল্যের বৈ নয়। তার কাছে অসুন্দর, নীচতা ও গর্হিতবোধ সুন্দরের কাছে মুহ্যমান হয়ে ফের নতুন ভাবনায় দেখা দিয়েছে। কবির কাছে শব্দের সেটুকুই সার্থক।

৭

রবীন্দ্রনাথের ‘আত্মপরিচয়’ একটি পূণর্মূল্যায়ন

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। তার সাহিত্যতত্ত্বের উপরে তার সময় থেকেই আলোকপাত করা হয়েছে। কখনো স্বপক্ষে বা কখনো বিপক্ষে আজ বহুদিন হলো এ বিতর্ক চলেছে। একেবারে গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের সমালোচনা করেছেন এমন রচয়িতা কম নেই। প্রথমেই বলতে হয় রাধাকমলবাবুর কথা যিনি তার “আত্মদ্রোহী সাহিত্য” নামের কাগজে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ তার নিজের যুক্তির বিপরীতেও মত প্রকাশ করেন। এর ফলে রবীন্দ্রনাথের যুক্তির মধ্যে নাকি একটা শুদ্ধ মতামত খাড়া হয় না। বরং একটা তর্ক নির্মিত হলে তা ভিতর থেকে বৈপরীত্যের অভিমুখে ফিরে আসে। তবে রাধাকমল যে প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন তার একটা গুরুত্ব রয়েছে। রাধাকমলের বক্তব্য যদি অনুসরণ করা হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের উপরে কিছুটা দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যেত। এটা মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ যে চিন্তাধারার সূত্রপাত করেছিলেন তার জের বইছে গত পঞ্চাশ বছরের সাহিত্যে, কবিতায়। যে সব কবিরা রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে কিংবা তার পরবর্তীকালে কবিতা লিখেছেন বা কবিতার উৎস নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছেন তারা এই রাবীন্দ্রিক প্রভাব থেকে পুরোটা মুক্তি পাননি। তবে কেবল সে কথা উল্লেখ করবার জন্যেও আমি এখানে উপনীত হইনি বরং আমার চিন্তার স্রোতকে অন্য খাতে নিয়ে যেতে চেয়েছি বলে এ রচনা লেখবার পরিকল্পনা করেছিলাম। অতএব আগে রাধাকমলবাবুর গল্পটা সেরে ফেলা ভাল নতুবা এই রচনার উপক্রমনিকাতে ছেদ পড়তে পারে।

রাধাকমলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে বাক্যসংলাপ হয়েছিল তাতে বিবাদের বিষয় ছিল যাকে বলে এথিক্স্-সংক্রান্ত। নীতিশাস্ত্রের প্রশ্ন। যেখানে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে পুরোটাই নীতিচিন্তার নিরপেক্ষ স্থান দিয়েছিলেন, আর সেই কারণেই তার উপন্যাসের, গল্পের বা কবিতার ভিতরে যে কোনরকম ব্যবহারিক জীবনের তত্ত্ব থাকতে পারে এ কথা তিনি স্বীকার করেননি সেখানে রাধাকমল ঠিক এই সাহিত্যের নীতিপরায়ণতার কথা টেনে আনেন। বস্তুত বর্তমান লেখকের মতে নীতিপরায়ণতা মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর কিন্তু সৃষ্টির কাজে তার দরকার পড়ে না। এখন কান টানলে যেমন মাথা আসে তেমন নীতির

প্রসঙ্গে নৈতিকতার যাথার্থের কথা এসে পড়ে। নীতি মাফিক জীবনযাপন করাটা একটা প্রবৃত্তির ব্যাপার। যখন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ভাল মন্দের বিচার করতে বসি তখন নীতি, সততা বা সত্যবাদীতার দরকার হয়। ইস্কুলের পণ্ডিতমশাই যখন সত্য কথা বলবার শিক্ষা দিয়েছিলেন তখন নীতির প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু সৃষ্টির কারবার চলে অন্য তল্লাটে। সেখানে সুখ দুঃখ বা সত্যি মিথ্যের কোন দরদাম নেই, কোন এক্তিয়ার নেই। সেখানে নীতিকে তুচ্ছ মনে হয়। অথবা তা হয়ত থাকে যেন উন্মেষের অপেক্ষায়। যেদিন ধরিত্রীর বুকে অরণ্যের উন্মেষ ঘটেছিল কিংবা কোন অদৃশ্য অজানা প্রক্রিয়ায় ভূগর্ভের মধ্যে থেকে, ক্ষনিকের শক্তিসঞ্চালনে, বিপুল প্রাণীজগতের সৃষ্টি হয়েছিল, যখন কীট, সরীসৃপ, বন্য জীবন, উভচর ও খেচর সমেত, এবং মানবকে নিয়ে, এই যে চলচ্ছক্তিপ্রাপ্ত জগৎ তৈরী হয়েছিল, তখন যে এই জীবনীশক্তিকে নীতি বা কর্ত্তব্যের প্রশ্রয় পেতে হয়েছিল এ কথা মানা যায় না।

রবীন্দ্র ভাবনায় সাহিত্যের নীতিকথা মানে সাহিত্য যে কোন নীতি বা ধর্মমত প্রকাশ করে তা নয়। সেখানে নীতি সাহিত্যের বাক্যের মধ্যে পুরোপুরি সম্পৃক্ত থাকে। আর এই সম্পৃক্ত থাকাটা খুব সরল ব্যাপার নয়। মানে এমন নয় যে চেষ্টা করলেই কাব্যের থেকে এই নীতিটুকুর পার্থক্য করা যাবে। বাক্যের নক্সার মধ্যে, ছত্রে ছত্রে, এই নীতি নিসিক্ত থাকে। এই থাকা বা না থাকার আলোচনা করা হচ্ছে। কারণ রাধাকমলের কোনরকম তোয়াক্কা না করে যখন রবীন্দ্রনাথ বলেন যে সাহিত্য ব্যাপারটা আপনা থেকেই সম্পূর্ণ তখন এ কথাই মনে হয় যে সাহিত্যে যে বাক্‌বিন্যাস তা নিতান্তই স্বয়ংক্রিয়। এ বিষয় আসবার আগে নীতির কথাটুকু আলোচনা করবার জন্যে বলতে হয় যে সাহিত্যের এই যে স্বকীয় অনন্যনৈতিক চরিত্রের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তাতে নৈতিকতার বাণীকে উপেক্ষা করে তিনি সরাসরি কেবলমাত্র সাহিত্যের এক অনাদিনৈতিকতার বাণীর উপর জোর দিয়েছিলেন। এতেই (রাধাকমল আপত্তি করলেও) রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব নিজের পায়ে খাড়া হয়। 'সাহিত্য...... তো প্রয়োজনের প্রকাশ নহে। চিরকালই সাধারণ মানুষ আপন অন্তরের তাগিদে সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে, সুতরাং আপনার উচ্চতার অভিমানে লোকের জন্য লোকসাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে পদে পদে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা'। (লোকহিত) আপন অন্তরের তাগিদটি ব্যাখ্যা করার জন্য কবি একদিন তাঁর 'আত্মপরিচয়' লিখেছেন। সে পরিচয় সাহিত্যতত্ত্বের ভাঁড়ারে বাঙালীর অপরিসীম প্রাপ্তি।

আত্মপরিচয়ের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না'। কবিতা রচনার যে কোনো নির্দিষ্ট সূত্র থাকতে পারে না এমন একটা কথা কবিতার সকল বিজ্ঞানের বিপরীতে যায়। অন্ততঃ ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে, যেখানে সহৃদয় পাঠক, কবিতার চমৎকার রূপটাকে সমস্তটাই মেনে নিতে পেরেছেন, সেখানেও তিনি মানবেন যে কবিতা নির্মিত বটে নয়তো তা নিয়ে তাত্ত্বিকের মতো হলফনামা রচনা করার আয়োজন করা হোত না। তবে নির্মাণ করার অহমিকাটুকু ছেড়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার কবিপ্রতিভার যে আত্মপরিচয় লিখেছেন তার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। কবিতা লেখার যে কলাকৌশল তাতে তার নিজের কৃতিত্বের থেকে বিধাতার

কৃতিত্বকে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন করে কেউ কাব্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেনি। এক অর্থে বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যতত্ত্বের প্রথম রচয়িতা বলা যায় কিন্তু একটা তত্ত্বকে, এই যে পুরোটাই তার অতীতের স্মৃতিচারণের মধ্যে উপস্থিত করা, এমনটা বঙ্কিম করেননি। তাছাড়া কেবলমাত্র 'আত্মপরিচয়'তে যে সাহিত্যতত্ত্ব কবি নির্মাণ করেছেন তা নিয়ে আমাদের নিবন্ধ লেখার একটা তাৎপর্য আছে। রবীন্দ্রনাথ অন্য যে সকল রচনায় তাঁর কবিতার উৎসারের ব্যাখ্যা করেছেন ও যে সকল জায়গায় কবির অন্তর আর কবির অনুভূতির কথা লিখেছেন তাতে বাক্স্ফোটের এতখানি স্বতঃস্ফূর্ততা, এতখানি চিন্তার প্রাচুর্য কোথাও নেই।

যে পাঠক কবিগুরুর প্রবন্ধ রচনায় কেবল নিখুঁত শৈলীর উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন আমি তাঁর সঙ্গে একমত কিন্তু আমি আরও মনে করি কবিগুরুর বাণীর মধ্যে কোথাও তর্কের বিচ্ছেদ ঘটেনি। 'আত্মপরিচয়' যখন লেখা হয়েছিল তখন কবির মনে যে ভাবনাটা সব থেকে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল তা যে নিতান্তই উপনিষদ অনুসরণ করে গড়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। কবি নিজেই একথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। তবে এটুকু কোন জবানবন্দি নয়, এমনও নয় যেন বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাবনায় কবি অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর আত্মপরিচয় লিখেছিলেন। 'আত্মপরিচয়'তে রবীন্দ্রনাথ যে তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন তা গোটা ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্যকে বহন করে। এমনকি বৈয়াকরণেরা যা বলেছিলেন সে কথা এখানে প্রতীত হয়েছে। একষট্টি সালে বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব সম্পর্কে লিখেছিলেন, শাস্ত্রের আদর্শে দেখলে কবির তত্ত্বের উপস্থাপনা নাকি সবচেয়ে কম তৃপ্তিকর। বুদ্ধদেবের উক্তিতে হঠকারিতা আছে সে কথা বলার দায় আমার নেই, তবে একটু স্থির হয়ে চেয়ে দেখলে রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন মানসিকতা প্রথমেই চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়াই ক্লাসিকাল। একমাত্র এই কারণে রবীন্দ্রনাথকে শাস্ত্রের সরণীতে কোন ঋষীতুল্য তাত্ত্বিকের মত মনে হয়।

যদি এ হেন প্রশ্ন করা হয় যে রবীন্দ্রনাথ কোন্ বিশেষ বৈদান্তিক গ্রন্থের প্রতি ঋণী ছিলেন তা হলে এক কথায় তার সদুত্তর পাওয়া স্কলারের অপচেষ্টার নামান্তরমাত্র হবে। তাছাড়া কবি যে কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব ব্যতীত নিজের অনুভূতির উপরে যথেষ্ট আস্থা রাখতেন সে কথা বলা বাহুল্য। তবে এ সব সত্ত্বেও আমরা বুঝতে পারি কবি কোন্ শাস্ত্র রচয়িতার প্রতি অনুরাগপরবশ হয়ে থাকতে পারেন। এই ধরনের তালিকায় প্রথমেই অবশ্য স্থান পায় যাজ্ঞবল্ক্যের বৃহদাবণ্যক উপনিষদ। অনতিবিলম্বেই দেখব যে আত্মপরিচয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ রচনায় কবি বৃহদারণ্যকের শ্লোক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং সে শ্লোকের মর্মবাণীকে তার জীবনের প্রধান ধর্ম, অন্ততঃ কবি হিসেবে তাঁর জীবনচর্যার সাক্ষ্য দেন, বলে তাকে অভিহিত করছেন। যাজ্ঞবল্ক্যীয় কল্পনার সাথে রবীন্দ্রনাথের একটা অত্যন্ত নিবিড় পরিচয় ছিল। কতকটা বৌদ্ধ এবং কতকটা যাজ্ঞবল্ক্যীয় কল্পনা রবীন্দ্রনাথকে, এবং তার সবিশেষ ক্লাসিসিজম্ বা প্রাচীনতাকে, বুদ্ধদেব বসু যেটাকে সঠিক করে চিহ্নিত করতে পারেননি, ষোলআনা বর্ণিত বা প্রভাবান্বিত করে রাখে। গার্গীর সঙ্গে ঈশ্বর সম্পর্কিত আলোচনায় যাজ্ঞবল্ক্যের যে ঋষিসুলভ জ্ঞান প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথের অনুগত পাঠকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে সেই ঋষিসুলভ সংলাপের একটা মিল আছে।

বিশেষ করে এমন কি ছিল যাতে শুক্ল যজুর্বেদ-এর বৃহদারণ্যক উপনি᠁কে আমরা সর্বপ্রথমেই চিহ্নিত করতে পারি। বস্তুতঃ বৃহদারণ্যক-এর অন্যতম উপকরণ অক্ষরতত্ত্ব। গার্গীকে যেখানে যাজ্ঞবল্ক্য বিধাতার সৃষ্টিশীলতার কথা বর্ণনা করছেন সেখানেই তিনি অক্ষরপুরুষের ব্যাখ্যার সূচনা করছেন। সৃষ্টির প্রত্যেকটি দ্রব্য যেন এক একটি অক্ষর। সৃষ্টির সংকেত, বিধাতার সংকেত। অক্ষরের দ্বারাই এই আকাশ প্রকাশিত হয়েছে। বিধাতার এই অক্ষর রূপকেই রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন। এই উপলব্ধি সেহেতু দৃশ্যমানতায় শুরু অথচ তা পরাবাস্তবিকতায় সমাপ্ত। অথবা বলা চলে কবি যখন সৃষ্টির অক্ষর অসীম অনুভব করেন তখন তাতে অসীমের আভাস উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অতএব ভাবতে হয় অক্ষরের কথা, অক্ষর জ্ঞানের কথা। অক্ষর প্রকৃত অর্থে পুরুষ, যিনি ব্রহ্ম তিনিই অক্ষর এবং আপন খেয়ালে তিনি এই জগতের উন্মোচন করেছেন। এই অক্ষরপুরুষকে ভারতবর্ষ কবি বলে জেনেছে। আর্য পূর্বপুরুষেরা 'কবি' নাম দিয়ে বিধাতাকে নামাঙ্কিত করেছেন। তাদের থেকেই আমরা সেই নামের মহিমার কথা জানতে পেরেছি। ঈশ্বরের এই অক্ষররূপের সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কটুকু কখনো অল্প কথায় উন্মোচন করা যায় এ বিশ্বাস আমাদের নেই তবে আমাদের আত্মার সঙ্গে এই বিরাট অক্ষর-উন্মোচিত সৃষ্টির যে একটা যোগ আছে সে কথা আমরা বুঝি আমাদের অনুভূতি বা উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে।

বাক্য যখন উচ্চারিত হয় তখন তা নিরন্তর কিছু প্রকাশ করে। কাঁচের যেমন স্বচ্ছতা, অথবা নদীর স্রোত যেমন জলরাশির থেকে পৃথক নয় তেমন করে বাকের নিভৃত চরিতকে তার থেকে অসম্পৃক্ত করা চলে না। প্রাচীন বৈয়াকরণ, যেমন ভর্তৃহরি বলেছিলেন যে যার আদি বা অন্ত নেই, যাকে নিধন করা যায় না তথাপি যিনি নিজের খেয়ালে জগতে সৃষ্টির খেলা রচনা করে চলেছেন তিনিই অক্ষর। এই অক্ষরবিধাতা আমাদের শাস্ত্রের বাক্যে উচ্চারিত হয়েছেন। মানুষের সরলতার কাছে এ যেন এক প্রবঞ্চনা যে আমরা বাক্যের উচ্চারণ কানে শুনতে পাই কিন্তু সে উচ্চারণের অন্তরনিহিত প্রাণ বা কারণ কেবল আমাদের মানসের অতিসূক্ষ্ম স্তরে বিকশিত হয়। অক্ষরসংকেত, অর্থাৎ এই খণ্ডিত অক্ষর, বা সংকেত, বাক্যের চিহ্নমাত্র যে নিগুঢ় প্রক্রিয়ায় বাক্য সংস্থাপিত হয় তাকে মানসচক্ষে অনুভব করতে গেলে আমাদের অটুট বিশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে হয়। এই বিশ্বাসের সোপান থেকে রবীন্দ্রনাথ তার আত্মপরিচয় লিখেছিলেন। তার কাব্যতত্ত্ব অক্ষরের প্রনিধান ছাড়া হয় না।

আরও আশ্চর্য লাগে যখন দেখি যে কবি এই অক্ষরের ব্যাপ্তিকে কতভাবে চিহ্নিত করেছেন, যেমন এক দীর্ঘ উপমায় তিনি অক্ষরের সৃষ্টিকে বাঁশির সুরের সঙ্গে তুলনা করলেন। যেন ধরিত্রীর রঙ্গমঞ্চে এক কন্‌সার্ট আয়োজিত হয়েছে আর কবি সেখানে সুরের আনন্দ অনুভব করছেন। **'ফুৎকার বাঁশির এক একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়া এক একটা সুর জাগাইয়া দিয়া এক একটা সুর বাজাইয়া তুলিতেছে এবং নিজের কর্তৃত্ব উচ্চস্বরে প্রচার করিতেছে, কিন্তু কে সেই বিচ্ছিন্ন সুরগুলিকে রাগিনীতে বাঁধিয়া তুলিতেছে? ফুঁ ......সুর জাগাইতেছে বটে, কিন্তু ফুঁ তো বাঁশি বাজাইতেছে না, সেই বাঁশি যে বাজাইতেছে**

তাহার কাছে সমস্ত রাগরাগিনী বর্তমান আছে, তাহার অগোচরে কিছুই নাই'। আবার 'সেই যে সুরটা সেটা আমার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না। আমার পটে একটা ছবি দাগিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে যে একটা রঙ ফলিয়া উঠিল, সেই রঙ ও সে রঙের তুলি তো আমার হাতে ছিল না'।

রবীন্দ্রনাথ যিনি ছেলেবেলা থেকে উপনিষদের মন্ত্রপাঠকরেছেন আর ব্রাহ্ম সমাজের উদাত্ত উপাসনা করতে শিখেছেন তিনি নিরাকারবাদী চিন্তা করবেন—এটা সমীচীন ছিল। তিনি বিধাতার লীলাকে দেখেছিলেন পরোক্ষে, মানসের উপমায়। তার তত্ত্ব রচনায় আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথ কেমন করে অপৌত্তলিক নিরাকার সূত্র অনুসরণ করেছেন। এটা নিশ্চয়ই আলাদা করে বলতে লাগে না যে একমাত্র দক্ষ দার্শনিকের পক্ষে এমন বিমূর্ত সূত্রের দ্বারা চিন্তা ব্যক্ত করা সম্ভব।

ব্রাহ্মসমাজের প্রবক্তারা প্রত্যেকেই পৌত্তলিকতার কালচার অস্বীকার করেছিলেন। তার জায়গায় তাঁরা নিরাকার ঈশ্বরকে স্থান দিয়েছিলেন। যে বিমূর্ত চিন্তা তাঁরা প্রচলন করেছিলেন তাতে কবিতার ক্ষেত্রে একটা নতুন চেতনার অবতারনা করা হোল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ আছে। আমি যখন আরো অল্প বয়সে একটি জার্নালে রবীন্দ্রনাথের বিমূর্ত অথচ প্রাকৃতিক চিত্রকল্পের উপরে রচনা লিখেছিলাম তখন এই ভাবনাটা আমার মনের একটা বড় অংশ অধিকার করে ছিল। যৌবনে আমি রৈবিক কাব্যে কেবলমাত্র ছন্দের অবিচল নৃত্য দেখেছিলাম, স্নিগ্ধ, শান্ত, চঞ্চল নটরাজের নৃত্যের মত, কবিগুরুর কবিতায় আমি চপল ছান্দসিকের কারিগরি দেখেছি কিন্তু কম ক্ষেত্রেই চিত্রকাব্যের দৃষ্টান্ত খুঁজে পেয়েছি। যেমন গীতাঞ্জলির কবিতায় এই বিমূর্ত ঈশ্বরপুরুষ কখনও রাজা, কখনও স্বামী, প্রভু, কখনও নিতান্ত তুমি, তবুও কল্পনার চোখে তার অঙ্কের স্পষ্ট প্রকাশ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ যে চিত্রময়তা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেননি তার অনেক কারণ থাকতে পারে কিন্তু এটা বেশ সম্ভব যে উপনিষদ তাকে বিমূর্ত কাব্যের ধারণা দিয়েছিল। ধরা যাক, রক্তকরবী'র রাজা চরিত্রের কথা যার চেহারা রবীন্দ্রনাথ লোকচক্ষুর আড়ালে রইল। যখন নন্দিনীর চিত্তহারা নাচ রাজাকে চঞ্চল করে তুলল তখন একটা নতুন প্রাণশক্তি উৎপন্ন হওয়ার আভাস পাওয়া গেল আর তার ফলে একটা অপ্রকাশিত ভাবকে, যা রাজার চরিত্রে আবদ্ধ ছিল, তার কবি মুক্তি দিলেন যাতে শুচিতা নন্দিনীর হাত ধরে সে আলোর পথে যাত্রা করার একটা অবকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে, বিশেষ করে আত্মপ্রতিকৃতীতে কেবলমাত্র সরল রেখার খেলা। এমন নয় যে সে ছবিতে কোনো জটিল মানসিকতা নেই। বরং তার জায়গায় কতকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথ কেমন করে মনের ভিতরকার অযাচিত তথ্য বা গুপ্ত, পলাতক, ধূসর রঙ সঞ্চারিত করে তার চিত্রপটের বৈশিষ্ট্য নির্মাণ করছেন। রেখার চক্রাবর্তে একটা ছবিতে তিনি এক উদ্‌ভ্রান্তা নারীর মূর্তি এঁকেছেন। এই অতিসরলতা রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রতিকৃতীতে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই উপস্থাপিত হয়েছে বলে বোধ হয়।

যাকে কবি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়েছিলেন তার কোন কায়া নেই। সেই দেবতার রূপ সৌষ্ঠব ফুটতে দেখা যায় না। খালি একটা 'ভাব' প্রকাশিত হয়। একটা প্রকাশ সঞ্চারিত

হয়। কবির অন্তরে যে কবি অধিষ্ঠিত আছেন, যিনি বিরাট কবি, তিনি সমস্ত ভালোমন্দ, যিনি "সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি"। জীবনদেবতার যে দৈবিকতা প্রকাশিত হওয়ার কথা উল্লেখ করছি তাতে এই প্রকাশিত হওয়ার রহস্যটা কম কথা নয়। আমি লক্ষ্য করেছি যে, এই প্রকাশের তত্ত্ব কবির রচনার সর্বত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিস্তৃত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বা বিবরণ এখানে দেওয়া হোল না কিন্তু এটুকু বলা প্রয়োজন যে প্রকাশের তত্ত্বটাকে কবি জীবনদেবতার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। সেখানেই তার উৎস। বিধাতা তার সৃষ্টিতে, বৈচিত্র্যে, নিজেকে প্রকাশ করেছেন। কবির অহমিকা এতে ক্ষয় হয়েছে। তার নিজের কাছে নিজের যে পরিচয় তাকে প্রায় নিষ্প্রয়োজন বলে বোধ হয়। সেখানে যেটা প্রাধান্য পায় তা হোল বিরাট ধরিত্রীর বিধাতা, জীবনের শাশ্বত দেবতা, যেন প্রস্তরের বাঁধ ভেঙে নির্ঝরের মত উৎসারিত ও প্রকাশিত হয়েছেন। এই জীবনদেবতাকেই কবি তাঁর আত্মপরিচয়তে অর্চনা করেছেন।

কবির ভিতরের এই কবি রবীন্দ্রনাথের উপাস্য। ব্যুৎপত্তির অর্থটুকু দেখলে তিনিই কবি যার স্তব করা হয়। এই বিধাতা কবির সাথে মানুষের অস্তিত্বের এক সম্পর্ক রয়েছে আর সেই সম্পর্কটুকুর উন্মোচনেই প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র রচিত হয়েছিল। মানুষ ও বিধাতা যে সম্পর্কের টানে একে অপরের অনুরক্ত হয়ে আছে, যাকে রবীন্দ্রনাথ 'আমি আর তুমি' নামে পরিচিত করিয়েছেন সেটা ট্র্যাডিশনের সরল নিয়ম মেনেই রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে স্থান পেয়েছে। কবি এই দ্বৈততা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি শাস্ত্র রচয়িতার উপকরণ কেবল অনুকরণ করেননি। তিনি কেবল সে বাণীর মর্মটুকু নিজস্ব স্টাইলে ব্যাখ্যা করেছেন। শাস্ত্রের অভিধা সে লেখায় স্থান পায় না কিন্তু তার মর্মবাণী অক্লেশে প্রচারিত হয়। সর্বত্র রবীন্দ্রনাথ তার শাস্ত্রকে অন্তরালে রেখে তার কবিতা লেখার ইতিবৃত্ত আলোচনা করলেন। সেই কারণেই তিনি বললেন, 'তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোন অধিকার নেই। দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের কোন তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর হইয়া থাকিব। আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধিমন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে'।

তার গোটা সাহিত্যতত্ত্বের পরিসরে রবীন্দ্রনাথ একটা কথা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন তাঁর সৃষ্টির সবটাই অনুভূতির দিক থেকে দেখা। অথবা 'অনুভব'। এই দুটো কথাই তিনি অর্থের প্রতি অনুগত চোখ না রেখে প্রয়োগ করেছেন। এ তত্ত্বের মূলে ছিল এমন প্রক্রিয়া যাকেকতকটা উপমা বর্ণনায় বলা চলে অন্তরের পানে চাওয়া। মানসচক্ষু দিয়ে চেয়ে দেখা যাতে এই এক অনির্বচনীয় সত্যির উন্মেষ বা প্রকাশ ঘটে ভাষার পটে। অনুভূতিকে কেন্দ্র করে যে প্রতিমার কাঠামো বাঁধা হয় তার মধ্যে অবহেলায়, আনন্দে গড়ে ওঠার উপাদান থাকে। কখনই মনে হয় না যে খুব সচেতন হয়ে কবি তার্কিকের চারিত্র পরিগ্রহ করেছেন। আত্মপরিচয়ের যে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ তার

অনুভূতিশীল তত্ত্বের ব্যাখ্যায় কবিতার আনন্দস্বাদের কথাই সবচেয়ে বেশী করে প্রকাশ পায়। এই আনন্দ অনাবিল, ইহলোকের অচলা রূপ এই অসীম আনন্দের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। আনন্দের খেলা অশ্রান্ত ইচ্ছের মহিমায় কি করে নিজেকে নতুন করে নির্মিত করে সে কথা বোঝা যায়, 'নবশিশুর মত একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলেম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকরগুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলেম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত ও নবপল্লব উদ্‌গত হত'।

যে সৃষ্টির সৃজ্যমানতায় এই জগৎ অস্তিত্বশীল সেই সৃষ্টির অনাদি ছন্দের আভাস মানুষের আত্মায় নিশ্চয়ই নিহিত রয়েছে। এটাই তো স্বাভাবিক কারণ মানুষ আদতেই সৃষ্টির বাইরেকার কোন দ্রব্য বা সামগ্রী নয় বরং সে এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার এক অন্তিম মুহূর্ত। অন্তরের মধ্যে এই সৃষ্টির মহিমা উপলব্ধি করাটাকেই সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ 'অনুভব' বলছেন। কারণ আমাদের অন্তরে যেটা শাশ্বত, যেটা চিরকালের, এবং আমাদের সমগ্র ভবিষ্যতের ভবিতব্য বটে, সেই আত্মিক উপকরণের অনুভূতিই 'অনুভূতি' বা 'অনুভবের' শেষ কথা। বাইরের সংসারের দিকে তাকালেই সেই অনুভব গড়ে ওঠে। তাতে কোন অসামঞ্জস্য প্রকট হয় না। বরং অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের রচনায় একটা সর্বেশ্বরবাদের দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। তৃণের কাঁচা সবুজ পাতা, শাখা প্রশাখার আরোহ থেকে বনানীর নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে, সদর স্ট্রীটের বাড়িতে শাখাপ্রশাখাপল্লবিত গাছের ফাঁকে যে জ্যোতির ঝলকে কবির মন আচ্ছন্ন হয়েছিল, সে জ্যোতি বিশ্বমঞ্চের প্রত্যেকটি অঙ্কে অনুরণিত হয়। 'আত্মপরিচয়'তে যে কথা বলতে কবি কুণ্ঠা বোধ করেননি তাতে এই সর্বব্যাপ্ত জ্যোতি, আর তার আনন্দের আবহ দেখা গেল। যে গভীর অকর্ণশ্রুত শব্দের স্তুতি করে আমাদের রচনা আরম্ভ করা হয়েছিল সেই বিশ্বব্যাপী শক্তির অনুধাবন করে কবি নিরুক্ত বিরাটের বিবর্তন প্রকাশ করেছেন—

তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি . . .

(আত্মপরিচয়)

নিজের ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে কবি বিশালতার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন। আর এই পাওয়ার মধ্যে বিরাটের আগমন। ক্ষুদ্রত্ব যখন বিরাটের আগমনে লোপ পায় তখন কবি সে বিরাটের ভয়াবহতা অনুভব করতে পারেন। বিধাতার বিপরীত আধার। পরিব্রাজক যখন প্রকৃতির মহালয়ের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন বজ্রের কর্কশ শব্দে, মেঘের মন্দ্র চলনে কিংবা ঘন বর্ষণে, সে অনুভব করে উড্ডীন এক আদিম শক্তির টান। এই ভয়াবহতা আর আনন্দবহতা একই সাথে কবির চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এই বিশালতার অনুভবে কবি যে আত্মপরিচয় লিখেছিলেন তা অতএব তার অনাত্মপরিচয়।

কেবল এই অনুভূতিটা অবশিষ্ট থাকে বা প্রধান হয়ে থাকে যে বিধাতা তাকে আপ্লুত করে রেখেছে। 'এতস্মিন্নু খলু অক্ষরে আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ—এই অক্ষরপুরুষে আকাশ ওতপ্রোত— ...... সেই একেকে জানো, সর্বব্যাপী আত্মাকে জানো, আত্মন্যেব, আপন আত্মাতেই, প্রথাগত আচার অনুষ্ঠানে নয়.......আত্মার প্রেরণায়'। অবশ্য-বিষয়ের তাৎপর্য বুঝেও শেষ কথা বলার এখানে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি উপকূলের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকে। তিনি তার ব্রাহ্মত্বের প্রচারক নন কিন্তু ব্রাহ্মচিন্তার নিরাকারমন্ত্র তার রচনাকে এমন করে চালিত করে যে 'আচার-অনুষ্ঠানের' আড়ম্বর তার কাছে বিধাতার উপাসনার জন্যে নিষ্প্রয়োজন মনে হয়।

এ প্রসঙ্গে একটা মন্তব্য করেছিলেন রবীন্দ্র অনুরাগী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। এমন এক মন্তব্য কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে অনেকটা প্রসারিত হয়েছে। অন্ততঃ সর্বতোভাবে, সকলের গোচরে, যে সে কথা বহুলালোচিত করা হয়েছে এমন বলতে পারি না কিন্তু মন্তব্যটির তাৎপর্য পরিলক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কীর্তি সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'তাঁর কৃতিত্ব ঐকান্তিক আত্মোপলব্ধি, বস্তুতঃ অবগতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পথপ্রদর্শক শুদ্ধ নন, তিনি রামমোহন প্রমুখ আবিষ্কারকদের অনুগামী' ('রবীন্দ্র প্রতিভার উপক্রমণিকা') এই আত্মপোলব্ধি উপকরণরহিত নয়। বরঞ্চ তার একটা বৈশিষ্ট্য আছে যার যদিও বিশদ ব্যাখ্যা সুধীন্দ্রনাথ করেননি। প্রায় আলটপ্‌কা কথায় রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা বিশেষ দিকে, অবশ্য যা বাদ রাখলে রবীন্দ্র প্রতিভার বিশ্লেষণ রচনা অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য, তার দিকে আলোকপাত করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথকে 'প্রাচ্য তত্ত্ববিদ্যার প্রচারক ভাবাও অসঙ্গত'। আবার 'রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ পরিচয় না জানলে, আধুনিকেরা নিজেদেরও চিনতে পারবেন না'। এই রবীন্দ্র প্রাচীনতা থেকে বর্তমানকালের কবিতার ইতিহাস শুরু করা যায় কিনা তার সার্বিক মীমাংসা করা এখানেই সম্ভব নয় কারণ আধুনিকতার, কেবল রবীন্দ্রনাথ নয়, রামমোহন নয়, অন্ততঃপক্ষে ইংরেজী কাব্যের দেনা আছে। আমার মতে সুধীন্দ্রনাথ যে ধারায় কবিতা লেখা মনস্থ করেন, তা তাঁর রাবীন্দ্রিক চিন্তার ব্যতিরেকেও অন্ততঃ পাশ্চাত্য নিহিলিষ্টিক ভাবনার পার্শ্বফসল বলে মনে হয়েছে। জীবনানন্দ যে কবিতা লিখেছেন তাতে পাশ্চাত্য দর্শনের অনুভব জেগে ওঠে বইকি। গত পঞ্চাশ বছরের যে আধুনিক কবিতা তা কি ফিরিঙ্গিদের মানবতাবাদী চিন্তা বর্জন করতে পেরেছে। নাকি একপেশে বা বিদেশীর ছিন্নপত্র জেনেও ইংরেজ কবির চিন্তাবিটপী নির্মূল করতে পেরেছে। সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ পরিচয় না জানলে, আধুনিকেরা নিজেদেরও চিনতে পারবেন না', এ কথাটা আংশিক ইতিহাস। কথার বাকি অংশটুকু আমাদের ইংরেজের মেহগনী বুকশেল্ফ-এ নিয়ে যায়। এই শেষের অংশের বিচার এখন করা চলে না। তা বুঝতে অন্যত্র প্রয়াস করা চলে। কেবল এটুকু বলা চলে যে মধুসূদন বা বঙ্কিম যে ইংরেজী সাহিত্যের স্টাইল প্রবর্তন করেছিলেন তা নানা প্রকরণ ধার করতে করতে বাঙলা কবিতার ইতিহাস সমৃদ্ধ করেছে। আধুনিকেরা তাদের নিজেদের চিনতে পারবে তখনই যখন তারা কালচারের বিচিত্র স্রোতে প্রতীচীর জটিল বনবৃক্ষের ধূসর ছায়ামূর্তি নিরীক্ষণ করতে সক্ষম হবেন। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আধুনিকতার সরল নির্যাস। যেন এক প্রত্নতাত্ত্বিক তার হৃদয়ের

তন্ত্রীতে কোথাও এক প্রাচীন শোনিতের স্বাদ পেয়েছেন, আর বিপন্নতা, ভয়, বিধ্বংস অবক্ষয় অনুভব করেছেন।

'...আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে
আমাদের ক্লান্ত-ক্লান্ত-করে'

অথবা হালে, যখন মানস রায়চৌধুরীর কবিতা পাঠ করেছি তখন তাকে এক নিরন্ধ্র অন্ধকার বিশ্বের উপাসনা করতে দেখেছি। সেখানে অক্ষর প্রক্ষেপের মাঝে একটা মানসিক জটিলতা কাজ করে, অথচ মানসের কড়চাতে শব্দের ক্লাসিকাল প্রয়োগ, টান টান, ঋজু, মননচর্চিত। সেখানেও কবি কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

তোমার গভীর স্বর শুনব বলে আছি প্রতীক্ষায়
সৌরলোক নিভিয়েছে তার তীব্র আলো,
আকাশে এখন নীল অবারিত অন্ধকার, নির্জন ধারালো
কোথাও তরঙ্গ নেই—

আধুনিক কবিতা যেখানে এই পাশ্চাত্যের ও পাশ্চাত্য চিন্তার শৃঙ্খল ছেড়ে দিয়েছে সেখানে ও তাৎপর্য হারিয়েছে।

সুধীন দত্তের মন্তব্য আমাদের আধুনিক কবিতার সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে কিছুটা বিতর্কে অবতীর্ণ করেছে। এই যে য়ুরোপীয় মননে ভাবিত হওয়ার কথা বলেছি এ নিয়ে আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রেখে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি তত্ত্বে ফিরে যাই। এতক্ষণ আত্মপরিচয়তে লেখা তত্ত্বগুলো বিশ্লেষণ করাতে আমাদের বেশ সুবিধে হয়েছে কারণ আত্মপরিচয় থেকে কয়েকটা মৌলিক ভাবনা কৈবল্য লাভ করেছে। এই মৌলিকতায় একালের কবি বা লেখক প্রেরণা পেয়েছেন। যখন কবিগুরুকে সাহিত্য তত্ত্বের উপরে শেষবারের মত কলম ধরতে হয়েছিল তখন অনেকক্ষেত্রেই অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু কবির পাশে ছিলেন। কবি লিখেছিলেন 'সাহিত্যের পথে' কিংবা 'সাহিত্যের স্বরূপ'। 'সাহিত্যতত্ত্ব' নামে যে রচনাটি কবি লিখেছিলেন তাতে আমরা সেই পুরাতন আত্মপরিচয়ের সূত্রগুলো আবার লিখিত হতে দেখি, 'সাহিত্যতত্ত্বই' বোধহয় কবির একমাত্র 'তত্ত্ব' নামাঙ্কিত রচনা। এতে তত্ত্ব প্রধান। তত্ত্ব যখন রচনার উপকরণ তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাতে [illegible] কম, তার্কিক রবীন্দ্রনাথকে এখানে যৌক্তিক আলোচকের কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখা হয়। তবে 'সাহিত্যতত্ত্বে' যে ভাবনা রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত করেছেন তার প্রায় পুরোটাই অন্যত্র দেখা যায় একই কথায় ব্যাখ্যাত। আদ্যোপান্ত কবির তত্ত্বে এক সাযুজ্য রয়েছে।

প্রথমতঃ বুৎপত্তির বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা অনুসরণ করলে আমরা তার সাহিত্যতত্ত্বের গরিমা কিছুটা বুঝতে পারি। কিন্তু যেখানে তিনি সৃষ্টির মূলে তার পাঠককে নিয়ে যেতে চেয়েছেন সেখানে তিনি কোন আশ্চর্য করতে পারার মত কথা বলেননি বরং তার জায়গায় একটা সরল ব্যুৎপত্তিগত আলোচনা করছেন। হেলায় যেন দেখেছেন এমনভাবে তিনি পাঠকের মনকে ছুঁতে চেয়েছেন। তত্ত্বের বাহুল্য তার লেখায় কোথাও নেই। তাই সাহিত্যতত্ত্বের প্রারম্ভেই বলা হয়েছে। 'শাস্ত্রে আছে, এক বললেন বহু হব।

নানার মধ্যে এক আপন ঐক্য উপলব্ধি করতে চাইলেন। একেই বলে সৃষ্টি'। তবে এ তো সৃষ্টির বৈচিত্র্যের কথা। বহুত্বের অন্তরে যে ঐক্যের একটা গতি রয়েছে সেটা রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন। বহুত্ব ও ঐক্যের সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক জায়গাতে লিখেছেন। বিশেষ করে, আবার, বিধাতার একাত্মভাব থেকে যে বৈচিত্র্য কল্পনা শুরু হয় তাকে কবি নানা স্থানে ব্যাখ্যা করেছেন—আমরা যাকে বলি অরগ্যানিক, যা আসলে একটা গ্রীক শব্দ, যেটিকে আঠারো শতকের ইংরেজ পণ্ডিতেরা তার স্থূল ব্যবহারযোগ্যতা থেকে পৃথক করে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থপ্রদান করেছিলেন, বলেছিলেন যে 'অরগ্যানন্' সেই অখণ্ড জগৎকল্পদ্রুম—কবি সেই এক অক্ষয় বটের রূপকল্প বর্ণনা করেছেন। সৃষ্টির ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথ বীজের সঙ্গে তুলনা করেন, যেন তা পল্লবিত হবে প্রকৃতির অবিশ্রান্ত স্রোতস্বিনীর ধারে। রবীন্দ্রনাথ তার লেখায় যখন রূপক চয়ন করেছিলেন তখন কখনো তিনি ইতিহাসের অপেক্ষা রাখেননি। তার সৃষ্টিচিন্তাকে সৃষ্টির আবহমানতার মত পরাঐতিহাসিক মনে হয়। সেখানে কোনো ঘটনার রেফারেন্স নেই। 'তথ্যের সংকীর্ণতার থেকে মানুষ যেমনি সত্যের অসীমতায় প্রবেশ করে তার মুল্যের কত পরিবর্তন হয় সে কি আমরা দেখি নে। .....আমি কি বোঝাব তোমাদের কাকে বলে সাহিত্য, কাকে বলে চিত্রকলা, ...কোন্ আদি উৎস থেকে এর স্রোতের ধারা বাহির হয়েছে এক মুহূর্তে তা বোঝা যায় যখন সেই স্রোতে মন আপনার গা ভাসিয়ে দেয়। আজ সেই বাঁশির সুরে যখন মন ভেসেছিল তখন বুঝেছিলেম বুঝিয়ে দেবার কথা এর মধ্যে কিছু নেই। এর মধ্যে ডুব দিলেই সব সহজ হয়ে আসে'।

'সাহিত্যতত্ত্ব' নামের যে রচনা কবি লিখেছিলেন ১৩৪০ সনের ভাদ্র মাসে সে লেখাটুকুর মধ্যে আমরা সাহিত্য নিয়ে কবির সব ভাবনা একত্রিত করে পাই। কবি সুধীন দত্ত যে অনুভূতির বা আত্মোপলব্ধির ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার বিকাশ হওয়ার কথা বলেছিলেন সে কথা এ রচনাতেও পুনরুল্লিখিত হয়েছে। এখানেও সাহিত্যতত্ত্বের গোড়ার কথা। 'সাহিত্যতত্ত্বে'র প্রথম বাক্যেই কবি জগতের ব্যাপারে যেটা বলেছেন তেমনটা খুব কমসংখ্যক তাত্ত্বিক প্রত্যক্ষ করেছেন। এক্ষেত্রে আমার পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কথা মনে পড়ে কারণ তাদের ভাবনার সঙ্গে তার কিছুটা সাদৃশ্য আছে। এমন নয় যে রবীন্দ্রনাথ এদের তত্ত্ব অনুসরণ করেই যুক্তি দিয়েছিলেন কারণ প্রাথমিক ভাবে সর্বত্রই তিনি তার তত্ত্বকে উপনিষদের আলোতে ব্যাখ্যা করেছেন। তাতে করে সে তত্ত্বের একটা সনাতন বা প্রাচ্য ভিত্তি কাজে লাগিয়েছেন। আসলে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার নৈপুণ্য এমন যে তাকে বিশেষ কোনো শাস্ত্র অবলম্বন করতে হয়নি। তিনি এমনিতেই বিশ্বজনীন ছিলেন।

তবু, শাস্ত্রের যেটা আদি প্রশ্ন সেটা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যতত্ত্বের জিজ্ঞাসা শুরু করেছিলেন। 'আমি আছি এবং আর সমস্ত আছে, আমার অস্তিত্বের মধ্যে যুগমিলন....আমি আছি এবং না-আমি আছে, এই দুই নিরন্তর ধারা আমার মধ্যে ক্রমাগতই একীভূত হয়ে আমাকে সৃষ্টি করে চলেছে। অন্তর বাহিরের এই সম্মিলনের বাধায় আমার আপন সৃষ্টিকে কৃশ বা বিকৃত করে দিলে নিরানন্দ ঘটায়'। রবীন্দ্রনাথের 'আমি' আর 'না আমির' উল্লেখ

আমাকে স্বভাবতঃই জার্মান দার্শনিকদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের কবির শৈলী ছিল জলধারার মতন, অবিচল চেষ্টায় তিনি নির্ঝরের উচ্ছ্বাসকে নিজের শান্ত চিত্তের মধ্যে মিলিয়ে নিতে পারতেন। যারা কবির 'পথের সঞ্চয়' পড়েছেন তারা এই 'সঞ্চয়' শব্দের অর্থ যেভাবে আমি ব্যবহার করছি সেভাবে গ্রহণ করতে পারবেন। সঞ্চয় ব্যাপারটা কোন বাস্তব সামগ্রীর সঞ্চয় নয় কারণ কবি দ্রব্যের ভিড় করে তোলেননি। তার সঞ্চয় নিতান্ত আত্মিক বা যাকে বলা যায় উপলব্ধির অথবা সুধীন দত্ত যে প্রক্রিয়াকে আত্মোপলব্ধি বলে চিহ্নিত করেছেন সেরকম। এই সঞ্চয় কেবল পাওয়ার জিনিস নয়। এ সঞ্চয় অভিব্যক্তির। যে সঞ্চয় কবিকে তার ব্যক্তিত্বের পুরোটা প্রকাশ করতে ভিতর থেকে অনুপ্রেরণা দেয় এ সে সঞ্চয়। একটা জার্মান শব্দ এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে পড়ছে। আইনফ্লুস্ বলতে জার্মান পণ্ডিতেরা বুঝতেন আমাদের ভাষায় যাকে বলি প্রভাব। যেন একটা মনের ভিতরকার ব্যাপার যেখানে আমরা অপরের কাছে কোন ধারণা পেয়ে নিজের করে নিয়েছি। এই প্রভাবান্বিত হওয়াকে ইংরেজীতে 'ইনফ্লুয়েন্স' বলে। রবীন্দ্রনাথ এই মনের ভিতরের বলয়ে যেভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন সেটাই তার সঞ্চয়। এই সঞ্চয়ের একটা ইতিহাস আছে। রবীন্দ্রনাথ তার য়ুরোপ ভ্রমনের সময় অনেকের সঙ্গে অক্লেশে বন্ধুত্ব করেছিলেন। যেমন স্টপফোর্ড ব্রুকের কথা ধরা যেতে পারে। কবি তার সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক ধর্ম ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তৃপ্তি পেয়েছেন। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের একটা দিক উন্মোচন করা হয়। যেন শিশুর ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি অপরের ভাবনাকে জানতে চেয়েছেন। যদিও তার নিজের চিন্তায় কোথাও ঘাটতি ছিল না। তিনি জানতেন, আনন্দবর্ধন যেমন বলেছিলেন, যে তার প্রতিভার ক্ষণিকের দ্যুতিতে তিনি সকল তত্ত্বের সারবত্তা আত্মস্থ করতে পারেন। তবুও তিনি চঞ্চল হয়েছেন, বিদেশীর রসিক সভায় আসন পেতেছেন। কবির নিজের কথার উদ্ধৃতি দিলে এটা আরও স্পষ্ট হয় 'স্টপফোর্ড ব্রুক বললেন, তিনিও জন্মাতরে বিশ্বাসটাকে সংগত মনে করেন। তাঁহার বিশ্বাস, নানা জন্মের মধ্য দিয়া যখন আমরা একটা জীবনচক্র সমাপ্ত করিব, তখন আমাদের পূর্বজন্মের স্মৃতি সম্পূর্ণ হইয়া জাগ্রত হইবে। এ কথাটা আমার মনে লাগিল। আমার মনে হইল, একটা কবিতা পড়া যখন আমরা শেষ করিয়া ফেলি তখনই তাহার সমস্তর ভাবটা, পরস্পর গ্রোথিত হইয়া আমার মনে উদিত হয়'।

ব্রুকের জন্মান্তরবাদ, গ্রীক মনীষী প্লেটোর তত্ত্বের পুনর্ব্যাখ্যা হতে পারে। ব্রুকের খ্রীষ্টীয় ভাবনার উল্লেখ বর্তমান ছাত্র সমাজ অন্যত্র পাঠ করে থাকবেন। রোমান্টিক কবিদের উপরে তার সহৃদয় সমালোচনার কথা আমরা জানি আর সেক্ষেত্রে আশ্চর্য হব না যদি এমনটা প্রমাণ করা হয় যে কবিতা নিয়েও কবির ব্রুকের সঙ্গে কথোপকথন হয়েছিল। উপরের উদ্ধৃতিটায় কবি একটা তত্ত্বের নির্যাস নিয়েছেন মাত্র। তার কল্পনাকে খাটিয়ে তিনি নিজের মত করে সমস্ততা বা পূর্ণতার একটা ধারণা গড়ছেন। কাব্য যে পূর্ণতার অঙ্গ এখানে এমন কথা কবি বলছেন তবে ব্রুকের প্রসঙ্গে এ তত্ত্ব উঠবার ফলে আমরা যেন সহজভাবেই রোমান্টিকতার পথে চলেছি বলে মনে করি। কোলরিজ্ তার সারা জীবনের প্রয়াসে এই পূর্ণতাকে অনুসরণ করেছেন। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রকৃতির পটে এই পূর্ণতা উপলব্ধি

করেছেন, তার কাব্যেও সেই পূর্ণতা। এই ব্যাপক অর্থে, কবি পথেপ্রান্তে তার ভাবনার খোরাকি সঞ্চয় করেছিলেন। আজকে যেমন বিলেতের মনীষী অধ্যাপক ক্যাসিরার-এর লেখায় 'জু ইনডিভিদয়্যাল উণ্ড্ কোস্‌মোস্' গ্রন্থে ভাবনার এই ইতিবৃত্তের কথা পড়ি তখন আমাদের খেয়াল হয় যে, যে পথে ক্যাসিরার আমাদের প্রতীচীর বিশ্বের উন্মোচন করেন তেমন করে রবীন্দ্রনাথ মানুষের সকল দর্শনকে একাগ্র করেছেন, তার নিভৃত উপলব্ধি থেকে এই পূর্ণতাকে কবি একটা বিরাট মর্যাদা দান করছেন। কবির দর্শনের ভিতে পাশ্চাত্যের সামগ্রী মিশেছিল। 'সাহিত্যতত্ত্ব' নামের সেই দরকারি লেখাটায় যখন কবি তাঁর তত্ত্বচারিতা শুরু করছেন তখন এই সঞ্চিত ধনের পসরা উদ্ভাসিত হয় বইকি। 'আমি'র থাকা আর আমার বাইরের একটা প্রপ্রঞ্চ থাকা, এর সম্মিলনে কবিতার জন্মলাভ হয়। 'পথের সঞ্চয়'তে এই পাশ্চাত্য তত্ত্বের মর্মগ্রহণ তিনি করেছিলেন। তার স্বচ্ছ উল্লেখ আছে। 'বিশ্বের সঙ্গে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ সংঘাতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্য সংগীত বাজিয়া উঠিয়াছিল। কবি যেখানে প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে কাব্য লেখেন সেখানে তাঁহার লেখা গাছের ফুলফলের মতো আপনি সম্পূর্ণ হইয়া বিকাশ পায়'।

কবির রচনাযাত্রায় একটাই তর্ক সারাক্ষণ প্রতিভাত আর বিরুদ্ধাচরণ ছাড়াও, যা খুবই কিঞ্চিৎ ঘটে থাকে, শুধু 'সাহিত্যতত্ত্ব' একটা ভাল উদাহরণের কাজে লাগে কারণ, পূর্বে যে বলেছি, এখানে কবি তাঁর তত্ত্বের ভিত গড়েছেন মাটি থেকে। 'আমি' আর 'আমি'-র যখন সংঘাত ঘটে তখন গোটা অস্তিত্বের প্রশ্নে একটা আন্দোলন হবে এটা স্বাভাবিক। না আমিকে কবির কিন্তু সজীব বোধ হয়। যেমন করে করণিক তার ফাইলের চাপে বিশ্বের থেকে বন্ধুত্ব পেতে বঞ্চিত হন তেমন করে নয় বরং খ্যাপার মত, স্বভাবত অকর্মণ্য যখন বাজার-হাটে বা পথের ধারে অপ্রয়োজনীয় জিনিসেও একটা বেঁচে থাকার কৌতুক অনুভব করে তেমন করে বাইরের, এই 'না-আমি'-কে দেখার মধ্যে একটা নতুন ভাবনা কাজ করে। যখন কবি বাতায়নিক জীবনযাপন করেন তখন অঙ্গনের অশ্বত্থ গাছে তিনি নিজের প্রাণের প্রতিবিম্ব লক্ষ করতে পারেন। এই একাত্ম হওয়াটা সবার ভাগ্যে জোটে না কিন্তু কবির জোটে বইকি। কারণ কবিকে স্বয়ং বিধাতা কবি এভাবে দেখতে দিয়েছেন। বিরাট কবি নিজেকে মেলে ধরেছেন। কারো অনুমতি ছাড়াই ক্ষুদ্র কবি, মানুষের দৃষ্টিহীনতার অংশীদার হলেও, এমন একটা আশীর্বাদ পেয়েছেন। রোমান্টিকদের চিন্তায় এই একাত্ম হওয়ার তত্ত্বটা একটা বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে। বিষয়টা এমন নয় যে দু'কথায় শেষ করা যাবে।

এখন কবি বলেছেন যে না—আমি তার আমিত্বের সাথে একীভূত হয়ে চলেছে। আমার মনে পড়ে জার্মান আইডিয়ালিজমের একটা আকর গ্রন্থে এই কথা কতটা গুরুত্ব পেয়েছে। ফ্রেড্‌রিখ শেলিং-কে এ দেশের পন্ডিতেরা তেমন চেনেন না। এমনকি যে সময় রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপে ভ্রমণ করেছিলেন তখনও শেলিং উল্কার মতন তার দীপ্যমান আসন থেকে খসে পড়ে বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু তার চিন্তার বীজ সর্বত্র, ইংরেজ রোমান্টিকদের ভিতরে উপ্ত হয়েছিল। এই চিন্তাধারাটাই তখন প্রবল এবং বর্তমানের বাক্‌দর্শন তখনও আইডিয়ালিস্ট বা রোমান্টিকতার জোয়ারকে প্রতিহত করার শক্তি অর্জন

করতে পারেনি। শেলিং তার এক রচনায় এই 'আমি' আর 'না-আমির' সংমিশ্রণকে আর্টের মূলসূত্র বলে ব্যাখ্যা করেন। মানুষ যখন রোজনামচা করে তখন তার এটুকু ভাবার ফুরসত হয় না যে তার বাইরে একটা জগৎ রয়েছে। সে নিজেকে সংসারের থেকে অসম্পৃক্ত করতে পারে না। সে একটা সরল জীবনযাপনের কথা জানে যেখানে তার দরকারের বাহুল্যে সে নিজেকে কখনো পৃথক বলে ভাবতে শেখে না। তার হাতে সে সময় নেই। বেঁচে থাকার একটা মাশুল দিতে হয়। এই যে বাইরেকার পৃথিবীটার সঙ্গে নির্দ্বিধায় মিশে থাকা এটা মানুষের একরকম নীচতা। এতে সে বাস্তবটাকে মেনে নিয়েছে। তার কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। কিন্তু মানুষ হয়ত প্রশ্ন করতে পারে কি এমন রহস্য আছে যার সমাধান করলে তার নিজেকে চেনা হবে বা তার সংসারের সাথে একাত্ম হওয়ার সূত্রটা সঠিক করে জানা হবে। শেলিং বলেছিলেন যে ঠিক এখানেই মানুষ দর্শনবেত্তা হয় যখন সে এই প্রথম প্রশ্নটা করে উঠতে পারে—আমি কে আর তাছাড়া আমার বাইরে যে জগৎটা প্রত্যক্ষ করছি তাই বা কি। এ প্রশ্ন উত্থাপন করা মাত্রই আমরা আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রাপ্ত হওয়ার পথে প্রথম পদক্ষেপ ফেলেছি। কিন্তু শেলিং আরও ভাজিয়েছিলেন যে এ তর্কের মীমাংসা তখনই হতে পারে যখন আমরা বুঝি যে বিধাতা তার বিরাট আমিকে প্রকৃতিপটে, গোটা না-আমির মত করে জানা ধরিত্রীতে রচনা করেছেন, রচয়িতার মতন, এবং তার উপরেই আমার ক্ষুদ্র আমির আহ্বান করা হয়েছে। এই বড় আমির চরাচরে আমার ছোট আমিত্বের পরিচয়।

শেলিং-এর তত্ত্বটুকু এত তাড়াতাড়ি আত্মস্থ করা যায় কিনা জানি না। তার দেওয়া সাজেশন্ থেকে যে রোমান্টিকেরা তাদের নন্দনতত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। রবীন্দ্রনাথ তার তত্ত্বে এই রোমান্টিকতার অনুগামী। তিনি এই অনুগামীতায় তার ঋণের ব্যাপারি সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন আমরা বলতে পারি না তবে চিন্তাধারার সাযুজ্য কোথাও কেটে যায় না বা ব্যাহত হবার সুযোগ পায় না 'অনুভূতির গভীরতা-দ্বারা বাহিরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মবোধ যতটা সত্য হয় সেই পরিমাণে জীবনে আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে, অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা'। (সাহিত্যতত্ত্ব)। অর্থাৎ নিজেকে চেনার জন্যে বাইরের সঙ্গে যে বিচ্ছেদ মানুষ ঘটিয়েছিল তার উত্তর জানতে তাকে সংসারের পিছুটান ফেলে একটা অব্যয় উপলব্ধির জগতে প্রবেশ করতে হয়। সংসারের যে প্রয়োজনের সামগ্রী তার থেকে কবি উত্তীর্ণ হতে চায় কারণ এ উত্তরণ তাকে সংসারের সীমানায় ফিরে আসবার পথ দেখাতে পারে। এ পথে নিশ্চয়ই বর্তিকা আছে। অন্যত্র নিজেকে পাওয়ার এ পথ। এখানে প্রয়োজনের টানকে উপেক্ষা করতে হয়েছে। তাকে ছেড়ে দিয়ে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে এমন নয়, উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। এ উত্তরণ কবির মানসে আগে থেকেই আছে। পাখির উড়বার শর্ত যেমন তার দেহের সৌষ্ঠবেই রচিত হয়ে আছে তেমন করেই রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বসংকল্পে এই উত্তরণের শর্ত সংহত রয়েছে। এই কারণেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যতত্ত্বকে বুঝতে গেলে আমাদের একটা বক্তব্য স্মরণ রাখতে হয়। কবিই যেমন বলেছিলেন, 'প্রয়োজনের সংসারটা আমাদের আপনাকে ঘিরে রাখে কড়া পাহারায়, অবরোধের নিত্য অভ্যাসের জড়তায় ভুলে যাই যে, নিছক বিষয়ী মানুষ অত্যন্তই কম মানুষ—সে প্রয়োজনের কাঁচি ছাঁটা মানুষ'।

অবশেষে এই প্রবন্ধের উপসংহার টানতে হয়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ভাবনা থেকে আধুনিক প্রজন্ম কি জানতে পেরেছে? প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথ বাঙালীকে উপরিউক্ত এই অপ্রয়োজনীয়তার দীক্ষা দিয়েছেন। এমন অপ্রয়োজনীতাকে বরঞ্চ প্রয়োজনাতীত শুধোলে ভাল হোত কারণ আমরা যেহেতু শব্দের বাঙময়তা অনুধাবন করতে নারাজ সেহেতু আরেকটা নতুন কথায় এই ধারণাটা লিপিবদ্ধ করা যায়। রবীন্দ্রনাথকে সুধীন দত্ত ম্রিয়মান সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। অতুলনীয় বললে অত্যুক্তি হবে না। সুধীন দত্তের মন্তব্যে যে কাব্য প্রতিভার পরিচয় আছে তা এতটাই বিজ্ঞানসম্মত যে কেবলমাত্র এই উপমাটুকু উদ্ধৃত করলে বাকী রচনাটা পড়া প্রায় নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে, 'তার পাশে সাম্প্রতিকেরা তেমনই নিষ্প্রভ যেমন দীপ্তিহীন সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহ উপগ্রহেরা'। (রবীন্দ্র প্রতিভার উপক্রমণিকা)। এ কথা প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা থেকে জানা আছে যে গ্রহ-উপগ্রহেরা তাদের শক্তি আহরণ করেছে রবির থেকে, সুধীন দত্তের উপমার এইখানেই সার্থকতা যে তাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিক কবির সূত্রটুকু চরিতার্থ হয়েছে। কেমন করে আধুনিক মানসিকতার সূত্রপাত হয়েছিল, কেমন করে কবিতা বর্তমানে যেমন আকার তার দেখি তেমন রূপ পেয়েছিল তার উত্তর পাওয়া যায় সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকে। দ্বিতীয়তঃ, যদি সাহিত্যতত্ত্ব থেকে অন্ততঃ এই কথাটুকু গ্রহণ করা হয় যে উপলব্ধির পথেই কবি তাঁর যাত্রা শুরু করেন তাহলেই বলা চলে আমরা কবির মূলবাণী সম্পর্কে সঠিক করে ভাবতে শিখেছি। কবির মগ্নতা, কবির গভীর ভাবনা যে সে বিধাতার কবিপাঠ সম্পাদন করছে, আর এই যে সে চিত্তকে সংসারের আধার বলে জেনেছে, সেখানেই এই তত্ত্বের সারমর্ম। কবিগুরুর পৃথিবীর ধূলিকে কি কারণে মধুময় লেগেছিল সে প্রশ্নের উত্তরে এ আলোচনার সারমর্ম। দ্যুলোক মধুময়, ভূ্যলোক মধুময়, ঈশ্বর বিধাতার প্রকাশ ঘটে চিত্তে, বড় আমি ছোট আমির সংসর্গে নিজেকে আর্টে, কবিতার সুরে গেঁথে চলেন। যে উপলব্ধি কবির একান্ত নিজের তা নিয়ে ভাগবাটোয়ারা চলে না। কিন্তু, যতক্ষণ না একটা বড় ভাবনা তাঁর ঘেরাটোপের অস্তিত্বকে আরও বড় করে তুলছে ততক্ষণ তাঁর লেখার প্রক্রিয়া শুরু হয় না। কবির একটা অভিজ্ঞতার জগৎ থাকে। তার শব্দের জগৎ। শব্দের উচ্চারণে বৈচিত্র্যে প্রকাশ পায়। কেবল এই সংস্থাপন রয়েছে। এর অন্যথা হয় না।

পাদটীকা

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় আর রবীন্দ্রনাথের বিতর্কের কড়চাটা আমি বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত রবীন্দ্র নন্দনতত্ত্ব থেকে নিয়েছি। রাধাকমলের গ্রন্থ আমি হাতের কাছে পাইনি। কুচবিহার সরকারি কলেজে রাধাকমলের 'আত্মদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ' বইটি আছে।

রবীন্দ্রনাথকে আমি ক্লাসিকাল বলেছি, এটা আমার একান্ত নিজস্ব বক্তব্য, প্রেসিডেন্সি কলেজের এক অধ্যাপক, যিনি, তাঁর অসাধারণ রবীন্দ্র স্কলারশিপের ঝুলি থেকে আমায় 'নবজাতক' থেকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন—তার অসামান্য সুকণ্ঠে—তার কাছে জেনেছিলুম যে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে রোমান্টিক বলেছিলেন, 'ওরা যে বলে মোরে

রোমান্টিক সে কথা মানিয়া লই রসতীর্থ পথের পথিক', এটাকে আমি রবীন্দ্রনাথের নিজের ব্যাপারে হঠকারিতার অন্যতম দৃষ্টান্ত বলে মনে করি।

অক্ষর ঈশ্বরকে কবি বলা হয়েছে ভগবৎ গীতায়, রাধাকৃষ্ণনের টীকায় গীতার এই শ্লোকটির সঙ্গে উপনিষদকে তুলনা করা হয়েছে। তবে অক্ষরের আভাস এর আগেই আমি প্লেটোর লোগোস তত্ত্বের মধ্যে অনুসন্ধান করতে শুরু করেছিলাম, আমার গবেষণার পাশে পাশে এ সকল তত্ত্বে কিছুটা পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চেয়েছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের যে ছবিকে উদভ্রান্তা নারী নাম দিয়েছি তা পাঠক আর. পি. জি. এন্টারপ্রাইজের 'ঠাকুর বাড়ির চিত্রকলা' নামক গ্রন্থের প্রচ্ছদে দেখে থাকবেন। সে ছবিতে পূর্ব প্রোফাইলে যে নারীটিকে দেখা যায় তার অভিব্যক্তিকে আমার অপ্রকৃতিস্থতা বলেও মনে হয়েছে।

শেলিং কিংবা ফিক্‌টের অনুবাদ আজকাল কলকাতায় পাওয়া যাচ্ছে। ম্যাক্সমূলার ভবনের পাঠাগারে তাঁদের উল্লিখিতগ্রন্থগুলি পড়েছি। তাঁদের তত্ত্বের উপর সুবিচার করতে পারা গেল না স্থানের অভাবে। আমার শব্দ ব্যবহার করার আর্টেও অনেক ঘাটতি রয়েছে। বাঙালির একটা দর্শন শাস্ত্রের অভিধান রচনা করাও দরকার। সুচিন্তিত শব্দ প্রয়োগের অভাবে বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের চিন্তায় এখন প্রসাদরহিত কচকচানি ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না।

এখানে যে বিষয়টার আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল তা হোল খ্রীষ্টান ধর্মে শব্দতত্ত্ব। এটি বাদ পড়াতে রচনাটি একমুখি হয়েছে। তবে বিষয়টি বড় করে দেখা প্রয়োজন কারণ বাহ্মসমাজের উপর খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব সব থেকে প্রকট এবং অবিসংবাদিত। এ বিষয়টি নিয়ে লেখার ইচ্ছে রইল।

৮

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সমাজতত্ত্ব বিষয়ে পর্যালোচনা

একালে অনেকাংশে সমাজবিজ্ঞান নামে একটা বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। যেহেতু বাঙালির শিক্ষাদীক্ষার কারবার ছাঁচে ঢালা বস্তুর মতো সেহেতু সেখানে স্বকীয়তার স্থান অকিঞ্চিৎকর। দিশি মালের একটা অকৃত্রিম ব্যাপার থাকে এবং ক্ষেত্র বিশেষে কেতাদুরস্ত আদবকায়দায় অরুচি হলে যেমন একেবারে পুরাতন, শাক-তরকারি বা দই মিষ্টান্নতে রসনার তৃপ্তি হয় তেমন অন্য জাতি বা মানবগোষ্ঠীর সমাজচেতনাকে নিজেদের উপরে অবিবেচকের মতো চালাতে থাকলে একদিন বীতরাগ হবার সম্ভাবনা তৈরী হয়। তখন স্বকীয় সমাজবিদ্যার কথা স্মরণ করতে ইচ্ছে হয়। অথচ যখন আমরা কলেজের পরীক্ষার জন্যে সমাজবিজ্ঞানের বই পড়েছিলাম তখন আমাদের কোন ক্রমেই নিজেদের গড়াপেটা করা সমাজতত্ত্বের খেয়াল পড়েনি। আমরা যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে মার্কস্ বা হেবার পড়ি। বর্তমানে রল্স্ কিংবা মিচেল ফুকো সেই স্থান অধিকার করে নিয়েছেন, অথচ কোথাও, ভেবে দেখুন দেখি, যাকে নিছক ভারতীয় অবদান বলে মনে করতে পারি, তার সেরকম কদর হচ্ছে কিনা? আপাতত আমার উপসংহার এইটুকুই যে ভারতীয় রাজনৈতিক দর্শনের একটা পূণর্মূল্যায়নের সময় এসে উপস্থিত হয়েছে আর তার জন্যে নেহাৎ সংগ্রামের তথ্য নয়, বা ইতিহাসের তথ্য নয়, তার সূত্র নির্ণয় করা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গক্রমে ধূর্জটিপ্রসাদের নাম স্মরণ করতে হয়। যদি একটা রাজনৈতিক মতাদর্শ গড়ে ওঠবার ঐতিহ্য বিবেচিত হয়, যাকে প্রকৃতই বাঙালি বলা চলে, যার উন্মেষ হয়ত ভারতে ইংরেজদের রাজপাটের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' অথবা রবীন্দ্রনাথের ইতস্ততঃ চিঠিপত্র বা গদ্যরচনাতে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছিল, সেই ইতিহাসের একটা পর্যায়ে প্রাবন্ধিক ধূর্জটিপ্রসাদের স্থান। এই চিন্তাধারার অনেকটাই দেশি মালমশলায় পুষ্ট হয়েছে আবার অনেক ক্ষেত্রেই যেখানে পরিশীলিত মানসিক সখ্যের টেন্ডেন্সি দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে ইংরেজের শিক্ষা যখন দেশের পতাকাকে নতুন করে বাতাসে আন্দোলিত করে তুলেছিল, সেখানে মনে হতে পারে যে দেশজ ততটা নয় যতটা ভাবনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইংরেজ আমলের পলিটিক্স্। তবে

এখানে দেশজ বোধটা সক্রিয় ছিল। ফিরিঙ্গিদের চিন্তাভাবনায় অনুপ্রাণিত হলেও একটা নোঙরের মতো সংযোগ ছিল। এটাকেই প্রকৃত অর্থে বর্তমান ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তার প্রথম আভাস বলা যেতে পারে।

রাজনৈতিক দর্শনশাস্ত্র বা তত্ত্ব অথবা ইংরেজিতে যাকে বলে 'পলিটিকাল ফিলসফি' তা য়ুরোপের ভাবুকেরা অনেকদিন যাবৎ প্রচলিত করেছিলেন। বাঙালির শিক্ষাধারায় ঠিক এই রাজনৈতিক চর্চা নিয়ে সজ্ঞানে এমন লেখার দৃষ্টান্ত বেশী নেই তবে যারা উঁচু দরের সাহিত্যিক, যেমন বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, যাদের ক্ষেত্রে, বলা যায়, অনায়াসে বুদ্ধির জোরে বা প্রতিভার উৎসারে সমস্ত জগৎ সংসারের কাণ্ডকারখানা নিয়ে মতপ্রকাশ করার প্রবৃত্তি তৈরী হয়, তাদের দেখা যায় যে তারা এই ধরনের দর্শনচর্চা করছেন। সে লেখার মান যে কোনো য়ুরোপীয় লেখকের রচনার মানের চেয়ে কম নয় তা প্রমাণ করার দরকার পড়ে না। উপরন্তু নিছক রসের মূল্য বিচার করলে দেখা যাবে বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার মান বেশী, তা আরও মনোগ্রাহী, এবং যতদূর শ্লেষ বা ব্যঙ্গের চাতুর্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, তা কোথাও অপ্রতুল নয়। রবীন্দ্রনাথ যখন 'রাশিয়ার চিঠি' লিখেছিলেন তখন তার মধ্যে কতকগুলো প্রবণতা কাজ করেছিল। কেবল একজন দক্ষ রাজনীতির সমালোচক নয়। সেখানে তিনি ছিলেন আত্মবিশ্লেষক। তাছাড়া অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ যখন সমাজ, প্রগতি বা রামমোহনের মতো সংস্কারককে নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, যখন ইণ্ডিয়ান ফিলসফিকাল কংগ্রেসের পৌরহিত্য করার জন্যে অভিভাষণে লোকদর্শনের ভাবনা প্রবর্তন করছেন তখন, সর্বত্রই, তিনি কথকের মতো, মানুষের সংগ্রামের অংশীদার হয়ে তার শিষ্টাচারের উপযুক্ত মিতভাষণে, অনর্গল রচনা লিখেছিলেন। চিঠি স্বততঃই অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারের মতো কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিকে বাস্তব চোখে পরখ করে দেখছেন এবং সেটা সম্বন্ধে কিছু কথা বলতে ইচ্ছুক হচ্ছেন। এখানে কোন পাণ্ডিত্যের প্রশ্ন উঠছে না। ভাষা একেবারে কনভারশেসন-এর। 'রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য দেশের মতো নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে'। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের হাতে রচনায় লিখিত ভাষার অনুশাসন মেনে চলার একটা প্রবৃত্তি দেখা যায় কিংবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, যেটা প্রতীচীর সমাজে আরও সহজেই চোখে পড়ে, গাম্ভীর্য, মুসা প্রাণিত ঐষী কণ্ঠস্বরের সঙ্গে গভীরভাবে সংবেদ্য, একটা মন্দ্র ভাবালুতা যেন আরও প্রকট। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ এবং আমাদের আলোচ্য প্রাবন্ধিক ধূর্জটিপ্রসাদের লেখাতে যে সরস, কৌতুকপ্রিয়, কথ্য ভাষার আধিক্য তা বিশেষ করে আমাদের সংস্কৃতির একটা অঙ্গ, একটা চেতনা। য়ুরোপের যে মহৎ নির্বিকল্প ও বিমূর্ত চিন্তাভাবনার প্রতি একটা আনুগত্য আমরা দেখেছি সেই মহান হেগেল বা রুশোর লেখনী থেকে বর্তমানের অ্যালথুজার বা ডেরিডা পর্যন্ত, তাতে তাদের সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয়—বা রাজনৈতিক—চিন্তার একটা অন্তর্নিহিত ভঙ্গি প্রকাশ পায়। প্রতীচীর দার্শনিকের দূরদৃষ্টি এত প্রগাঢ় এত প্রসারিত যে সেখানে সমাজ বা আচার ব্যবহারের জন্যে ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন হয় না। মানুষের সঙ্ঘবদ্ধতাকে তারা সজ্ঞান, দৈব প্রজ্ঞার চোখ দিয়ে দেখেছেন। তার সভ্যতার আদি প্রজনন নিয়ে কল্পনা করেছেন। তাদের সাধনা তাদেরকে

বিজ্ঞানের নিরাসক্ত দৃষ্টি প্রদান করেছে। সমাজে যখন কমঠবৃত্তি বা ধনীর আস্ফালন তাঁদের পীড়িত করেছেন তারা তখন বৈরাগ্যের ধর্ম অনুসরণ করেছেন এবং মানুষকে তারা প্রাকৃতিক অস্তিত্বের কথা, তার অস্তিত্বের পিছনে কোন অলঙ্ঘনীয় সূত্রের কথা, সত্যের কথা, স্মরণ করিয়েছেন। রুশো যখন সভ্যতার কথা লিখেছিলেন তখন তিনি প্রকৃতির বুকে যে শান্তির বাণী—মানব একদিন নদীর প্রস্রবন আর অরণ্যের সহচর হয়ে যে গান গেয়েছিল বা সুর ছন্দ সৃষ্টি করেছিল—সে সবের কথা স্মরণ করতে বলেছিলেন। পক্ষান্তরে তার বর্তমান সমাজকে কৃত্রিম, অপ্রাকৃতিক, নৈরাজ্য আর শোষণের কোন স্খলিত আধারের মতো, মনে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথকে যদি ভারতের সমাজদর্শনের একজন প্রতিভূ হিসেবে কল্পনা করি তাহলে দেখব যে তার লেখার মধ্যে এই দার্শনিক নির্লিপ্তি ততটা নেই যতটা সামাজিকতা আছে বা সহমর্মী পাঠকের সঙ্গে, দেশবাসীর সঙ্গে আলাপ সাক্ষাৎ করার প্রবণতা আছে। একটা ইংরেজী প্রবন্ধে, যার শিরোনাম সম্ভবত তিনি 'স্টেইট্ অ্যাণ্ড সোসাইটি' দিয়েছিলেন, তাতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে সমাজ অর্থাৎ লোকসমাজের ভিতরে যে পরিবর্তন এসেছে তা কথকদের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল। কথকতা এক রকম আর্ট। তা সখ্য, কৌতুক ও চাতুর্য দিয়ে চালিত হয়ে থাকে। অথচ তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ইন্‌টলেকটের রসদ থাকতে পারে। কথকতা বা যার আধুনিক সংস্করণ, যাকে কথোপকথন বলা যায়, মানে পয়ার বা পাঁচালির তাল লয় নয়—সমাজ যখন চাঁচাছোলা কথ্য ভাষার নাটকীয়তা আর যুক্তিতর্কের মার্গ ধরে চলে, তার কদর বাঙালি যথাযথ করতে পেরেছিল কারণ কথা বলাটা যে কেবল ফিচ্‌লেমো বা তামাশা করার জিনিস নয় এবং তদুপরি জমায়েত হয়ে গুলতানি করার একটা বস্তুর থেকে আরও বিশেষ কিছু শিক্ষার ব্যাপার হতে পারে সেটা বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন বা রবীন্দ্রনাথ পড়লেই পরিষ্কার হয়। কেবল তাই নয় কথোপকথনকে বা কথকের যে জমাটি আলাপের ঢঙ্ সেটা বরণ করে নিয়ে এই সব সাহিত্যিকেরা প্রকৃত বাঙলা গদ্যকে গঠন করে গিয়েছিলেন সেটা আজকে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। কারণ মেকি বাঙলা, সমালোচকের বাঙলা, অপরিপক্ক কবির বাঙলা, সব ক্ষেত্রেই গদ্য অনর্থের বা কপটের অলংকার। পক্ষান্তরে বাঙালির আদি ও সরল, মার্জিত কথ্য বাচন হল তার আলোচনার কার্যকর উপকরণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে সমাজবিজ্ঞানী ধূর্জটিপ্রসাদের সমাজচিন্তা বিষয়ক আলাপচারিতা বা সংলাপ, ইংরেজিতে যাকে ডায়ালগ আখ্যা দিতে হয় তার প্রকৃতই জুরি মেলা ভার। মানসিকতায় প্রায় চৌদ্দ আনা আন্তর্জাতিক হলেও স্টাইলের ব্যাপারে তিনি শতকরা একশ'ভাগের বেশী বাঙালি।

ধূর্জটিপ্রসাদ তার গ্রন্থ 'আমরা ও তাঁহারা' লিখেছিলেন ১৯৩২ সনে। অন্ততঃ বইয়ের মুখবন্ধে সেই রকম ইঙ্গিত রয়েছে যদিও উল্লেখ করা হয়েছে যে বিবিধ প্রবন্ধগুলো ছাড়া ছাড়া ভাবে লেখা হয়েছিল, নানা সময়ে, এবং নানা পত্রিকায়। যদিও আমি ধূর্জটিপ্রসাদের চিন্তাচরিত্রের একটা বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করব বলে মনস্থির করেছি, আমি প্রথমেই তার উক্ত গ্রন্থ নিয়ে কিছু বলার উপক্রম করছি বটে। তার কতকগুলো যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ 'আমরা ও তাঁহারা' সেই কথোপকথনের ভঙ্গিতে লিখিত যার এতক্ষণ

আলোচনা করছিলাম। এখানেও ধূর্জটি অবিসম্বাদিতভাবে রবীন্দ্রনাথের মজলিসি কথোপকথনের স্টাইলে লিখছেন যদিও এটা আরও উন্নত প্রকারের একরকম ভাষা। যেখানে রবীন্দ্রনাথ মার্জিত বা সাহিত্যমনস্ক সেখানে ধূর্জটির বাচনে উইট্ বা কৌতুকের পরিমাণ আরও বেশী। এক রসিক পণ্ডিতের স্টাইল। ঠিক যেন কোনো অধ্যাপক কথা বলছেন অথচ তাতে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যঙ্গ রয়েছে, কটাক্ষ রয়েছে, ইয়ার্কি করতে করতে কঠিন কথা সাফ করে বাতলে দেবার কারসাজি রয়েছে। এখানে পাণ্ডিত্যের বহর মাপতে, গোটা ত্রৈলোক্যের খবরাখবর পড়ার টেবিলে সাজিয়ে রাখতে লাগে না। বরঞ্চ ধূর্জটি নিজের জন্যে তিতিক্ষা করেন এবং নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করেন। সেইটুকু করতে করতেই অবশ্য নিজের বক্তব্যটুকু বেতের মত শক্ত হয়ে পাশ করিয়ে নেন।

বাঙালি লেখক কৌতুকনক্সাকে তার উপজীব্য করেছে। ধূর্জটিপ্রসাদ যে এর ব্যতিক্রম নয় সেটা 'আমরা ও তাঁহারা' গ্রন্থের মুখবন্ধে উচ্চারিত হয়েছে। বলা বাহুল্য যে তিনি যখন নিজের সঙ্গে অন্য সাহিত্যিকদের তুলনা করছেন তখন একটা বক্র শ্লেষ তার কথার মধ্যে কাজ করে। যেমন, জানুয়ারী ১৯৪৪ সনের ছোট উপক্রমণিকা 'কেন লিখি'-তে ধূর্জটি বলছেন আমি অন্তত জানি যে 'আমি তৃতীয় শ্রেণীর লেখক, প্রাণপণে চেষ্টা করি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠতে। বলা বাহুল্য, এটা আমার বিনয় নয়, কারণ চতুর্থ শ্রেণীর লেখক সম্প্রদায় আজও নির্মূল হয়নি বাঙলা দেশ থেকে'। অর্থাৎ, ব্যঙ্গের ভাল্‌ভ্ খুলে দিয়ে সোজাসাপ্টা কথায় যা বলার তা বলে দেওয়ার আর্ট বাঙলা ভাষাকে শক্তপোক্ত করে। কথ্য ভাষার বাচনভঙ্গি ছেড়ে দিলে বাঙলা ভাষার দম্ কমে যাবে, তাতে ভাবালুতার বেনো জল প্রবেশ করতে বাধ্য। ধূর্জটির ভাষা সম্বন্ধে এই বোধটা আমাদের সত্যিকারের পছন্দের বিষয়। এই বোধটুকু যতদিন রক্ষা করা যাবে ততদিন প্রকৃত বাঙলা টিকে থাকবে। এর অন্যথায় পাড়াগাঁয়ের জন্যে আমাদের যে বোধবুদ্ধি কাজ করে বা দিশি মালের যে কদর বজায় থাকে সেটা শিথিল হতে আরম্ভ করবে। এই দিশি বোধবুদ্ধিটুকুর জন্যে ধূর্জটির গদ্য বার বার পড়া, ঠিক এই কারণেই ধূর্জটি বাক্যালাপ বর্জন করেননি এবং তার দেশি সংস্করণ নতুন করে প্রবর্তন করতে পিছপা হননি। ধূর্জটি তাই বলছেন, লক্ষ্য করুন যে 'সব চিন্তাই তো ডায়ালগের। সমগ্র ইতিহাস না হোক তার বিপ্লবী অংশটুকু অন্তত এই নিজেব সঙ্গে নিজের, নিজের সঙ্গে তোমার, নিজের সঙ্গে পরের বাক্যালাপ, তর্ক-বিতর্ক, অর্থাৎ, কথোপকথন'।

তবে এই বাক্যালাপ, যাকে ধূর্জটি নিজেই ডায়ালগ বলছেন, সেটাকে যে প্রত্যেকটা জায়গায় তিনি আর্টের আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পেরেছেন সেটা মনে হয় না। ধূর্জটি কথোপকথনে পটু হতে পারেন, রাগ করে প্রতিপক্ষের বিচারকে এক হাত নিতে পারেন, কিন্তু সংলাপের সহজ বোধগম্যতা যে সর্বত্র বজায় রাখতে পারেন এমন বলা যায় না। মাঝে মধ্যে ধূর্জটি যাকে বলে 'স্টিক্স্ হিজ ফিঙ্গার ইন ডিফারেন্ট পাইজ'। অর্থাৎ অনেকগুলো বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন কিন্তু লেখার মধ্যে সেগুলোকে একটা সংযত স্থান করে দিতে অসমর্থ থেকে যান। কয়েকটা জায়গায় তাই দেখা যায় পাণ্ডিত্যের দোষ। অনেক কিছুই তার মনের মধ্যে থাকে, তিনি সেগুলোকে অ্যাজিউম করে নিয়েছেন, অথচ

প্রত্যেকটা জটিল চিন্তাকে যে তার পাণ্ডিত্যের ঠোঙা থেকে আলগা করে বের করে আনবেন সেটা হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই আরেকটু কম পণ্ডিত হলে ধূর্জটি ভাল করতেন। গান্ধীজির সবরমতি আশ্রম থেকে বড়লাট, রবীন্দ্রনাথের ক্যাটাগরীগুলোর পুণর্বিশ্লেষণ, কিংবা শ্যামবাজার এবং চিৎপুরের ভূগোল সব জটলা পাকিয়ে গেলে গদ্যের সাবলীলতা ক্ষুণ্ণ হয় বইকি। বিষয়গুলো মিষ্টির শোকেসের মধ্যে এবং জিলিপি, সন্দেশ রাখার মতো না হলেই মুশকিল হয়ে যায়।

ধূর্জটিপ্রসাদের রচনায় বিষয়বস্তুর যে প্রয়োজনীয়তা সে কথায় আসা যাক। কর্মসূত্রে তিনি নানা শহরে অধ্যাপনা করে বেড়িয়েছেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, যার অর্থ বিশেষভাবে মনোনিবিষ্ট হয়ে পাঠ করা, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে ইন্‌টরপ্রেট্‌ করা—ব্যাখ্যা করা, ধূর্জটি সারাটার মধ্যে, এই ব্যখ্যার কাজ নিয়ে, লিপ্ত ছিলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে তাঁর তত্ত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা হয়েছে সেটা বলা যায় না কিন্তু তাঁর বক্তব্যকে তাঁর নিজের টার্ম্‌স্‌ মেনেই বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। পটুয়ার কাজ যেমন দাগা বুলিয়ে প্রতিকৃতি সৃষ্টি করা। কিন্তু পটের দর দেয় পটুয়া নয়। সমঝদার ক্রেতা না থাকলে বাজারে পটের মূল্য পাওয়া যাবে না। ধূর্জটিপ্রসাদ প্রকৃতপক্ষে এক সমঝদার ক্রেতা। সাহিত্যের বাজারে তাকে সমালোচকও বলা চলে। আবার ক্রেতার মতো বলতে তার মধ্যে কোন পণ্য বা বস্তুকে নিজের জন্যে অর্জন করার একটা ইচ্ছে ব্যক্ত হয় কিন্তু বস্তুতঃ যারা আর্টের কদর করেন তারা অনেক ক্ষেত্রেই বস্তুটা নয় যতটা সুন্দরের উপস্থিতিটুকু মেনেই আত্মপ্রসাদ পেয়ে থাকেন। ধূর্জটিপ্রসাদের রচনাকে এই গোত্রে অন্তর্ভুক্ত করলে তার সার্থক মূল্য দেওয়া হয়। তবে তার মানে এই নয় যে ধূর্জটি সমালোচকের মতো তার বিষয়বস্তুর মার্জিনে দাঁড়িয়ে কেবল অন্যের তত্ত্বসমূহকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি নিজের মতামত বেশ সাহসের সঙ্গে সবার কাছে প্রকাশ করে গেছেন। যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন বা প্রতীক্ষা করেন তাকে যে সারাক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তার কোন মানে নেই। তিনি নিজের খেয়াল খুশি মতো এগিয়ে যেতে পারেন এবং অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে পারেন। অর্থাৎ নিজেদের স্থবির দর্শকের মতো না মনে করে যারা সমাজের জন্যে কাজ করতে এগিয়ে যান, কোন সামাজিক চিন্তার উপরে বাস্তব সংসারের একটা সাযুজ্য স্থাপন করতে চান তাদের দলে ধূর্জটিকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

আমার তো মনে হয় তার সমগ্র চিন্তার মধ্যে একটা ঐক্য আছে। যদিও তার লেখার বিষয়বস্তু তার বয়সের সঙ্গে পাল্টেছে কিংবা অনেক ক্ষেত্রেই একেবারে নতুন কোন তত্ত্বের রূপরেখা নিয়ে তিনি ব্যস্ত হয়েছেন এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে কিছু বিধিবদ্ধ ধারণা তাঁর ছিল। অনেকে হয়ত বলবেন যে, ধূর্জটির রচনায় বিক্ষিপ্ত মানসিকতা দেখা যাচ্ছে। চিরকালের মতো যাতে তিনি আস্থা রাখতে পারেন এমন কোন সূত্র তার রচনায় অনুপস্থিত। কিন্তু দোষারোপটা বড়জোর আট আনা সত্যি। ধূর্জটির একটা বিশ্বাসের সোপান ছিল। কারণ আদতে ধূর্জটিপ্রসাদ বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ ছিলেন কিনা সেটা জানা দরকার। ধূর্জটি নিজকে একজন এম্‌পিরিকল্‌ চিন্তাধারার মানুষ হিসেবে ভাবতেন তাতে সন্দেহ নেই। ইতিহাসের দাবি তাঁর কাছে মহৎ বলে মনে হয়েছিল। তিনি নিজের বাস্তববোধ

সম্পর্কে পাঠককে মনে করিয়ে দিচ্ছেন। বাস্তব জগৎকে তিনি ইহলোক বলেছেন, বা ইহলোক সম্পর্কিত সচেতনতা এবং কেবল কিংকর্তব্যবিমূঢ় সংসারের ফাঁদে পড়ে থাকা নয় ধূর্জটি ইহলোকের জন্যে একজন বুদ্ধিজীবির পক্ষে যেরকম সম্ভব সেরকম চিন্তিত ছিলেন। এই কারণেই তিনি শাস্ত্র বা ধর্মের বিষয়গুলোকে পিছনের বেঞ্চে ঠেলে রেখেছিলেন। 'সৃষ্টির প্রধান কথা জ্ঞান, ভাবের আবেগ নয়, এবং সে জ্ঞান যত ইহজগতের হয় তত মঙ্গল। বিজ্ঞানই ইহজগতের জ্ঞানের মধ্যে একমাত্র পদ্ধতি যার উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করা যায়। বিস্তর দোষ থাকা সত্ত্বেও, এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই সাহায্যে কুসংস্কার ও স্বার্থপরতা দূর হয়, অন্যায়ের বোঝা কমে, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয় ও বহুদূর চলে'। অবশ্য ধূর্জটি বিজ্ঞানের উপরে নির্ভর করলেও বিজ্ঞানের পদ্ধতি তাঁর কাছে অনাবিল জ্ঞানের বস্তু ছিল না। ধূর্জটি যতক্ষণ মানছেন যে, জ্ঞানই সৃষ্টির পক্ষে প্রথম পথ ততক্ষণ তার আস্থা অটুট থাকছে। তবে যদি কোনক্রমে সেই জ্ঞানের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দেয় বা বিপরীত জ্ঞানের বোধ সৃষ্টি হয় তখনই বাঁধে গোলমাল। অর্থাৎ যদি বলি যে সমাজের মধ্যে একটা আইন প্রণয়ন করলেই তাতে সকলের মঙ্গল হবে তাহলে তাতে গলদ নেই অর্থাৎ সমাজের ইতিহাসকে পর্যবেক্ষণ করে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি হয়ত একটা আইন সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তে এসেছেন। অথচ কোন আইনেরই সমাজে চিরন্তন স্থায়িত্ব নেই। আইনজ্ঞ বোঝেন যে সামাজিক রীতি বা সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের মূল্যবোধগুলো পাল্টে গেলে কিংবা অপরপক্ষে মানুষের সমাজের অভ্যন্তরে ক্ষমতা বন্টনের হিসেব বদ্‌লে গেলে আইনেরও সংজ্ঞা বদলায়, কার্যকারিতা বদলায়। তখন একতরফা সিদ্ধান্তের মেয়াদ ফুরোয়। প্রথাসিদ্ধভাবে যেটাকে সত্যি বলে মানা হয়েছিল, সেটার মধ্যেও যে ব্যতিক্রম থাকতে পারে এটাই মানুষের মনে বিরোধের জন্ম দিতে পারে। বৈজ্ঞানিক যখন বলেন যে ভগবান বিশ্বসংসারকে নিয়ে জুয়া খেলেন না তখন সাধারণভাবে ঐক্যের প্রতি আমাদের একটা অনুচিকীর্ষা তৈরী হয়। আবার যখন পরমাণুর অভ্যন্তরে এমন কিছু ঘটছে দেখি যাকে আমার বিধিসম্মতির বা বিজ্ঞানের শৃঙ্খলপরায়ণতার দৃষ্টান্ত বলে মনে হয় না তখনই বিরোধের প্রশ্ন ওঠে। বিজ্ঞান যখন তার নিজের প্রদত্ত দৃষ্টান্তের ভিতরে নিজের তর্কের ব্যতিক্রম ডেকে আনে তখনই বিরোধের সৃষ্টি। ধূর্জটি বিজ্ঞানের—বলা যেতে পারে—সমগ্র জ্ঞানের এই বিরোধী পক্ষের দিকটা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। 'বিরোধের কথা' বলে তার একটা প্রবন্ধও আছে। কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ধূর্জটির কাছে বিরোধের প্রশ্নটা সমাজবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে যেন সর্ষের মধ্যে ভূত, অথচ হয়ত এই বিরোধের সমাধানের মধ্যে দিয়েই প্রগতি।

তবে এত সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে ধূর্জটিপ্রসাদ, এই একটু আগেই যেমন বললাম, একটা আত্মবিশ্বাসের সোপান থেকে লিখেছিলেন। এখানেও কয়েকটা ব্যক্তিগত ব্যাপার এসে পড়ে। ধূর্জটি নানা জায়গায় নিজের ধর্মীয় বিশ্বাসকে অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি বলেছেন তিনি ধর্ম মানেন না। নিজের আস্তিকতা নিয়েও সন্দিগ্ধ হয়েছেন। অথচ আমার মনে হয়েছে যে যদি একটা আধ্যাত্মিক বলয়ের থেকে রচনার বিষয়বস্তু তার বিশিষ্ট রূপ না পায় তাহলে তো সে রচনার কোন অর্থই হয় না। ধূর্জটিপ্রসাদ কিন্তু এই

পরাবাস্তবিক সত্যিটুকুর কথা জায়গায় জায়গায় উল্লেখ করছেন কিন্তু সেটিকে আপাদমস্তক আলোচনায় টেনে আনছেন না। এক্ষেত্রেও আমার দুটো দৃষ্টান্তের কথা স্মরণ হচ্ছে এবং সেটুকু অবিলম্বেই আলোচনা করব। প্রথমতঃ একটা মহৎ চিন্তাকে কয়েক ক্ষণের জন্যে ধূর্জটি প্রশ্রয় দিয়েছেন। এটা যে বেদান্ত আশ্রিত চিন্তা সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। আমি আগে ধূর্জটি থেকে উদ্ধৃতি দেব। তারপর এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করব। অবশ্য এখানে স্বীকার করে নেওয়া শ্রেয় যে আমি কেবল ধূর্জটির চিন্তাকে বিশ্লেষণ করার জন্যে বা বর্ধিত সরলতায় প্রকাশ করবার চেষ্টায় রত নই। ধূর্জটির এই শাস্ত্রোল্লেখকে আমার তাৎপর্যবহ মনে হয়েছে। অনেককাল আগেই সামাজিক বিহিত সন্ধান করতে গিয়ে আমি এরকম চিন্তার শরণাপন্ন হয়েছিলাম। আমার কেবলই পরাজগৎকে প্রমিত মনে হয়েছে। কারণ যেহেতু সেই জ্যোতির্ময় উৎস থেকে কিছু বিকীর্ণ হয়ে এখানকার সমস্ত সম্পৃক্ত করেছে, সর্বের মধ্যে, বা বিশেষের মধ্যে, সেটুকু না হলে যে এখানকার, অর্থাৎ ইহজগতের, সব গতি বিকল হয়ে যেত বা বিপথগামী হয়ে পড়ত সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ঘুচেছিল। পক্ষান্তরে ধূর্জটি, একজন সৎ ও আধুনিক নৈয়াইক যেমন হয়ে থাকেন, বাস্তব ও বিজ্ঞানে আস্থাবান। তিনি বেদান্তের অলৌকিকত্বের দিকে কেবল ফিকে ইঙ্গিত করেছেন। হয়ত সেই সিদ্ধান্ত তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন তবুও তার সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে কোন বুলেটিন জারি করতে হয়নি। তার বিপক্ষকে উদ্দেশ্য করে ধূর্জটি বলছেন যে এই জগতের মধ্যে মিথ্যার স্থান হয়ত রয়েছে তবে এ যেন ঠিক মিথ্যে নয়। বরঞ্চ বিপক্ষের উদাহরণে সম্মত হয় একে তিনি লীলা বলছেন, 'এই লীলা কিংবা মায়ার কারণ, উৎপত্তি কিংবা উদ্দেশ্য কি, কেউ বলতে পারে না। তবে আমাদের কাজ বিচার করে যাওয়া মাত্র। ...বিচারের পর যদি কিছু পরিমাণে সত্যের আভাস পাওয়া যায়, তা হলেও বলতে পারেন যে কোন লাভ নেই। কেন না একবার আভাস পেলে আর কেউ সে জায়গা থেকে ফিরে আমাদের বলতে আসে না, সেই সত্যের মধ্যেই ডুবে থাকতে চায়'। বেদান্তের অন্তিম সূত্রের জন্যে শঙ্করাচার্য যে টীকা ভাষ্য লিখেছিলেন তার অনুরূপ ভাবনা বিধৃত হয়েছে ধূর্জটির এই বক্তব্যে। যে ব্যক্তি এই সংসার পরিত্যাগ করে ভগবৎজ্ঞান অন্বেষণ করতে বের হয়েছে সে ইহজগতে প্রত্যাবর্তন করতে পারে না। এই অর্থেই আমাদের পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্তি। যখন আমার এই গোটা অস্তিত্ব, আমার জীবনযাপন করার মধ্যে আমার নিজেকে কোন প্রেতপুরীর মতো মনে হয়, য়খন এই বিরাট চরাচরে আমার অস্তিত্বের গৃহ থেকে ইন্দ্রিয় মন কোন শীতল অলৌকিক আকাশে প্রত্যাগমন করে, তখন এই বোধটা ফিরে আসে যে সত্যের পথ যদিও চোরাখাতে বয় বা কন্টকাকীর্ণ হয়ে রয়েছে, পাথুরে সমস্ত টিলার উপর দিয়ে যে সংকীর্ণ রাস্তা সেখানে পৌঁছলে আর নীচু জমিতে নামা যায় না। এই সেই মহাপ্রস্থানের পথ যে পথে শঙ্কর একদিন যাত্রা করেছিলেন। ধূর্জটি সে পথের বেড়াগেটটি আটকে রাখেননি। তবে তিনি ততটা তাড়ায় ছিলেন না। ইহজগতের পক্ষে সে পথের চেয়ে সমতল যেন শ্রেয়। ধূর্জটি এই মানবিক পোজিশনটা গ্রহণ করেছিলেন। এতে কতদূর বিজ্ঞানের আদর পাওয়া সঙ্কটগুলোর কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়েছে আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই। তবে এ কথা স্বীকার করব যে

ধূর্জটিপ্রসাদের রচনাবলী পড়ার জন্যে ইন্‌সেন্‌টিভ্ নয়, কেবলমাত্র ধূর্জটি সম্পর্কে অন্ততঃ একটু পজিটিভ ভাবনাচিন্তা অক্ষয় করে রাখতে গেলে এই ভাববাদী বা—যে কথাটা আমার ব্যবহার করতে নারাজ্‌গি আছে—এই 'আধ্যাত্মিক', এমনকি হয়ত উপনিষদ প্রেরিত সত্যের উঁচু জমি থেকে যে তাঁর রচনা পাঠ করা দরকার সেটা রাষ্ট্র করে দেওয়া ভাল।

অতএব ধূর্জটিপ্রসাদের সমাজবিজ্ঞানকে আমরা এই হ্রস্ব আলোচনার মধ্যেই একটা বিন্যাসলাভ করতে দেখতে পাচ্ছি। তার কাছে অধ্যাত্মের দাবিটা কম কথা নয়। তবে অধ্যাত্মবাদ আছে কিন্তু বাস্তব বা যাকে ইংরেজিতে বলে রিয়্যালিটি, সে ব্যাপারে তাঁর রচনা অপ্রতুল নয়। দ্বিতীয়তঃ একটা নিরূপম স্থান যেন, শাস্ত্র যাকে আকাশ বলছেন, এই সমস্ত বাস্তবের উপর যা এক স্থির সূর্যের মত, তা হয়ত অস্তিত্বমান অথচ প্রচ্ছন্ন। ধূর্জটি এই প্রচ্ছন্নতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন বটে। যা আজ 'রীলিজিয়ন' বা 'ধর্ম' বলে পরিচিত তার কোন স্থান ধূর্জটির লেখায় নেই, এবং আমার এ প্রসঙ্গে আবার মনে পড়ছে আরেক বাস্তবধর্মী লেখকের কথা। অবশ্যই তিনি সুধীন দত্ত এবং পাঠক হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে সুধীন দত্ত তাঁর গদ্যরচনাকে ধূর্জটির করকমলে নিবেদন করেছিলেন। সুধীন দত্ত আরও বেশী বাস্তববাদী। তিনি নৈরাজ্যকেও বাস্তব বলে মনে করতেন। পক্ষান্তরে ধূর্জটি যখন বাস্তবের উর্দ্ধে তিনি বিচরণ করেছেন একমাত্র তখনই তাঁর সমস্যার সমাধান হচ্ছে বলে মনে হয়েছে। আর বাস্তবতা রক্ষা করতে গিয়ে অনেক জায়গায় তত্ত্বের গুব্‌লেট হয়েছে। সে প্রসঙ্গে আসছি। কেবল পাঠক মার্জনা করবেন যে অধ্যাত্মবাদকে আমার এই আলোচনাতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও টেনে আনতে হোল। এটা যে পাঠ্য সম্পর্কিত ব্যাপার নয় সেটা আমি কবুল করছি। এটা একান্তই আমার স্বভাবজনিত কারণ। আমি মনে করি যে এই তমসাবৃত সংসারে যদি কোন সমস্যার সমাধান করা যায়, কোন অঙ্ক মেলার ব্যাপার থাকে বা কোনো সত্যিকারের জানার ব্যাপার থাকে তাহলে তা এই আধ্যাত্মিক যোগসূত্রেই কায়েম হয়ে থাকে। এই সংসারের কেবল একটা উন্মুখ অস্তিত্ব রয়েছে, ভূমি, গিরিবর্ত, প্রস্তরখণ্ড, পর্‌গাছা, বৃকোদর থেকে বৃক্ষ, অন্তঃশীলা নদী, পশুপক্ষী এমনকি আসক্ত মানুষ কেবল এবং নির্বাক যন্ত্রণায় তাদের কার্যসিদ্ধ করে চলেছে। কেউই স্বস্তিতে নেই। পক্ষান্তরে একমাত্র মানব সন্তান বোধহয় এই তমসার ভিতরে কোন প্রায় অব্যক্ত উপায়ে জ্যোতির সন্ধান করে। এই আধ্যাত্মিক চেতনা কোথাও নিশ্চয় আছে। প্রকৃতির বুকেই বোধহয়, আর তা না থাকলে মানুষ সে ধারণার সৃষ্টি করতে যাবে কেন? কেবলমাত্র কেমিস্ট্রির স্তরেই তাহলে জগতের সমস্ত প্রক্রিয়ার থেমে থাকার কথা। সবই, অর্থাৎ সবই যা প্রকৃতির অন্তর্গত, তা উচ্চস্তরে ফিরতে চায়, সে কারণেই জগতের বুকে মানব একদিন সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে কারণেই মানুষের সমাজে করুণা সুলভ হয়েছিল। সে কারণেই হয়ত সমাজ একদিন এক টুকরো আর্ট হয়ে উঠবে।

আধ্যাত্মিকতাকে প্রাধান্য দেবার ব্যাপারটা আরেকবার বিশ্লেষণ করে দেখা ভাল। বিশেষ করে তার সঙ্গীত সমালোচনা কিংবা সাহিত্য সমালোচনার উপরে প্রবন্ধগুলো নিতান্ত খাসা মাল। যদিও তাকে দু-এক জায়গায় সুখপাঠ্যের কম্‌তি রয়েছে এবং যদিও

সব পাঠক স্কলার নন তবুও মানতে হবে যে তিনি অন্ততঃ বা বিশেষ করে সঙ্গীত সমালোচনাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে একটা দৃষ্টান্ত করে গেছেন। আমি এখানে ধূর্জটির সঙ্গীত সম্পর্কিত প্রতিভার বিস্তারিত কীর্তন করছি না। তার জন্যে অন্য সেমিনারে বা কনফারেন্স করলে ঠিক হয়। অবশ্য আসল বক্তব্য প্রকাশ করার পূর্বে এখানে দুটো কথা পরিস্কার করে নেওয়া অনুচিত নয়। সঙ্গীতের কথাই ধরুন না কেন। খুব নির্দিষ্ট করে তিনি ধ্রুপদকে অন্য সব সঙ্গীতের ঘরাণার উপরে স্থান দিচ্ছেন। বাঙলার কীর্তন তার কাছে সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরপ্রক্ষেপ নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করছেন। সবথেকে তার যে আলোচনা আমার কাছে মনোগ্রাহী ঠেকেছে, অর্থাৎ, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের—মানে প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে যেখানে খুসরোত্তই বা ইসলামি সাঙ্গীতিক পদ্ধতির একটা সংঘাত হচ্ছে—সে সম্বন্ধে যে পর্যালোচনা তার অপরিসীম মূল্য। কিন্তু আলোচ্য এইটেই যে ধ্রুপদের স্থান সবার উপরে। তার কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। আমার নিজেরও ধারণা যে ধ্রুপদ শ্রেষ্ঠ। এ ব্যাপারে অন্য পরিপ্রেক্ষিতে লেখবার ইচ্ছে রইল! আসলে সঙ্গীত রসের সামগ্রী বটে তবে এ কথাও ঠিক যে সঙ্গীতের উৎসে নিশ্চয় কোন গভীর শব্দ, কোন গভীর নাদ, বা ওঁকারের মন্দ্র ধ্বনি বিরাজ করছে। এই প্রতিপাদ্য মেনে চললে অবশ্যই ধ্রুপদের শ্রেষ্ঠত্ব আপনা আপনি প্রমাণিত হয়।

তবে এবার আরও প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে কিছু মন্তব্য করা সমীচীন বোধ করছি। যেটা একটু আগেই বলা হয়েছিল। অর্থাৎ, ধূর্জটির 'আধ্যাত্মিকতা' বা ধূর্জটির আধ্যাত্মিকতার উপস্থাপনা আমরা অনুভব করি 'সাহিত্যের কথা' নামের প্রবন্ধে। অদ্ভুত। তিনি এই প্রবন্ধে মানুষের মনের মধ্যেকার দুটো স্তরের কথা বলছেন 'বুদ্ধি' আর 'আত্মা'। 'বুদ্ধি' আর 'আত্মা' নাম দিয়ে এই দু'রকমের ইন্দ্রিয়কে চিহ্নিত করবার যে কায়দা তিনি বাতলেছেন তার একটা নৈয়াইক বৃত্তি আছে বলে আমার ধারণা। চিন্তা করে দেখলে এই ব্যাপারটা নিয়ে সুপারিশ করা সম্ভব। অর্থাৎ চিন্তাশীল পাঠক নিশ্চয় ধূর্জটিপ্রসাদকে এ বিষয় সমর্থন করবেন। ধূর্জটিপ্রসাদের গোটা চিন্তার ভিতরে যে স্তরের জ্ঞান ছিল এটা তারই প্রমাণ। এটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। 'আত্মা' ধূর্জটির কাছে 'বুদ্ধির' উপরকার ব্যাপার। আত্মার সার্বভৌমত্ব বা শক্তির কাছে বুদ্ধি পরাস্ত হয়ে রয়েছে। বুদ্ধির যেটুকু কার্যকরি ক্ষমতা, যেটা সমাজের সর্বত্র সামাজিক কাণ্ডকারখানা, সামাজিক লেনদেন, ব্যবসা, বাণিজ্য, ইস্কুল, কলেজ সরকারি প্রতিষ্ঠান, এই সকলকে চালনা করছে তাকে আত্মা থেকে প্রেরণা পেতে হবে। আত্মার কাছে বুদ্ধিকে ঋণী থাকতে হবে। সৎভাবে বিচার করলে এই ধারণা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিপরীত বলে মনে হতে পারে কিন্তু ধূর্জটির কাছে এটাই যে একমাত্র সত্যি সে ব্যাপারেও সন্দেহ পোষণ করা যায় না। নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ 'সাহিত্যিকের যুক্তি তথা সাহিত্যে মিথ্যাবাদ'। ধূর্জটিপ্রসাদ বলছেন, 'যে ব্যক্তি য়ুলিসিসের মতন আরামকে অগ্রাহ্য করে অগ্রসর হতে পারে, সেই বেঁচে গেল, নচেৎ মিথ্যার কুহকে চিরকাল ভেড়া হয়েই রইল। এই জন্যেই বোধহয় হিন্দু দার্শনিক মন ও বুদ্ধিকে অত নীচু স্তরে রেখেছেন। এই জন্যই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ আর্টের ব্যাখ্যায় মন ও বুদ্ধির উল্লেখ না করে আত্মারই উল্লেখ করেন। মন ও বুদ্ধির কাজে জুয়াচুরি থাকবেই থাকবে—কেননা তাদের রাস্তা গলিঘুঁজি, আত্মার বিকাশে

জুয়াচুরি নেই, তার রাস্তা চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর মতোই সোজা ও চওড়া'। কি বলব? par excellence। এভাবে আত্মাকে শ্রেষ্ঠ চিহ্নিত করা, আত্মাকে কীর্তিত করা, বাঙালির চিন্তাশীল সাহিত্যে একটা বিরল দৃষ্টান্ত। প্রথমতঃ ধূর্জটি যে গভীর সত্যির কথা উল্লেখ করেছেন তার মূল্য কম নয়। আত্মার দর্শিত শান্তিকে যেদিন আমরা বুদ্ধি, ভেলকিবাজি অথবা ডিপ্লোম্যাটিক কথাবার্তার উপরে স্থান দিতে পারব সেদিন মঙ্গল হবে। তবে বুদ্ধিকে যে সব ক্ষেত্রে নীচু বলে ভাবতে হবে তার মানে নেই। বুদ্ধি যখন শুভ ভাব দিয়ে পরিচালিত হয় তখন তাকে বর্জন করার দরকার নেই। তাছাড়া মানুষের মধ্যে এত বলবান সব প্রবৃত্তি রয়েছে যে সেগুলো বিদায় করা দুষ্কর। বরঞ্চ বুদ্ধির অধীনটুকু মেনে নিলে অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের যে কল্যাণ হবে তাতে আর আশ্চর্যের কি। তবে, দ্বিতীয়তঃ ধূর্জটি যখন আত্মাকে একটা খবরদারি করবার মত আসনে চাপিয়ে দিয়ে তবে ক্ষান্ত হচ্ছেন, তখন এটাও সাফ, যে ধূর্জটির মানসিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সেই সিঁড়ি বা দিশি মইয়ের চরাই উৎরাই স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা ছিল। এই উপর নীচ বা লঘু গুরুর তফাৎ থেকেই আত্মা আর বুদ্ধির এলাকাগুলো পৃথক করে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে লোকটা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করে সে বোঝে যে নতুন কাজে লাগলে তার হাতের কলকব্জাগুলো এলোপাতাড়ি চলে। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মিস্ত্রী যখন দক্ষতা অর্জন করে তখন তার সমস্ত কাজটা নিজের দখলে চলে আসে, তার কাজ করার জন্যে আর চেষ্টার দরকার হয় না। আপনা থেকেই তার অন্তরের অনুভূতি তাকে হাত চালাতে প্রবৃত্ত করে। এটাই বোধহয় আত্মার কাজ। বুদ্ধিকে যেখানে প্রত্যেক পদক্ষেপে বাধাপ্রাপ্ত হতে হয় আত্মা সেখানে শান্ত, নিশ্চল হাতে সব কাজ সম্পাদন করায় সহায়ক হয়। অর্থাৎ, যেটাকে আত্মিক বলে আমরা জানি সেটাকে অর্জন করতে হয়। এটা আমাদের বোঝাপড়ার একটা স্তর। এই স্তরটাতে পৌঁছানোর চেষ্টা করলেই এখানে পৌঁছানো যায়। আবার একমাত্র যে ব্যক্তি এখানে পৌঁছেছেন তিনি এর মর্ম বোঝেন। মধুরেণ সমাপয়েৎ-এর কথা বলছি না। এটা একরকম শুরু। উপলব্ধির পথে যাত্রা করতে করতে সত্যটাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। যদিও বুদ্ধিমানের কোন জুড়ি নেই আর যিনি বুদ্ধিমান তিনিই বলবান, উপরন্তু বুদ্ধি আর দক্ষতা কল্যাণকর ব্যাপার, আরও বড় সত্যি হচ্ছে যে বুদ্ধিরও উপরে প্রশান্তি আর জ্ঞানের স্থান। এই প্রশান্তির সংসর্গে সংসারের যত টক্কর আর ঈর্ষা তার অবসান হয়। নীচতা পরিত্যাগ করা যায়। এই শান্তিতে লোভের ছিঁটেফোঁটা অনুপস্থিত। বিত্তের জন্যে চিত্তের চাঞ্চল্য ঘটে না। এখানেই সেই উপলব্ধি হয় যে শক্তির রূপে, শান্তির রূপে এই গোটা মহৎ অস্তিত্ব সংস্থিত রয়েছে।

এতক্ষণ যে আলোচনা করা গেল তাতে হয়ত ধূর্জটিপ্রসাদের আধ্যাত্মিক চেতনাকে একটু চড়া মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করবার বিভ্রম ঘটে গেছে, তাতে এ প্রতিবেদকের ক্ষেদ নেই। অবশ্য যেটা আমার এই প্রবন্ধ লেখার পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে কাজ করেছে সে বিষয় ফিরবার প্রয়োজন বোধ করছি। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে, এখানে যা একটা শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে, এই পূর্বোক্ত আলোচনা, যাতে ধূর্জটিপ্রসাদের পাঠকৃতি বিশ্লেষণ করার জন্যে কয়েকটা প্রতিপাদ্য গঠন করা গেছে, তার মধ্যে, সত্যদ্রষ্টার ঐকান্তিক চেষ্টার তরাইতে, চায়ের কাপে ঝঞ্ঝাবিদ্রোহের কথা নয়, বরং গোটা সমাজের ভাবনাটাকে একটা প্রায়

জৈবিক কল্পনায় পরিলক্ষ্য করবার কাজে, আমরা একটা অনুসন্ধান করবার পথ খুঁড়ে নিয়েছি। একজন সমাজবিজ্ঞানীর কাজ, বিশেষ করে, মানুষের গড়া সমাজকে নিয়ে, তার গতিপ্রকৃতি নিয়ে, মানুষের সম্পর্ক নিয়ে। ইংরেজিতে যাকে বলে, কমিউনিটির বোধ। মানুষ কমিউন গড়ে তুলেছে ইতিহাসের সেই আদিকাল থেকে, কোন অব্যক্ত সমঝোতায় তারা হাটখোলায় বিকিকিনি করতে এসেছে যেন। একটা অলিখিত কন্ট্রাক্ট্ সই করে যে যার কাজের আওতা আর মূল্য বুঝে নিয়েছে। নির্বিবাদে অনেকে মিলে থাকার প্রচেষ্টা থেকেই বোধহয় সমাজ সৃষ্টি হয়েছিল। কিংবা আর্যরা যেমন তাদের নিজেদের ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করে থাকে সেভাবেও সমাজের গঠন হয়ে থাকতে পারে। আর্যদের ক্ষেত্রে একটা মহৎ পরিকল্পনা তাদের চালনা করেছিল। এই বিরাট পৃথিবী, তার জলরাশি, তার বায়ু, তার আকাশ, নক্ষত্র কিংবা রাত্রির প্রজ্জ্বলিত গ্রহাদি সূর্য, চন্দ্রমা, বৃহস্পতি, এই প্রত্যেক অস্তিত্বকে দেবতার বিগ্রহে উপাসনা করা, সৃষ্টির প্রতি মন্ত্র উচ্চারণ করার যে উদাত্ত চেতনা, তারা বংশপরম্পরায় বয়ে এনেছিল। সেই উপাসনা থেকেই তার সমাজের রীতিনীতির পত্তন করেছিল। সমাজের প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত এই বিশ্লেষণ হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানীর কাজ। এ কাজের জন্যে আজ তারা সরকার আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে মাইনে পেয়ে থাকেন। ধূর্জটিপ্রসাদ এক নিতান্ত অধ্যাপকের মতোই তার মাইনে করা কাজের সঙ্গে একটু দূরদৃষ্টির চর্চা করেছিলেন। বিশেষত সমাজের উন্নতির প্রকল্পে, প্রগতির জন্যে কিছু সূত্র প্রণয়ন করা যদিও তার একটা বড় অবদান, নব্য সমাজদর্শনের ভূমিকায় তিনি আরও বিশদ আলোচনার মধ্যে গেছেন। 'প্রগতি'র সূত্রগুলোতে, 'বক্তব্য'-এর অন্তর্গত নব্য সমাজ দর্শনের ভূমিকাতে যে প্রতিজ্ঞা তিনি করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে একটা ঐক্যসূত্র রয়েছে আর আরও যেটা প্রয়োজনের তথ্য, আজকের প্রজন্মের কাছে, সেই উত্তরপিড়ির কাছে যারা রবীন্দ্রনাথ, ধূর্জটিপ্রসাদ কিংবা বিনয় সরকারকে একটা ক্লাসিকাল কক্ষপথে দেখে অভ্যস্ত হয়ে থাকবেন, সেটা হল একটা নির্দিষ্ট চিন্তার ভিত, এক মানবিক প্রত্যয় থেকে ধূর্জটির মাধ্যমে বাঙালির রাজনৈতিক চিন্তার একটা ট্র্যাডিশন, একটা নির্দিষ্ট ট্র্যাডিশন বলে যেটাকে পৃথক করে চিহ্নিত করা আবশ্যক বটে, সেটা গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। ধূর্জটির যেটা প্রকৃষ্ট অবদান সেই মর্মে ফেরবার আগে আমি এখানে একটু এ বিষয় আলোচনা জারি রাখতে চাই।

যে মহাসংগ্রামের অন্তরালে, স্বাধীনতার জন্যে উন্মুখ এই বিরাট ভারতবর্ষে যে গণতান্ত্রিক বা বৈপ্লবিক ঐতিহ্য সংগ্রামের প্রত্যেক পদক্ষেপ অনুসরণ করে আমাদের সামাজিক ডিস্‌কোর্সে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল, গান্ধীজির লবন আন্দোলনের আদর্শে যা মানুষের মনে চিহ্নিত হয়ে ছিল, কিংবা সত্যাগ্রহে, তাতে ভারতীয় নাগরিকের মতাদর্শ সৃষ্টি হচ্ছিল। জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে যে জনসংযোগ সমাজে স্থাপিত হয়েছিল সেটা যেমন একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছাড়িয়ে এ দেশের সাধারণ মানুষের একটা জীবনদর্শন হয়ে গড়ে উঠেছিল কিংবা যারা মধ্যপন্থার তোয়াক্কা না করে সরাসরি সঙ্ঘর্ষের সড়কে পদক্ষেপ রেখেছিল, যে বিপ্লবের চেতনা দক্ষিণ আর বামকে সমানভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল, সে কৃষ্টিশীল ইতিহাস আমাদের স্মরন রয়েছে। যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির

পরিপ্রেক্ষিতে ধূর্জটিপ্রসাদ তার গদ্য রচনা করেছিলেন সেখানে মানবিকতার একটা ঘোর ক্রাইসিসের সূচনা হয়েছিল জাতীয়তাবাদী চিন্তার উন্মেষে। য়ুরোপে তখন ফ্যাসিবাদের কদর্য রূপটা পরিস্কার হতে শুরু করেনি। জার্মানি কিংবা ইতালীতে কেবলমাত্র স্বাদেশীকতার সাহিত্যে নিশ্চয় কিছুটা ভবিতব্যের অঙ্ক উদ্‌ঘাটন হবার উপক্রম করেছিল। এই প্রেক্ষাপটে ধূর্জটি বেছে নিয়েছিলেন আন্তর্জাতিকতার বাণী।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ধূর্জটি স্বাধীনতার লগ্নে কেন বিশ্বজনীনতাকে প্রশ্রয় দিলেন। নিজেকে ছাড়িয়ে আমি যে সারা বিশ্বের হতে পারি কিংবা এই যে বোধটা, যে আমি সকলের জন্যে বেঁচে আছি, আজকের স্বাজাত্যবোধ বা এথ্‌নিসিটির পুরো বিপরীত যে ভাবনা, এটাকে আজকে সাদরে গ্রহণ করা আর উনিশশ তেত্রিশ সালে সেটা গ্রহণ করা, ধূর্জটি যেমন করেছিলেন, তার মধ্যে একটা তফাৎ আছে। ধূর্জটি যে স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে আন্তর্জাতিকতাকে অনেক উপরে স্থান দিয়েছিলেন সেটা কি তবে একরকমের উন্নাসিকতা, বা যাকে বলা যায় একপ্রকার এলিটিজ্‌ম্? সেটা হলেও হতে পারে। তবে এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, যিনি ধূর্জটির গুরুস্থানীয়, বিশ্বকে তার আপনার বলে মেনেছিলেন। দেশি ঐতিহ্যের শৃঙ্খল থেকে তাঁর আর্ট বিকাশ লাভ করেছিল কিন্তু সেখানেই তাঁকে থেমে থাকতে হয়নি। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যে কারণে সারা পৃথিবীর কুশলীরা একত্রিত হয়েছিল সেই কারণেই স্বাধীনতাকে একটা মুক্তি এবং বিশ্বায়নের প্রমাণ বলে মনে করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কাছে মানবিক ইমেজটার যে কদর ছিল সেটা ছিল ঘেরাটোপের অস্তিত্বের বাইরেকার চেতনা। পাখি তার বাসা ছাড়লে যেমন সে একমাত্র আকাশের নাগরিক বলেই পরিচিত হয় এবং প্রজাতিতে ভিন্ন হলেও সে যে উড়বার অধিকারেই অন্য পাখির সহচর হয় সেটাই বোধহয় বড় কথা। এই ইঙ্গিত বজায় রেখেই ধূর্জটিপ্রসাদ প্রকৃত অর্থে বিশ্বজনীনতার কথা বলেছেন। ভারতের যে ঐক্যতার ইতিহাস তাতে মিলেমিশে যাওয়াটা একটা সমীচীন ব্যাপার। এই ট্র্যাডিশনেই, পুরোটা না হলেও কিছুটা পথ তিনি অতিক্রম করেছিলেন। এই বিরাটের বোধটার থেকেই তার প্রগতি আর নতুন সমাজ গঠনের সব থিওরী সার্থক রূপ পেয়েছে।

এই বিশ্বজনীনতাকে যদি কোন পাঠক এলিটিজম্ নাম দেন তাহলে সেটাকে খণ্ডন করা মুশকিল হতে পারে। তবে এটাও না মেনে পারা যায় না যাঁরা ইতিহাসের প্ররোচনার ভিতরে থেকেও মানুষকে মনুষত্বে দীক্ষা দিয়ে গেছেন তারা অনেক ক্ষেত্রেই লৌকিক জীবনযাত্রায় যেটা সাধারণ দিক সেটার থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছেন। কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদের যে প্রবন্ধদ্বয় আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় সেগুলোর প্রত্যেকটাই মানুষের ভবিতব্যের সঙ্গে জড়িত। 'নব্য সমাজ দর্শনের ভূমিকা' কিংবা 'প্রগতি' এই দুটো প্রবন্ধই স্বাধীনতার আগে, জাতীয়তাবাদী ভাবনার ঘরে থেকেও কতকটা র‍্যাডিক্যাল চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে লিখেছিলেন। অতএব কালের নিরিখে তাঁর বক্তব্যের মূল্য কি দাঁড়ালো সেটা এখন বিচার্য হতে পারে আর সেটাই বোধহয় কাঙ্খিত ছিল কারণ সেই ভবিষ্যতের আজ বেশ কত দিন গত হয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ধূর্জটির তত্ত্বের কিছুটা ল্যাবরেটরী টেস্ট হয়ে গিয়েছে।

এবং ভবিষ্যতের প্রশ্ন যখন উঠল তখন মানতেই হয় যে সে অর্থে ধূর্জটির তত্ত্বের কোন সামাজিকপ্রয়োগ আমরা সরাসরি লক্ষ্য করিনি। এইখানেই সম্ভবতঃ ধূর্জটির মহান পূর্বসূরী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কথা এসে উপস্থিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যে ভারত আত্মার ঐক্যের কথা, সহনশীলতার কথা, অহিংসার কথা, কবির শ্রেষ্ঠত্বের ভাবনা সম্পর্কে লিখেছিলেন তার ঐতিহাসিক বাস্তবায়ন দেখা গেছে। আমরা জানি জাতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, ধরা যাক 'পরিচয়'-এর মতো গ্রন্থে, যেখানে হিন্দু আর মুসলমানের ধর্ম আর আচার অনুষ্ঠান নিয়ে তিনি মতামত প্রকাশ করেছেন, তার একটা বাস্তব মূল্যায়ন হয়েছে আমাদের ইতিহাসে। রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তার সঙ্গে দৈনন্দিন ইতিহাসের একটা সামঞ্জস্য ছিল। তাঁর বাক্য কালের পরীক্ষায় মূল্য না হারিয়ে বরং উত্তীর্ণ হয়েছে। অথচ ধূর্জটিপ্রসাদের রচনায় ভাবালুতার ভাগ বেশী। অন্ততঃ 'নব্য সমাজ দর্শনের ভূমিকা' বা 'প্রগতি' তে সেই বাস্তবমুখিতা নেই যার জন্যে তিনি চিরকাল ধরে অঙ্গীকার করে গেছেন।

'বক্তব্য' নামের অন্তর্গত 'প্রগতি' রচনাটা ঠিক প্রবন্ধ নয়। বরঞ্চ বলা যায় কিছু সূত্রের শৃঙ্খলা, আমাদের প্রবন্ধকার তার সারাটা চিন্তার সঙ্কল্প একত্রিত করে বোধহয় 'প্রগতি' লিখেছিলেন। অর্থাৎ এক অর্থে প্রগতির সূত্রগুলো ধূর্জটিপ্রসাদের চিন্তার নির্যাস বলা চলে। প্রগতির বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে রাখতে হয় ধূর্জটির জ্ঞানের ভিত্তির কথা বা ভিত—যাকে বলে ফাউণ্ডেশনের কথা। আজকের দিনে ফাউণ্ডেশনের ধারণাটা শিথিল হয়েছে। বিশেষ করে সাহেবদের মধ্যে, ব্রিটেন কিংবা আমেরিকা নির্বিশেষে, ফরাসীদের মধ্যে তো বটেই কোন জ্ঞানকেই এখন ভাষার নিরপেক্ষ মনে করা যাচ্ছে না বা রাজনীতির চাপান-উতোরের থেকে অসম্পৃক্ত বলে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। সে অর্থে ধূর্জটি কোন রাজনৈতিক পার্শ্বপ্রক্রিয়ার শিকার হচ্ছেন, নিজের কোন কোন বিশ্বাস বা অসঙ্গতিকে প্রশ্ন করার তিনি প্রয়োজন মনে করেননি সে ব্যাপারে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হয়েছে। ধূর্জটির এলিটিজ্‌ম আমার অপছন্দের, ওর বাস্তববাদীতার অনাবশ্যক হেঁকর তোলা, গান্ধীজির সবরমতি সম্বন্ধে কুটকটাক্ষ, তেমন প্রয়োজনীয় আলোচ্য বিষয় নয়। তবে এটাও সত্যি যে ধূর্জটির লেখার মধ্যে যে অন্তর্নিহিত পলিটিক্‌স্ সেটা একান্তই ধূর্জটির এবং কোন পারিশ্রমিকের বিনিময়েই তিনি তাঁর মতামত প্রকাশ করতে পিছপা হননি। ধূর্জটির মধ্যে যে রাবীন্দ্রিক লাইন সেটা উল্লেখনীয় কারণ এইখানেই হয়ত ধূর্জটি তার রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পাচ্ছেন, আন্তর্জাতিকতাবাদের মন্ত্রে, ব্যক্তির ছোট, কুলুপ আঁটা ব্যক্তিত্বকে ছাপিয়ে একটা সামাজিক চৈতন্যলাভের মধ্যে দিয়ে কোন দার্শনিক প্রত্যয়ের মধ্যে। আমাদের মনের মধ্যে একটা কাল্পনিক জগৎ থাকে। এটাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এই কাল্পনিক জগতে কোন দীর্ঘিতি রাত্রির শেষে যদি সত্যের সূর্যোদয় হয় তবে সে সূর্যেরই উপাসনা করা চলে। ধূর্জটির রচনার এটাই মহৎ গুণ যে ধূর্জটি তাত্ত্বিক প্রলোভন বা প্রভাবের মধ্যে এই নিজস্ব সূর্য অনুসরণ করছেন।

'প্রগতি'র প্রথম স্তবকে ধূর্জটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দের প্রচলন করছেন। প্রগতি কথাটার যে অর্থ তিনি আরোপ করছেন তার কিছুটা প্রগতি শব্দের ব্যুৎপত্তিতে নিহিত, কিছুটা তিনি নিজস্ব আঙ্গিকে প্রয়োগ করছেন। সমাজের প্রগতি বলতে ধূর্জটি কি বলছেন, প্রগতি

শব্দের সঠিক প্রয়োগার্থ কি দাঁড়ায় তা নির্ণীত করবার এই প্রচেষ্টা। প্রগতিকে, অতএব, ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ধূর্জটি বলছেন 'অগ্রসরতা'। কিন্তু কেবল এগিয়ে চলাটাই প্রগতির অর্থ নয়। প্রগতিকে ধূর্জটি দেখছেন বুদ্ধি দিয়ে বা অনুপ্রাণিত হয়ে অগ্রসর হওয়ার এক প্রতীকের মতো। সমাজ যখন কোন মহৎ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অগ্রসর হবার সংকল্প নেয় তখনই প্রগতি সম্ভব হয়। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ধারণা বলে মনে হয় কিন্তু ধূর্জটি যখন এটাকে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার বেদবাক্য বলে গ্রহণ করেন, যখন তিনি মনে করেন যে একটা গভীর প্রাণনা ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে উন্নতি করা সহজ কথা নয়। তখন তিনি সেই আত্মবিশ্বাসের সোপানে আমাদের ফিরিয়ে আনেন যা প্রকৃত অর্থেই ধূর্জটির।

অতএব ধূর্জটির কাছে 'প্রগতি বলতে আদর্শ কিংবা প্রেরণা অনুসারে অগ্রসর হওয়া' বুঝায়। 'আদর্শ', 'মানুষই সৃষ্টি করে'। মানুষকে এই সৃষ্টিকর্তা হিসেবে দেখাটা য়ুরোপীয় মানবতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি। মানবতাবাদ মানুষকে সমাজ আর সংসারের কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিত করেছে। ধূর্জটির এই মতাদর্শেই পক্ষপাত। এই পক্ষপাতের একটা কারণ থাকতে পারে ধূর্জটির শিক্ষাপ্রক্রিয়ার মধ্যে কারণ তিরিশের দশকে বহুলাংশে দর্শন সাহিত্য থেকে শুরু করে সমালোচনা সাহিত্য বা সাহিত্য সমালোচনা, সর্বত্র, এমনকি মানতে বাধ্য হচ্ছি যে পুঁজিবাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ধ্বনিতে, সর্বত্রই, মানবতাবাদের ফলশ্রুতি বা, ঠাট্টা করে বলতে হয় ফল্ আউট লক্ষ্যণীয়—এবং ধূর্জটিপ্রসাদ সম্যক এই মানবতাবাদের উৎপাদন বলে মনে হয়। এই মানবতাবাদ য়ুরোপের চিন্তায় এসেছিল গ্রীক্ সাহিত্য, গ্রীক দর্শন থেকে। আজকাল যাঁরা পল ক্রিস্টেলার বা কোয়েনটিন্ স্কিনার সাহেবের শব্দানুসন্ধান বিষয়ক প্রবন্ধগুলো পড়েছেন তাঁরা মানবতাবাদ কথাটার উৎপত্তি সেই 'হিউমানিতাস' অভিহিত যে শব্দ তার ব্যাখ্যা পড়ে থাকবেন। 'হিউমানিতাস', অর্থাৎ, মানুষ সম্পর্কিত, ধূর্জটির প্রগতি চিন্তা মানুষকে নিয়ে। তার কাছে দেখছি সব উন্নতির গোড়ায় রয়েছে মানুষের উন্নতি। মানবতাবাদের আদর্শের সমতুল্য উচ্চারণ 'প্রগতি'তে, 'মানুষই আদর্শ সৃষ্টি করে। মানুষই প্রেরণার আধার। মানুষই অগ্রসর হয়'।

তবে আজকে যা আমরা মানবতাবাদের মূলমন্ত্র বলে গ্রহণ করে থাকি, সেই মানুষের অবদান, মানুষের উত্তীর্ণ হবার প্রেরণা, তার বাইরেও কিছু কথা ছিল। সেটা অবশ্যই মনুষ্যত্বের উপরকার কথা, মানুষের আত্মার কথা, যে বুদ্ধি জীবজগতের অংশভাক তা মানুষেরও আছে অথচ মানুষ আরও উপরে উঠতে চাইছে। মানুষের মধ্যে রয়েছে—য়ুরোপ যাকে বলছে—রীজন্। অর্থাৎ, বোধি বা আত্মা। নেহাৎ বুদ্ধির উপরে তার স্থান। সোজা কথায় বলতে হয় যে মানুষ তার নিজের আকাঙ্খা, তার প্রবৃত্তি, তার বিভ্রান্তি তার গোটা অস্তিত্বকে তার বোধির অধীনে নিয়ে আসতে পারে। সে তার জৈবিক দিকটাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতে পারে। এইটেই প্রকৃত মনুষত্ব। এই মনুষত্ব অর্জন করাটাই মানুষের পক্ষে প্রগতি, 'বোধ হয়, আত্মা নিয়মকর্তা, আপনাতে আপনি অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ স্বাধীন। অর্থাৎ মানুষের পরে পরিবর্তনের পরিণতি মানুষের স্বাধীনতা'।

বুদ্ধি আর আত্মার এই দ্বিধাবিভক্তি ধূর্জটির কাছে খুব বড় কথা। আত্মার প্রতি আনুগত্য ধূর্জটির কাছে স্বভাবসিদ্ধ। এটাকেই তার সমগ্র রচনার শিরদাঁড়ার মতো দেখা চলে।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে, বুদ্ধির প্রাচীরটাকে ডিঙিয়ে একটা পার্থিব নিয়ম বহির্ভূত, আরও উন্নত, ধূর্জটি যাকে বলছেন 'অজ্যামিতিক', সেই প্রশান্তির জমিতে দখল কায়েম করতে হবে। এর অন্যথায় সমাজের পক্ষে অগ্রগতি সম্ভব নয়। আরও একটা ফরমুলেশন্, 'প্রগতি' প্রবন্ধের একদম শেষে যার উল্লেখ আমরা লক্ষ্য করি তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। এখানেও সেই বুদ্ধি আর আত্মার ডাইকোটমি বিদ্যমান তবে তা অন্য এক মাত্রা পেয়েছে। এখানে বুদ্ধি এবং আত্মা বৈদগ্ধ্য। অর্থাৎ, যদি সমাজের প্রকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় তাহলে ধূর্জটি বলছেন যেটা বেদান্ত বা উপনিষদের আর্য চৈতন্যের সমাজ সেটা বৈদগ্ধ্যের সমাজ। যেটা ইতিহাসের মঙ্গলকর সমাজ সেটা বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজ। 'বৈদগ্ধ্যে উপনিষদ, সভ্যতার টীকাভাষ্য। একটিতে মানুষ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, আর্টিস্ট, সম্পূর্ণ মানুষ, অন্যটিতে মানুষ কলের কুলি, যজ্ঞের পুরোহিত, স্কুল মাষ্টার এবং সাহিত্যক্ষেত্রের সমালোচক ও প্রবন্ধলেখক'।

এদিকে ধূর্জটিপ্রসাদ যেহেতু এই পার্স্পেকটিভ্ সরিয়ে রেখে কেবল বাস্তবের তত্ত্ব নিয়ে মগ্ন ছিলেন সেহেতু তার ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের গোটা সংজ্ঞাটাই পাল্টে যাচ্ছে। তিনি অবশ্যই বিচক্ষণ। ধূর্জটি একজন আধুনিক ব্যক্তি। তিনি প্রত্যেক যুগের সংস্কারকদের কাছে সমাদৃত হবেন। আমি যে অধ্যাত্ম বলয়ের কথা বলছিলাম তাতে আধুনিকতার লেশমাত্র নেই। কয়েক দশক আগেও আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ নামক এক ব্যক্তি লেখালেখি করে গেছিলেন বলে এইসব কথা এখনও দিব্যি চালিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। বিলেত আমেরিকার কোনো প্রফেসরের ডেস্কে এরকম একটা পেপার এগিয়ে দিলে তিনি হয় তা সযত্নে এড়িয়ে যাবেন নয়ত মুড়েমুচড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দেবেন। সেদিক দিয়ে দেখলে আজকের ঘোর আপাতনাস্তিকতার বাজারেও ধূর্জটিপ্রসাদের রচনা নিয়ে, মাতামাতি না হলেও, টীকা-টিপ্পনী করা যাচ্ছে। আচ্ছা তবে ধূর্জটির এই কড়া বাস্তববাদীতায় ফেরবার আগে তার সমাজের কেমন করে উন্নতি সম্ভব হয় যে বিষয় ধূর্জটি নিসংশয়। আমার মনে হয়েছে যে ধূর্জটির রচনায় একটা শাস্ত্রজ্ঞ ভাব রয়েছে, প্রচ্ছন্নে তার সমস্ত বুদ্ধির জ্যামিতির আড়ালে। এই উঁচুতলায় অবশ্য তিনি নিজেই বেশীক্ষণের জন্যে বহাল থাকতে চাননি বরং তিনি লোকালয়ে নেমেছিলেন কিছুটা আড্ডা, রঙ্গতামাশা, গান-বাজনা ইত্যাদি থেকে আনন্দরঞ্জন করতে আর সময়-অসময়ে মনুষ্যসমাজের সব রুদ্রপ্রয়াগ, সব অলকানন্দা, মন্দাকিনীর সৌন্দর্য বর্ণনা করতে। সমাজের যদি কিছু আসে যায় তাহলে এর জন্যই আসবে যাবে। অর্থাৎ, এই বর্ণনার জন্যে, নচেৎ আড্ডা মারতে যে বুদ্ধির কেরামতি দরকার পড়ে তাতেও যথেষ্ট।

৯

উনিশ শতকের ব্রাহ্মভাবনা ও জীবনানন্দের কাব্য

লক্ষ্মীর সরা। সে সরায় বাঙলার প্রাচীন পৌত্তলিক সংস্কৃতি, বাঙালির দেবীমূর্তি, তার জীবন নিরসনের উদ্ভিজ্জ বা ভেশজ পণ্য, তার অভয়ারণ্য, পশুপাখী, সাপ, পেঁচা, শার্দুল ইত্যাদি, তার ধনসঞ্চয়ের ঘট, মুদ্রা, ব্যসন ভূষণ সমেত যে চিত্রপট সৃষ্টি করেছিল তাকে একটা জাতির প্রায় সমস্ত কালচারের এক বিন্যস্ত গোলক বলা চলে। সারা বাঙালির ইতিহাসের একটা ইম্প্রেশন সৃষ্টি করে। বাঙলার লৌকিক চরাচর সেখানে ক্লাসিকাল আর্টের স্থিরতা লাভ করেছে। মধ্যবিত্তের বাড়িতে রোজকার মত সকালের বাজার এসেছে, রাস্তায় পরিচিত ফিরিওয়ালা হাঁক দিচ্ছেন, চৈত্রের রদ্দুরকে আড়াল করে সরকার মশায়ের ছেলে আপিস যাবে বলে দশটার লোকাল ট্রেন ধরবার উপক্রম করছেন, এই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছবিগুলো নিয়ে একালের বাঙালির সাদামাটা কালচার। বাঙালির সামাজিক জীবনে নিত্যনৈমিত্তিকের যে দ্রব্য পাট পাট করে রক্ষা করা রয়েছে বা উৎসব উপচারের যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, লোকাচার, ভোট, সালতামামি আর ফুটানি বা কেতা করে রঙ্গ তামাসা করবার ইচ্ছা যে কাল্পনিক সরার উপরে স্থান পেতে পারে তা বর্তমান কালের এক দর্পণ বলে বিবেচিত হতে পারে। এই যে সংস্কৃতির সরা আমরা কল্পনা করলাম তাতে বাঙালি জীবনের অনেকাংশ চিত্রিত করা যায়। তাকে এ যুগের যথাযথ চিত্রশিল্প বললে অত্যুক্তি হয় না।

জীবনানন্দ দাশের কাব্য সম্পর্কে দু-চারটে মন্তব্য করার প্রাক্কালে আমাকে বাংলার সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করতে হোল। এর প্রয়োজন ছিল বইকি এবং যদিও আমার রচনা মূলতঃ জীবনানন্দের উপরে বলতে আপত্তি নেই যে সংস্কৃতির পরিসর ছাড়া আমার পক্ষে কবিতার উৎসারের কথা আলোচনা করা সম্ভব নয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে কবিতা জীবনানন্দ লিখেছিলেন, বিশেষ করে তার অল্প বয়সের অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মঞ্চ থেকে যার ব্যঞ্জনাশক্তি পাঠককে এককালে মুগ্ধ করেছিলো, সে সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে আমার এই ভূমিকা লেখার প্রয়োজন হয়েছে।

লেখকরা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিজেদের কালচারের উপর নেকনজর নিক্ষেপ করেন,

এটা একটা 'মানসিক' প্রক্রিয়া। উল্লেখনীয় এক্ষেত্রে আমি 'মানসিক' শব্দটাকে 'মানস' প্রাতিপদিকের সহচর হিসেবে কল্পনা করছি। 'মানস' ও 'আত্মা' যেহেতু সমার্থক সেহেতু সৃষ্টির প্রক্রিয়া আত্মিক বলেও বিবেচিত হতে পারে। অন্ততঃ আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়েছে যে লেখক বা কবির ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা স্থাপন করার খেয়াল জাগে সে অভিজ্ঞতা হাঁটাচলা বা দোকানপাটের অভিজ্ঞতা নয়। লেখকের মনের মধ্যে তার রোজকার প্রতিচ্ছবি অথবা চিন্তাভাবনা প্রবেশ করে এবং শেষকালে তার মানসপটে একটা নির্দিষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরী করে। ধরা যাক লেখক কোনকালে, হয়ত তার ছেলেবেলায় ধীবর সমাজের সাহচর্যে কোনো এক ছেলে নৌকার মাস্তুলের ধারে অস্তগামী সূর্যের রঙ দেখে উল্লাস করেছিলেন। সেই দৃশ্যপটকেই তার লেখার মধ্যে বর্ণনা করার তাগিদ হয়ত সে তখন পায়নি। অথচ প্রাপ্ত বয়সে কোন প্রবন্ধে বা কাব্যে ছেলেবেলাকার টুকরো অভিজ্ঞতাকে সে একটা চিত্রকাব্যে ফুটিয়ে তুলবার প্রযত্ন করে থাকবে। সেই সূর্যাস্ত তার মানসপটে যেভাবে রেখাপাত করেছিল কালে কালে তা পাল্টেছে। তাতে হরেক রকম সিঞ্চিত অনুভূতি যুক্ত হয়েছে। অবশেষে লেখক যখন কোন উপযুক্ত বা পালিশ করা ভাষায় সেই সূর্যাস্তের বর্ণনা করেছেন তখন তার মানসিক মূল্য অন্ততঃপক্ষে অপরিসীম বলে মনে হতে পারে। কাব্যে আমাদের সরল বা জটিল অভিজ্ঞতা রূপান্তরিত হয় এবং এই রূপান্তরের ফলে বাস্তবের উপকরণ নতুন করে তৈরী হবার অবকাশ পায়। আর্টিস্ট তার মাধ্যম বা ভাষাকে নিয়ে এমন কেরামতি করে যাতে একটা সম্পূর্ণ চিত্র তার পক্ষে উপস্থিত করাটা সহজ হয়। এই যে ক্রিয়েটিভ্ প্রতিচ্ছবি তার মধ্যে কোন বাড়তি সরঞ্জামের অতিশয্য থাকে না, নীচু মনোবৃত্তির সম্ভাবনা সেখান থেকে বাতিল হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'তে এই রূপান্তরের যে দৃষ্টান্ত রয়েছে তা কেবল বিরল নয়, কনসামেট আর্ট বলতে যা মনে পড়ে তার মতো। তাঁর এই চিঠিপত্রের ছত্রে ছত্রে শিলাইদহে বজ্রার থেকে যে সুরম্য দৃশ্য তিনি দেখেছিলেন তার সাহিত্যিক রূপান্তর যেন চমক সৃষ্টি করে। কবি কল্পনাশক্তিকে এমন করে প্রয়োগ করেন যে দ্রব্য বা বস্তুর যতরকম স্থূলতা বা কালুষ্য থাকে তা বর্জন করা হয়। যেটা পরে থাকে তাতে কেবল একটা চিকণ পরিপার্শ্বের মধ্যে সেই বিষয়বস্তু কারুকৃতির মত উপস্থিত হয়।

যে লেখার সাহিত্যিক মূল্য থাকে তা রপ্ত করতে লেখককে তপস্যা করতে হয়। ভাষার উপর একটা কড়া দখল না থাকলে ভাল কিছু সৃষ্টি করা যায় না। এই দখল কায়েম করাটাও একটা মানসিক প্রক্রিয়া। কাউকে শায়েস্তা করতে হলে যেমন কোছা বেঁধে, লাঠি নিয়ে রণক্ষেত্রে নামতে হয় তেমন করে সাহিত্যিক ভাষার উপর দখলদারি করতে নামেন। পূর্বছত্রে যে সূর্যাস্তের দৃশ্য অঙ্কনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছিলাম তাতে এই দখলদারির রহস্যটা সহজাত বলে গণ্য করা হয়েছিল, আলাদা করে সেটা চিহ্নিত করার দরকার পড়েনি। এখন এই সত্যটাকে আরও বিশদ করে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। লেখকের মানসিক ক্ষমতা যত বাড়ে তত সে ভাষাকে নিয়ে কেরামতি করতে উদ্যত হয়। এমনই যে পূর্বে দেখা কোন দৃশ্য বা ঘটনা বা নিতান্ত কাল্পনিক খোরাকি যা তার মনের গহনে বাসা বেঁধে ছিল তা পাক খেয়ে খেয়ে নতুন বা যাকে বলে আর্টিষ্টিক, সেরকম হয়ে ওঠে। জীবনানন্দ

দাশ এই প্রক্রিয়াটাকে অত্যন্ত স্বচ্ছ বা অনুভূতিশীল দৃষ্টি নিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন। আমাদের মনে পড়ছে, কবিতার কথা'র প্রথম কয়েক লাইনে তিনি কবির সম্বন্ধে বলেছিলেন যে 'কবি সাহায্য প্রাপ্ত হয়'। অর্থাৎ, কেবল ভূয়োদর্শন নয়, কবির পক্ষে অন্তর্দর্শন সম্ভব এবং সেটা একটা অতীন্দ্রিয় পর্যায়ে পড়ে। নিষ্ঠা ও অভ্যাসের দ্বারা সেই দৃষ্টি অর্জন করা যায়। তথাপি বিক্ষিপ্ত অস্তিত্ববোধের অংশভাক হলেও সেই নির্জন বোধির জামানতেই ভাষার থেকে সে করজা আদায় করে। পুরোনোকে নতুন করে সৃষ্টি করা সম্ভব। কবি যেহেতু সচরাচর নতুনত্বের সংসর্গে থাকেন সেহেতু তার পক্ষে পুরোনোকে নতুন করে রূপান্তর করা সম্ভব। মানে কবির মন গর্ভধারণের অপেক্ষায় ঋতুবতী কন্যার মত প্রস্তুত হয়ে থাকে।

প্রাবন্ধিক ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছিলেন যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মন ও বুদ্ধি উভয়ই আত্মার দ্বারা আচ্ছন্ন ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং আত্মার পথ নাকি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউর মত প্রশস্ত ও সোজা। ধূর্জটিপ্রসাদের এই উক্তিতে আমাদের সায় আছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও মন্তব্য করতে ইচ্ছে করে যে যদিও সেই আত্মার সড়ক সহজ পথের মত আগাগোড়া এক লাইনে চলে আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে সেই সড়কেরও একটা নিরন্তর ইতিহাস থাকে এবং গণেশ এ্যাভিনিউতে মোড় বেঁকে তা ধর্মতলার দিকে চলে যেতে পারে। কবিতা সম্পর্কে এই আত্মিক উপলব্ধির কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হয়। আমরা গণেশ এ্যাভিনিউর বাঁকের মতো এমন সব বলয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি যার ভেতরে পার্থিব নিয়মপ্রসঙ্গের ব্যত্যয় ঘটে। আমাদের আত্মার সাহায্যে পরাবাস্তবিক কিংবা পারলৌকিক জগতে যে অনুপ্রবেশ সম্ভব এটা আজ অতিকথনের ফলে লব্ধের পর্যায়ে চলে গেলেও তার সত্যের অংশ লাঘব হয়নি। জীবনানন্দের কাব্য প্রসঙ্গে এই পরাবিদ্যাটুকু সমালোচকের পক্ষে লোভনীয় রহস্যময়তা নয় বরং তা এক আবশ্যিক প্রতিপাদ্য। প্রকৃতপক্ষে যাঁরা আত্মায় বিশ্বাস রাখেন তাঁরা আত্মাতে বর্ধমান উপলব্ধির মর্যাদা প্রত্যর্পণ করেন। জীবনানন্দ যখন বলেন যে কবির একটা অনির্বচনীয় উপলব্ধি বা একটা বিশেষ ঐতিহ্যবোধ সম্বন্ধে সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর তখন আত্মার প্রশস্তির কথায় আমাদের প্রথমে খেয়াল হয়। আমাদের আত্মিক উপলব্ধির মাধ্যমে, একেবারে চট্ করে না হলেও, কিছুটা টহলদারি সমেত, আমরা এই বিরাট সৃষ্টির ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হই।

জীবনানন্দের পাঠক লক্ষ্য করেন যে তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু সমাজ—দৈনন্দিন জীবন ততটা নয়, এমনকি সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি পর্যন্ত নয়, যতটা অলৌকিক চরাচর বা পরলোক, কবি যে অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতায় রূপান্তরিত বা সূক্ষ্মতর করে উপস্থিত করেন তা নিতান্তই পরাজগতের। আমাদের কল্পনাশক্তির সাহায্যে আমরা এই পরাজগতকে দেখতে পারি। নব্যপ্লেটোনীয় পন্ডিতেরা কল্পনাকে মনের রানী বলে আদর করেছিলেন। স্মৃতি এবং কল্পনা এই দুই মানসিক ইন্দ্রিয়কে তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছিলেন কারণ এই দুটো অতি ইন্দ্রিয়ের চেষ্টায় মানুষ তার অস্তিত্বের পূর্বেকার সব অজ্ঞাত, অশ্রুত, সত্যের সুলুকসন্ধান করতে পারে। আমি এক্ষেত্রে 'সুচেতনা' কবিতাটিকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করতে পারি। যে পথে

মানুষের পক্ষে উৎসসন্ধান করা সম্ভব এবং যে নৈসর্গিক জ্যোতির অন্তরে নির্বিশেষে প্রত্যেকের সমাগম করার কথা সেই জ্যোতি, কে বলবে যা বেদান্তের প্রবাদপ্রতিম সকল জ্যোতির জ্যোতি হিসেবে খ্যাত, সেই পরম জ্যোতি নয়। যে পথে ক্রমমুক্তি হবে তা জ্যোতির পথ। এই জ্যোতির্বলয়ই জীবনানন্দের কবিতার একমাত্র বিষয়বস্তু।

জীবনানন্দের কবিতায় বাঙালির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য চোখে পড়বার মত নয়। এ কথা বোধহয় বেলা, অবেলা, কালবেলা'র মতো কাব্যগ্রন্থে আরও প্রকট। কবি যে আলো বা অন্ধকার এবং শক্তি বা মানসিক সঞ্চয়ের যে পৃথিবীকে বর্ণনা করেন তা সম্ভবত লোকাতীত। বৈতরণীর পারে এই জগৎ সংসারের আইনকানুন ধোপে টেকে না। পাঠকের পক্ষে এই লোকাতীত জগতের খবর পাওয়া সম্ভব প্রথমতঃ পাতঞ্জল ভাষ্যে, যেখানে গহন অবীচি থেকে স্বর্গলোকের বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মান্ড বর্ণিত অথবা মহাভারতের ভীষ্মপর্বে যেখানে ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত অথচ নরক ও স্বর্গলোকের ডেস্‌ক্রিপসন্‌ দিয়ে চলেছেন। এই প্রকৃত বিরাট, অনন্ত ব্রহ্মান্ডের পরিসরে আমাদের লৌকিক জগৎ যেন মধ্যভূমি। পৃথিবীর থেকে যিনি উত্তরণ করবেন বলে মনস্থ করেছেন তিনি এই লোকাতীত জগতের দিকে চলেছেন। এই জগতের প্রকৃতি অবশ্য শামানদের পুরাণে, গ্রীক বা বিশেষ করে প্লেটোর তত্ত্বে এবং খ্রীষ্ট ধর্মের সাধক পৌল নির্দেশিত পারৌসিয়ার অবিচ্ছিন্ন আকাশে বর্ণনা করা হয়েছিল এবং জীবনানন্দ সে সম্বন্ধে পুরদস্তুর জানতেন। জীবনানন্দের কাব্যে আমি মূলতঃ এই অনন্ত পৃথিবীর চিত্র দেখেছি। তাঁর কবিতা প্রধানত সংস্কৃতিমুখী নয়। বরং এই লোকাতীত ভূমিতেই জীবনানন্দ চলে গিয়েছিলেন। 'হৃদয়কে সেখানে করে না অবহেলা বুদ্ধির বিচ্ছিন্ন শক্তি' (আলোপৃথিবী দ্রষ্টব্য)।

যাঁরা কিছু সৃষ্টি করেন তাদের উপরে অনেক রকম প্রভাব কাজ করে। যেমন প্রত্যেক মানুষের মতামত তৈরি হওয়ার পক্ষে অন্য লোকেদের যুক্তি-তর্ক বা কথোপকথন সাহায্য করে কবিদের ক্ষেত্রেও সে রকম হয়ে থাকে এবং আদ্যোপান্ত বিচার করলে কারো পক্ষে এমন বলা সম্ভব নয় যে কেউ মায়ের পেটের থেকে পড়েই কবি হতে পারেন। যদি আমরা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে এ বিষয় দৃষ্টান্ত বলে স্বীকার করি তাহলে দেখব যে তিনি সৃষ্টির ব্যাপারে বোধিসত্ত্ব হলেও অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্‌দেশির কথা শুনে প্রভাবিত হয়ে পড়তেন। বিলেতে বেরোনোর সময় যে সব শিক্ষার পন্থা তাঁর পছন্দ হোত বা জাপানে কিংবা চীনে গিয়ে আর্টের ব্যাপারে কিছু ভাল লাগলে শান্তিনিকেতনে তিনি সেই ব্যবস্থার পত্তন করার উপক্রম করতেন। এই সখ্য থাকাটা বলা চলে একটা ন্যাচারাল ব্যাপার। সাহিত্যিক সহৃদয় বটে এবং যা প্রকৃত অর্থে ভাল তাকে নিজের করে পেতে চান। কবি বা সাহিত্যিক যখন তাঁর কাব্য বা রচনা সৃষ্টি করেন তখন এই প্রভাবের বিচ্ছিন্ন উপকরণ তাঁর লেখার মধ্যে স্থান করে নিতে পারে। জীবনানন্দের কবিতায় যে বিমূর্ত কল্পনা দেখি তার সূত্রপাত হয়েছিল অধুনা অপরিলক্ষিত এক গ্রন্থে যা বাঙলায় এক নতুন চিন্তাধারার সৃষ্টি করে। রামমোহন রায় বেদান্ত অনুবাদ করেছিলেন আঠারো শতকের গোড়ায়। এই অনুবাদে নিরাকার ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছিল। পন্ডিতবর্গ গবেষণা করে দেখলে হয়ত বলতে পারবেন যে রামমোহনের বেদান্ত ভাবনা নিরাকার ঈশ্বরের কল্পনাকে জনগণের সামনে উন্মোচন করার এক একনিষ্ঠ

প্রচেষ্টা। বিশেষ করে যখন সাকার বা পৌত্তলিক সংস্কৃতির আচার-অনুষ্ঠান সমাজ চেতনাকে ক্লিষ্ট করে রেখেছিল। রামমোহন যেভাবে বেদান্তকে ব্যাখ্যা করেছিলেন তাতে যুক্তির মাত্রা বেশী ছিল। এ পর্যন্ত মনে হতে পারে যে খ্রীষ্ট ধর্মের কিছু যুক্তিবাদী মতামতের সঙ্গে তার ঐক্যমত ছিল। সে প্রসঙ্গ নিয়ে পুঙ্খনাপুঙ্খ বিচার করার দর্পণ এই প্রবন্ধের পরিধিতে পড়ে না তবু আপাততঃ আমরা বেদান্ত ব্যাখ্যা রামমোহনের সেই নিরাকার চিন্তার সকালে বিচরণ করতে পারি যাতে নিরাকৃতি ঈশ্বরবোধ, বা অন্ততঃ পারলৌকিক চিন্তার ইঙ্গিত আমাদের চোখে পড়ে।

ব্রাহ্মধর্মের মূলমন্ত্র ছিল নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনায়। রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ তাঁদের সাহিত্যে, কবিতায় এই নিরাকার মান্ত্রবর্নিককে নতুন বা তথাকথিত এক আধুনিক বর্ণে চিত্রিত করেছিলেন, বাংলা সাহিত্যে যার জুড়ি মেলাবার নয়। যেখানে ব্রাহ্মণ্য বা পৌরাণিক সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে নিত্যনৈমিত্যিক আচার অনুষ্ঠানে সঞ্চিত বাঙালির অস্তিত্বকে নিয়ে ছিলো সাহিত্যের কারবার সেখানে ব্রাহ্ম যুক্তিবাদ নিয়ে এল নিরাকার অব্যয় চিন্তা, আলো ও অন্ধকার, প্রস্রবণ, নদী, বৃক্ষ, হিজল, তমাল বা নিদেনপক্ষে অসম এবং অনলংকৃত হৃদয়ের অর্ঘ। কবিকঙ্কনের মঙ্গলকাব্যে যে সামাজিক পটভূমি নির্মাণ করা হয়েছিল তার অন্তর্নিহীত দর্শন বাঙালির মন থেকে লোপ পেল। তাছাড়া খ্রীষ্ট ধর্মমত ও সাহিত্য সেই ঊনিশ শতক থেকে প্রচারিত হয়েছিল। সেই শিক্ষাতেই আমাদের মানসিক চিন্তাপ্রক্রিয়া আদ্যপান্ত বদ্‌লে যেতে লাগল। কবিকঙ্কনের মঙ্গলকাব্যে বা মনসামঙ্গলে মানুষের সঙ্গে অতিলৌকিক বিধানের যে সংঘাত বর্ণনা করা হয়েছিল, মানুষের চিত্তবৃত্তিকে যে নাটকীয় জীবনবোধে খসড়ায় খসড়ায় রচনা করা হয়েছিল তার অস্তিত্বকে নির্মূল করে এ জাতির চৈতন্যে জাঁকিয়ে বসল নিরাকারবাদীতা। যদি আমরা কালকেতুর উপাখ্যানে মহামায়া চণ্ডীর বরাভয়ের কথা কল্পনা করি, কালকেতুর জীবনবৃত্তান্তে তার অনাড়ম্বরতা অথচ সততার বর্ণনা দেখি, যেখানে দেবীর অভয়ে সে অরণ্যের মধ্যে একটা গোটা নগর পত্তন করেছে বা যেখানে খুল্লনা দেবীকে নিজের আস্তাকুঁড়ে আপ্যায়ন করছেন ইত্যাদি, সেখানে আমাদের গত দুই শতকের পরিসরে এক অন্য সাহিত্যের উন্মেষ দেখেছি।

অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হয় যে সমাজের চাকা থেমে থাকে না এবং সাহিত্য সেই অনুসারে পাল্টায়। রামমোহন যখন একজন সংস্কারক হিসেবে কাজ করছেন তখন এটা প্রত্যাশিত ছিল যে মানুষের মনে সেই কাজ একটা ঠেলা দেবে। কিন্তু যেটা প্রত্যাশিত ছিল সেটা হল রামমোহনের পরে শিক্ষিত ব্রাহ্ম গোষ্ঠীর মানসিকতায় লৌকিক কালচারের থেকে একটা বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। এ কথা অন্ততঃপক্ষে মুজ্‌তবা আলী তার সুদৃঢ় লেখনীতে অকপট কণ্ঠস্বরে ব্যক্ত করে গেছেন। মুজ্‌তবা বলেছেন, মনে পড়ে যে, ব্রাহ্মরা যেন ক্রমে ক্রমেই জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। জনগণকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করে এক বিরাট গণ আন্দোলন আরম্ভ করার প্রচেষ্টা যেন তাঁদের ভিতর ছিল না। মুজ্‌তবা বিশেষতঃ দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন একটা মর্মান্তিক বিচ্ছেদের দিকে যেখানে লোকাচার, সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খার কথা, যেমন যাত্রা কিংবা বাউলের গানে প্রচলিত ছিল, অথবা পাঁচালি কিংবা কাঠখোদাইয়ের আর্ট ফর্মে বিধৃত ছিল, সেই সব আদি অকৃত্রিম উচ্চারণকে সপাট

বিদেয় করা হয়েছিল। অতঃপর আজকের সমাজে থিয়েটার কিংবা উপন্যাসে, গল্পে, সমালোচনায়, সর্বত্র ব্রাহ্ম ভাবাপন্নতা অথবা মেকী পাশ্চাত্যমনস্কতার সিংহও ব্রাহ্ম মত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যখন কলকাতার বাবুকুল, কলকাতার বেশ্যা, সঙ, গাজনের নাচ ইত্যাদি বিষয়বস্তু নিয়ে রঙ্গ করেছিলেন তখন এমন কেউ ছিলেন না যে সাহিত্যকীর্তিকে নিদর্শনের মতো গ্রহণ করতে পারেন। যে সামাজিকতা বাঙালি সংস্কৃতির অতলে চলে গেছে সেই মহান, নিষ্কলুষ ইতিহাসের দিকটার শেষ ও একমাত্র দর্পণ হুতোম প্যাঁচার নক্সা।

নৈরাকৃতিক চেতনার উত্তরাধিকার জীবনানন্দের কবিতায়। জীবনানন্দ দাশ নিজে একবার স্বীকার করেছিলেন যে আধুনিক, অর্থাৎ তাঁর সমকালের, কবিতা একটা দুঃখ বা অবসাদের মোহে আচ্ছন্ন ছিল। এই সব সুখ দুঃখের ভাবনা বাঙলার প্রাচীন কাব্যে কখনই স্থান পেত না। এমনকি রবীন্দ্রনাথেও এই অদ্ভুত দুঃখভাব বা শোকের স্থান নেই। তাঁর বর্তমানে জীবনানন্দ যে শোকাবহ লক্ষ করেছিলেন ইংরেজি কবিতায় বা ফরাসীদের মধ্যে সে সব সামাজিক উপকরণের মতো জায়গা করে নিয়েছিল। য়ুরোপের লোকেরা যুদ্ধের ভয়ঙ্কর মুখ স্বচক্ষে দেখেছিল। অনটন, অর্থকষ্ট, রিফিউজি হওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁদের জীবনে একটা অমোঘ নৈরাশ্য নিয়ে এসেছিল। এদিকে রাশিয়ার ক্ষেতের চাষী কিংবা কলকারখানার মজুরেরা একটা সামাজিক ব্যবস্থার শিকড়গুলো উৎপাটন করে নতুন ধরনের একটা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এই ইতিহাসের সঙ্গে বাঙালির সামাজিক দিনযাপনের পার্থক্য ছিল। সেই পার্থক্য নেহাৎ কম নয়। এদেশেও দাঙ্গা আর দারিদ্র্যের থেকে তখন আমাদের শাপমোচন হয়নি অথচ সেই সামাজিক প্রলয়ের ভাবনা আমাদের কবির কল্পনায় তেমন করে স্থান পায়নি। কেমন করে সে ভাবনা স্থান পেতে পারত সেটা বোধহয় একমাত্র কবিই জানতেন কিন্তু স্থান পাওয়ার দরকারটুকু ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ একটা যোগাযোগকারি বিদ্যা আছে—বা থাকতে পারে—যার ভিতরে পাঠ্যকে অতিক্রম করে অর্থের সঙ্গে অর্থের যে সংযোগ তার হদিশ করা যায়। এটাকে চিন্তার ইতিহাস বলা চলে, কারণ সেই ইতিহাসে পৃথক অবলম্বন করেও ভাবুক চিন্তকেরা তাঁদের যে তত্ত্ব সংস্থাপিত করে গেছেন তার মধ্যে কোন ঐক্যসূত্রের সন্ধান করা হয়, এমন যে এই যোগাযোগের অন্বেষণে বিশ্লিষ্ট শব্দের মধ্যেও অর্থের নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কথা এখানে স্বীকার করার প্রয়োজন হচ্ছে মূলতঃ জীবনানন্দের কবিতার চিত্রকল্প বিশ্লেষণ করবার জন্যে। এই চিত্রকল্পেই জীবনানন্দের কাব্যের অর্থপ্রতীতি। অন্যথায় তার অনুধাবন সম্ভব কেবলমাত্র দার্শনিক ইঙ্গিতের সাহায্যে আর মূলত পাতঞ্জল বা গ্রীক পরাজগতের বর্তমান উল্লেখে তা করা হোল।

পাঠককে এ বিষয় স্পষ্ট ধারণা দেবার প্রচেষ্টা করা উচিত। ভিন্ন মতাবলম্বী দার্শনিকদের লেখাতে স্বভাবতঃ যেমন মতানৈক্য থাকে তেমন প্রায়শঃই মতৈক্য থাকে। যে সমালোচক সমন্বয়সাধক ও প্রথানুগ তার পক্ষে মতৈক্যে হাজির করাটা একটা শখের ব্যাপার। শাস্ত্র সম্পর্কে তার নিজের অন্বয়কে সে এই আগাম পাঠ্যের মধ্যে সম্পাদন করে তৃপ্ত হয়। এই প্রথার একটা সরল উপমা নিশ্চয়ই নদীস্রোত। যেমন ধরিত্রীর উপরে শাখা-প্রশাখা বিস্তার

করে এক নদীর জলস্রোত আর এক জলস্রোতে একত্রিত হচ্ছে তেমন এক চিন্তার স্রোত অন্য স্রোতে এসে মিলছে, এই পদ্ধতির নিরিখে জীবনানন্দের কবিতায় শাস্ত্রোল্লিখিত না হলেও প্রাচীনানুগ কিছু সমতার দিকনির্ণয় সম্ভব। কবিতা যেহেতু মানুষকে পরলোকের সন্ধান দেবার বস্তু নয়, যেহেতু তা নিতান্তই রসের সামগ্রী, ভিয়েন ডেকে নির্মাণ না করলে তার রসনা আস্বাদ পাওয়া যায় না, সেহেতু কবিতার বিচারকে ধর্মালোচনার অনুষঙ্গ করে দেখাটা অযৌক্তিক বটে। বিশেষ করে জীবনানন্দের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য। যদিও তার তথাকথিত আধুনিকতা নিয়ে ডামাডোল বাজানো হয়েছে, তাকে হতাশা বা বিষাদের কবি বলা হয়েছে সে কারণেও নয় জীবনানন্দ তার 'কবিতার কথা' ছাড়াও—বিশেষ করে যে প্রবন্ধটার কথা আমার মনে পড়ছে—রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখা রচনায় আধুনিক হওয়া সম্পর্কে যে মন্তব্য করছেন তাতে ট্র্যাডিশনকে বানচাল করে নতুন কিছু তিনি বলছেন না। বরঞ্চ তিনি নিজেকে কবি হিসেবে চিনতে পারলেও সেই রবীন্দ্রমনীষার অনুগামী বলে নিজেকে মনে করছেন। অতএব আমাদের বিশদ ব্যাখ্যায় যেতে হবে না। কেবলমাত্র এই চিন্তার একটা ইঙ্গিত টেনে আলোচনা করব। সে ইঙ্গিত হয়তো রসগ্রাহীতার এক্তিয়ারে পড়ে না, কাব্যের যে নিজস্ব ধর্ম বা যাকে বলা চলে ডেফিনিশন, তার সৌজন্য না করেও, নেহাত পর্বতের উতরাই যেমন মনকে আকর্ষণ করে, সেই কল্পনার টানে জীবনানন্দ দাশের কবিতার এই বিচিত্র চিত্রময়তার কথা আলোচনা করা চলে।

কবির খুব পরিচিত কবিতাগুলো পরখ করে দেখলে এতক্ষণ যা বললাম তার টের পাওয়া যায়। জীবনানন্দের মনের মধ্যে ছোটর স্থান ছিল না। তার কল্পনায় খালি বৃহৎ ধরা দিয়েছে। তার মনকে কোন খড়ির গণ্ডির ভিতরে আটকে থাকতে হয়নি, কোন মতবাদ তাকে ক্লিষ্ট করে রাখেনি, বাস্তবকেও তিনি উপেক্ষার পরিসরে ঠেলে রেখেছিলেন। পক্ষান্তরে তার ছিল একটা য়ুনিভার্সাল সেন্স্, একটা বোধ, একটা সীমান্ত পার করা তিমিরের দৃষ্টান্ত, আকাশের দ্বারা সম্পৃক্ত, যেখানে কোন অন্য সূর্যের থেকে তরঙ্গ প্রবাহ শিশির বৃষ্টির মত এসে পড়ে। এই অনন্তের বোধকে যদি আমরা নেহাৎ কল্পনার আতিশয্য বা ভাবালুতা, অথবা নিতান্ত কবিতার রহস্যের খোরাকি বলে মনে করি তবে চুকে যায়। অবশ্য যদি এই গোটা বিষয়টাকে একটা শাস্ত্রীয় অভিধায় চিহ্নিত করার চেষ্টা করি, সনাতন বা বৌদ্ধ পরাবিদ্যার প্রেক্ষিতে অথবা যৌগিক বা বৈদান্তিক তত্ত্বের দিক থেকে, তাহলে এই কাব্যের অর্থ দাঁড়ায় অন্যপ্রকার।

পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে যে পাতঞ্জল-ভাষ্যে মরণোত্তর এক জগতের বর্ণনা রয়েছে। ভারতীয় শাস্ত্রের মাহাত্ম্য এইখানেই যে তাতে পরাবিদ্যার চর্চা আরও উন্নত ও ব্যাপক। যেখানে সেমিটিক ধর্মগুলোতে পরাবিদ্যার থেকেও উপরে স্থান পেয়েছে মানুষের সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক সেখানে কেবল পাতঞ্জলে নয়, বৌদ্ধ সূত্রেও দেবযান বা চন্দ্রযানগতি, বা জন্মান্তরবাদের নানা তথ্যের সমৃদ্ধি। আমাদের কেবল আশ্চর্য লাগে যে পরিবর্তনের চিত্র প্রকট হলেও মানবের ইতিহাসে ধর্ম ও আনন্তিক চিন্তাই সবার প্রথমে তার স্থান করে নেয়। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দের ক্ষেত্রে যেভাবে এই অনন্তের কথা বা সৃষ্টির পরিনামচক্রে মানবের লোকোত্তর যাত্রার চেতনা বিধৃত হয়েছে তাতে মনে হয় যে এই

এক ধরনের কবি আছেন যাঁরা মানুষের অন্য রাজনীতি নিয়ে বাক্য ব্যয় করেন না। তাঁরা পরিভাষায় বোধহয় অ্যাপলিটিকল আখ্যায়িত হতে পারেন। সেই আখ্যা দানের পিছনে পলিটিক্সের মাহাত্ম্য খুন্ন করার লেশমাত্র চেষ্টা নাও থাকতে পারে। সোজা কথায় গড়পড়তা যে সমাজ সংস্কারের চল্‌তি থিওরি সে সবের প্রতি জীবনানন্দের নিরুৎসাহ ছিলেন তা নয় তিনি কবিতার মধ্যে এমন কোন সত্যির আভাস পেয়েছিলেন যা জটিলতা এবং সামাজিক স্তরে মানুষের যে বিভ্রান্তি আর অক্ষমতা তার থেকে উত্তীর্ণ হয়ে কোন সরলতার দিকে প্রমাণ করে। অতএব প্রকৃতপক্ষে এটা কবিতার একমুখিনতার কথা।

'পৃথিবীলোক' নামের যে কবিতাটা জীবনানন্দ লিখেছিলেন তার মধ্যে আমি জীবনানন্দের পার্থিব চেতনা লিপিবদ্ধ হতে দেখেছি। অবশ্য কেবল 'পৃথিবীলোক' নয়, লৌকিক এই জগৎ সম্পর্কে তার আরও অনেক কবিতা পাঠককে বিচলিত করে এবং সম্ভবতঃ একটা চাপা নৈরাজ্যের বোধ, অরাজক কোন মনস্তত্ত্বের নাট্যমঞ্চ হিসেবে পৃথিবীর যে কল্পনা, যা জীবনানন্দকে বিচলিত করে, যান্ত্রিক সভ্যতা যেখানে ক্রমাগত পেষণ করে চলেছে, যেখানে মানুষ পশুর মতন ক্ষুধার্ত বা লেলিহান দৃষ্টিতে একটা খনিত কূপের থেকে উদ্ধারের জন্যে চিৎকার করছে, যেখান থেকে ত্যাগ ছাড়া, সুচেতন করুণা বা অপরের মঙ্গলকামনা ছাড়া, বুদ্ধের ভাব ছাড়া মানুষের পক্ষে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর, তা তার প্রত্যেক কবিতার নিসর্গের চিত্রে, নিসর্গের সংকেতে অপরিহার্য ভাবে বিদ্যমান। এই পরাজগতের কবিতা 'পৃথিবীলোক'। 'লোক' শব্দটির তাৎপর্য অন্ততঃ শাস্ত্রের পরিসরে নেহাৎ কম নয়। পতঞ্জলি তার যোগভাষ্যে বিশেষ করে সপ্তলোকের বর্ণনা করেছেন। 'লোক' শঙ্করাচার্যের বেদান্ত ব্যাখ্যাতেও স্থান পেয়েছে। চল্‌তি কথায় যাকে আপামর জনতা স্বর্গ আর নরক বলে মনে করেন, যা হয়তো প্রকৃতপক্ষে আমাদের অস্তিত্বের কোন অন্য মাত্রা বা পরিস্থিতি সেই দিকেই পতঞ্জলি বা শঙ্করের ইঙ্গিত। বা হয়তো আমাদের অস্তিত্বের এক উন্নত আধ্যাত্মিক স্থান বা বলয় রয়েছে যা আমাদের জাগ্রত চেতনার কাছে ধূসর প্রতীত হলেও কোন একদিন আরও স্বচ্ছ আলোতে আমাদের চোখের সামনে ধরা দেবে। এই পরাজগতের সঙ্গে বাস্তব জগতের যে বিপ্রতীপতা, সেটাই 'পৃথিবীলোক' কবিতার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু বলে মনে হয়।

'পৃথিবীলোক' দুটো স্তবকের কবিতা অথচ এই দুটো স্তবকের মধ্যেই চিন্তার অগ্রগতি এবং বৈপরীত্যের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। প্রথম স্তবকে কবি এক ধ্বংসাত্মক পৃথিবীর বর্ণনা করছেন, 'দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে'। এই অরাজক পরিস্থিতি হয় মানুষেরই সৃষ্টি কিংবা তা পরিবর্তনের অমোঘ নিয়মে ঘটেছে। এটাকে বলা চলে শূন্যের দিকে প্রত্যাবর্তন। এক প্রকার কায়াহীনতার বোধ হচ্ছে। বা সহজ করে বলতে গেলে ক্ষতি, মৃত্যু, ভয় প্রত্যক্ষিত হচ্ছে। এই বিনাশাত্মক অন্ধকার পৃথিবীলোককে ছেয়ে রেখেছে। শাস্ত্র বলছে যে, লৌকিক স্তরে দেবতার আভাস রয়েছে—যেমন সূর্য লৌকিক স্তরে প্রাণীকে দৃষ্টির উপকরণ প্রদান করেছেন। এই দৃষ্টির দৃশ্যমানতাকে উপলব্ধি করাটাই সংসারের সঞ্চালক শক্তির প্রতি আমাদের চিন্তাকে প্রচলিত করে। যেখানে সাধারণ, বিখণ্ডিত, ছবিতে আমরা এই জগতের নানা উপাদানকে স্বচক্ষে দেখি কোন বিশ্লিষ্ট আধারের

মত বা দ্রব্যের সমষ্টির মত সেখানে কবি চলেছেন অন্য পথে। সোচ্চার আলোচনা বা কেরামতি ছেড়ে তিনি এই আধিদৈবিক দৃষ্টি ফিরে পেয়েছেন, অন্ধত্বেও যেমন ধৃতরাষ্ট্র এককালে পাপবিদ্ধ চিত্তে আরেক অন্ধকারের সংসার দেখতে পেয়েছিলেন সেরকম নয়, তবে দৃষ্টির এক ঐক্যতায়, সমতায়, সর্বোচ্চতায় অন্য কোন ভাবে, ধ্যানে, পৃথিবীকে কেবল বিনাশের দিকে বিবর্তিত হতে দেখছেন জীবনানন্দ। গ্রীক সাধক হেরাক্লিটাস বোধ হয় এই পরিবর্তনশীলতাকে একমাত্র সত্য বলে জেনেছিলেন। অবশ্য জীবনানন্দের কাছে তা কেবলি বিনাশ এবং তজ্জনিত বিষাদের দর্শনে উন্মোচিত হয়েছে।

এই বিনাশের বিপরীতে রয়েছে পরিত্রাণ বা মুক্তির আশা এবং বিশেষ করে 'পৃথিবীলোক' কবিতায়, অন্যান্য ইন্টারেষ্ট ছাড়াও, সেই আভাস পাওয়া যায় কোন মরুদ্যান বা স্নিগ্ধ দ্বীপ বা দেশের ভাবনায়। এই শান্তি, স্নিগ্ধতা, প্রেম যে চিত্রে প্রকাশ পাচ্ছে তাকে জীবনানন্দ বলছেন 'সুচেতনা'। কবিতাটি এই পরাবাস্তবিক বা পারলৌকিক চিন্তায় আরও উৎকৃষ্ট, আরও প্রকট, বিশেষ করে যেখানে 'স্বর্ণের বিস্ময়' কথাটা জীবনানন্দ পারছেন, খুব সম্ভবতঃ দেহবিচ্যুত আত্মার উপমা হিসেবে কিন্তু সে কথায় পরে ফিরছি। 'সুচেতনা' স্বততঃই থাকে বলে আধুনিক। বর্তমান পৃথিবীতে যেখানে গণতান্ত্রিক বা ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গড়ে উঠেছে সেখানে এই অব্যয় উপচাররহিত কাহিনী অবলম্বন করেই যে কবি তাঁর কবিতা রচনা লিখবেন, এতে আর আশ্চর্য কি? যেখানে তুলনা করলে বলতে পারি যে যখন কাশিরাম দাশ তার মহাভারত তর্জমা করেছিলেন, বিশেষ করে যেখানে চক্ষু মুদবার আগে ভীষ্ম যখন পরলোকের মঞ্চে সারি সারি প্রেতাত্মা, দেব ও যমদূত তথা স্বয়ং নারায়ণ অধিষ্ঠিত সেই বৈকুণ্ঠধামের বর্ণনা দিচ্ছেন তখন পরলোকের যে সব কান্ডকারখানা আমরা ঘটতে দেখেছিলাম তার থেকে 'সুচেতনা'র পারলৌকিক চিত্রে রদবদল ঘটে গেছে। এটাই সমীচীন ছিল। কারণ পারলৌকিক সংসারকে চিত্রিত করতে গেলেও যেখানে কাশিরামের যে কালচারের চেতনা, তার সনাতন কালচারের যেটুকু উপকরণ সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন, সেখানে জীবনানন্দের কাছে অন্য এক আধুনিক কালচার বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সুচেতনার কল্পনায় আছে কলকাতা শহরের কথা, দ্বীপ বা সাগরের ধারণা, বন্দর আর মানুষের আনাগোনার খবর। এটা একটা ব্যবসা বা পণ্যজাত সমাজের চিত্র। এতে শহরের নিষ্করুণ অলকোদ্যত ব্যক্তিত্ব। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আবার সুচেতনা নামের কোন সুদুর দ্বীপের জন্যে স্বপ্ন দেখতে কবি ছাড়ছেন না।

সুচেতনা প্রকৃতই এই দ্বীপ। তার অবস্থান, জীবনানন্দের ভাস্বর 'বিকেলের নক্ষত্রের কাছে'। আক্ষরিক অর্থে এখানে শব্দকে নেওয়া চলে না। আমাদের মধ্যে আজ হয়তো অনেকেই অবগত আছেন যে সজনীকান্ত দাশ জীবনানন্দের কবিতা পাঠ করেছিলেন। আক্ষরিক অর্থে, উপমার বোধ বা গভীরতর কোন অর্থকে উপেক্ষা করে। সজনীকান্ত যে পাঠ করার কায়দা করেছিলেন তা বস্তুত কুট ক্যাচালের। ঠাট্টা করার সুবাদে তিনি কবির অর্থ পাশ করানোর মন্ত্রকগুপ্তিকে কেবল পুরোপুরি বিসর্জন দিয়েছিলেন তা নয় বরং তার জায়গায় একটা ঘোর বিকৃত, হাস্যকর অসামঞ্জস্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সজনীকান্ত দাশের এই পাঠের পদ্ধতিকে আমল দেওয়ার দরকার নেই। কবি, তিনি যতই

ছোট মাপের হোন না কেন, এবং যতই আমাদের বিরাগভাজন হোন অন্ততঃ তার কবিতার মর্মার্থের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলাবাহুল্য যে সেই অধিকারটুকু তার থাকে। 'সুচেতনা', জীবনানন্দের অন্যান্য কবিতার মতো, উপমার স্তরে পৌঁছে পড়তে হয়। অর্থাৎ বিকেলে নক্ষত্রের কাছে যে দ্বীপ কবি পর্যবেক্ষণ করছেন সেটা নিশ্চয়ই লোকালয় নয়, কোন পর্যটকের সুদূর পরাহৃত বলা চলে, এক লোকাতীত স্থান এবং পৃথিবীলোকে যা তিনি পাননি, এক নিতান্তই শান্তির, সমাধির, স্নিগ্ধ, আত্মিকও খুব সম্ভবত, এক দ্বীপ। অতএব এই স্থানের এক বিশেষ নির্জনতা আছে। যেখানে আবার সেই পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা একপ্রকার সত্য সেখানে অন্য দিকে এই দারুচিনি বনানী ঘেরা সুচেতনা নামের দ্বীপটি আর একপ্রকার সত্য যা হয়তো কোন অংশে অকিঞ্চিৎকর নয়।

আমরা যখন কল্পনা করি তখন তাতে অলীক স্বপ্নের মতো অনেক কিছুই থাকতে পারে। বাস্তবের পাল্লায় বিচার করলে তার ওজন নেই অথচ যদি সেই কল্পনা কোন বিশেষ প্রজ্ঞার দ্বারা পরিচালিত হয়, যখন অনেক ধ্যানের ফসল দিয়ে কেউ কল্পনার ভাঁড়ার যোগাড় করে তখন তার মূল্য হয় অপরিসীম। এই গভীর কল্পনা জীবনানন্দের কাছে কবিতার উপকরণ। এই যে প্রজ্ঞা বা ধ্যানের অংশ দিয়ে কল্পনাকে কবিতার চিত্রকল্পে রূপরেখা দিয়ে ধরা হয়েছে তার মধ্যে একটা ব্যক্তিগত সত্যদৃষ্টি কাজ করছে বলে জীবনানন্দের কাব্য মূল্যবান। এই দৃষ্টি আধুনিক। এই দৃষ্টি শ্বাশত, তবে বাঙলির যে পুরাতন ঐতিহ্য, বা কতকটা সনাতন ধর্ম বা শাক্ত বা বৈষ্ণব বিগ্রহের অনুকূল আর্টে যা সমৃদ্ধ হয়েছে সেই ধরনের টিপিকাল লোকাতীততা জীবনানন্দের কবিতার উপকরণ নয়। এই কথাই বিশেষতঃ আমাদের স্মরণে ছিল যখন আমরা বলেছিলাম যে কাশিরাম দাসের লোকোত্তর ভাবনা জীবনানন্দের নয়, এবং একমাত্র এই কারণেই এই প্রবন্ধের মধ্যে সনাতন ও ব্রাহ্ম পদ্যের দুটো ট্র্যাডিশন আমি চিহ্নিত করেছি এবং ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেছি।

যে সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট একান্ত এই বিংশ শতাব্দীর সেই প্রেক্ষাপট 'সুচেতনা' কবিতায় একটা চমৎকার রূপ পাচ্ছে। কেবলমাত্র ভাষার নৈপুণ্যেই জীবনানন্দের কবিতায় বিংশ শতাব্দীর এই সংস্কৃতির প্রতি একটা নস্টালজিয়া ব্যক্ত হয়েছে, বিশেষ করে সেই লাইনদ্বয়ে যেখানে সেখানে কবি এই অচেনা কলকাতার রূপান্তরের কথা বলছেন, 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে'। কলকাতা সম্ভবতঃ যে কর্মব্যস্ততা, যে আবর্জনা, যে অর্থগৃধ্নুতা বা ভোগলোলুপতার শিকার বলে কবি জেনেছিলেন সে সব হয়তো একদিন আর থাকবে না এবং মানুষের সার্বিক চেষ্টায় এই কলকাতা আরও সুন্দর সুচারু নগরসভ্যতার নজির হবে। তবে সে কারণেও নয় কবি যে দূরবর্তীর দিকে উন্মুখ সে বলয় অন্য কোথাও। এই 'সুচেতনা' নামক দ্বীপ তার যথেষ্ট প্রতীক বটে।

যে নগরসভ্যতায় কবি নিজেকে দেখছেন সেখানে থেকে কোন নির্দিষ্ট উত্তরণের পথেই তিনি সেই লোকোত্তর বন্দরের পারে গিয়ে পৌঁছচ্ছেন। একটা অদ্ভুত উপমায় কবি সেই আধ্যাত্মিক দিকচক্রবালের সন্ধান দিচ্ছেন এবং ঠিক এই কারণেই জীবনানন্দকে বারংবার আমাদের সহজ ভাবনার কবি বলে মনে হয়েছে। এই সেই উত্তরবন্দর, যেখানে জাহাজ এসে ভিড়েছে, একের পর এক, তার ভৌতিক শস্যসামগ্রী নিয়ে জমায়েত করে।

আসলে তা নিতান্ত শস্য নয়, মানবের শবদেহ এবং সেই শবদেহ থেকে প্রেত মানবের আত্মা, 'শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময় আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুসিয়াসের মতো আমাদেরও প্রাণ মূক করে রাখে'।

'স্বর্ণের বিস্ময়', এই শব্দ চয়নের মধ্যেই জীবনানন্দের দর্শনবৃত্তির সাক্ষর পাওয়া যায়, কল্পনার চোখে মৃতের পৈশাচিক নিস্তব্ধতার মধ্যে। কোন নৈসর্গিক ডক্ইয়ার্ডে আমরা প্রয়াতদের আলোয় প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠতে দেখি। তবে শুধু এইখানেই দৃশ্যাঙ্কন শেষ হচ্ছে না। কবিতাটির লজিক নির্নিমেষ কোন অনন্তের দিকে, নিঃসীমতার দিকে উদ্দিষ্ট। অত এব কবি যদিও মানছেন যে এই পৃথিবীর বুকেই তিনি 'যা হোল, হবে বা হবার নয়' এই সবই দেখছেন, এই পৃথিবীর শিশিরেই তিনি কোন বিরাট ভবিতব্যের সন্ধান পেয়েছেন, তবুও যেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেটা একেবারে কবিতার শেষ লাইনে উচ্চারিত, 'শ্বাশত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়'। এই সূর্যোদয়, বলতে অপেক্ষা রাখে না, একটা নিছক আশার বাণী নয় বরং তা প্রকৃতপক্ষেই আপ্তবাক্য, অ্যাপোক্যালিপটিক।

ব্রাহ্ম সমাজের যাঁরা প্রবক্তা ছিলেন তাঁরা নিরাকার চিন্তা করতেন। এই নিরাকার চিন্তা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপরিচয়' যাকে অন্যত্র আমি বাঙালির এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গদ্যকৃতি বলে চিহ্নিত করেছি, তা এই নিরাকার, সর্বাত্মক সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে। জীবনানন্দ কবিতা রচনা করার পক্ষে যে বিশ্বাস রাখতেন তা কিন্তু এই আত্মপরিচয়ের জীবনদেবতার মতো মনে হতে পারে। উপরন্তু, যখন আমরা শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থের বলয়ে প্রবেশ করি, যেখানে সেই চালকশক্তি, যাকে সৃষ্টির নিয়ামক বলে জানা আছে, যে শক্তি শব্দের শৃঙ্খলা তৈরী করে, শব্দকে অর্থবহ করে, যাকে ভর্ত্তৃহরি পশ্যন্তি বলে বর্ণনা করেছেন বা বেদান্ত যাকে প্রকৃতি বলেছিলেন, সেই স্তরে সৃষ্টির যে নিগূঢ় খেলা চলেছে তাকে অনুধাবন করতে প্রবৃত্ত হই। জীবনানন্দ যখন 'কবিতার কথা' লিখেছিলেন তখন তিনি নিরাকার ব্রহ্মচিন্তা বা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতত্ত্বের পক্ষে লিখেছিলেন। এই সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে নামকরণ করা চলে। সৃষ্টিকে উন্মেষ বলা যেতে পারে। কিংবা কৈবল্য। জীবনানন্দ একে বলছেন সৌন্দর্যের উদঘাটন। সৃষ্টি আমাদের নিয়ন্ত্রণ মানে না। এই সৃষ্টির শক্তি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকে আমরা চালক শক্তি বলে অভিহিত করতে পারি অথবা বলতে পারি সৃষ্টি বিবর্ত। এই বিবর্তনের একটা অধ্যায় মানুষ। একটা অধ্যায় আমার অন্তর্নিহিত অস্তিত্বের বোধ। এই সৃষ্টি বা বিবর্ত শব্দকে অর্থবহ করেছেন এবং সেই শব্দকে আমাদের গড়নে প্রদান করেছেন।

জীবনানন্দ যখন 'কবিতার কথা' লিখেছিলেন তখন তিনি সেই বারবেলায় কবি নন, যা বলে আজ তিনি আমাদের কাছে পরিচিত। তবে কবিতার কথায় তার চিন্তার সরণীতে কোন বিচ্যুত পদক্ষেপ পড়েনি। এখানেও তিনি নিশ্চয়তা, স্থির চাঞ্চল্যহীন মেধা নিয়ে লিখেছিলেন। কবিতার কথার প্রথম লাইনে যে কথা জীবনানন্দ দাশ উচ্চারণ করলেন তা আজকে দিকে দিকে ঠাট্টা করবার বৈঠক যেমন চলে তেমন আবার অন্যত্র কোন উঠতি কবির রচনাকে তিরস্কার করার কাজে ব্যবহার করতে দেখা যায়। সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। বলা নিষ্প্রয়োজন জীবনানন্দ এই উক্তির মধ্যে দিয়ে কবিকে সমাজের থেকে

পৃথক স্থান দিয়েছেন। কবি সাধারণের পংক্তিভাজন নন বরং তিনি অনন্য, অনন্যসাধারণ কোন ব্যক্তি বা ঐষীশক্তিপ্রাপ্ত, একজন বোধিসম্পন্ন, ব্যক্তি। তাঁর দৃষ্টি, তাঁর গ্রাহীতা আমাদের ধরাছোঁয়ার সামগ্রী নয়। কবির মনের পাত্রে কে বসুন্ধরার রূপ, মাধুর্য দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছেন। তাছাড়া গোটা ইতিহাসে মানুষের মনের যে নির্যাস সঞ্চয় করা হয়েছিল তা কবি তাঁর নিজের মত করে হাতে গড়ে নিয়েছেন ঠিক যেমন কুমোর তার পলিমাটি নিয়ে মূর্তি গড়ার সঙ্কল্প করে। কবির মন যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরী হতে থাকে তা যখন একটা নির্দিষ্ট রূপ নেয় তখন তাকে জীবনানন্দ সারবত্তা বলেছেন।

কবিতার কথার দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে জীবনান্দ কবিতা লেখার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু তার ভাষা এখানে হেঁয়ালির মত প্রায় আমাদের অগোচরে তার তাৎপর্যকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে। প্রথমতঃ কবির মনের ভিতরে যে ভাব গ্রোথিত হয়ে ক্রমে তা কবিতার শরীরে প্রকাশ পায়, নিজের মত করে যে ভাব তার অবয়ব গড়ে নয়, সেই প্রথা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করতে গিয়ে জীবনানন্দ রূপকের ব্যবহার করছেন। এটা কিছুটা অপ্রত্যাশিত, অর্থাৎ, এই রূপকের কাজ। স্বভাবসিদ্ধ যে কবি অলৌকিককে বিশ্বাস করেন তার পক্ষে মনে করা স্বাভাবিক যে কিছু বিশেষ রহস্য রয়েছে যা রূপক ছাড়া ব্যাখ্যা করা চলে না। জীবনানন্দ কাব্যের জনন বা জন্মকে তুলনা করলেন প্রজ্জ্বলিত মোমের সঙ্গে। সৃষ্টির বীজ বলে যা আজ আমাদের জানা হয়েছে এবং শাস্ত্র প্রমাণে কবিতার সৃষ্টিকে যে সার্বিক সৃষ্টির সামান্য বলে যা আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি সেই দিকেই জীবনানন্দের তত্ত্বের ইঙ্গিত। তিনি হয়তো বলতে চাইছেন কবির সেই ইনস্পায়ার্ড় মোমেন্ট্স্ এর কথা, যেখানে কবি মনে করেন যেন তার উপর কোন ভর হয়েছে বা তিনি সৃষ্টি করবার উত্তেজনায় এবং নির্মল আনন্দে নিমন্ত্রণ পেয়েছেন এবং তার হৃদয়ের মধ্যে কোন নৈসর্গিক সাযুজ্যে এই পৃথিবীর সব অনুভব, সব ভাব, সৌন্দর্যে, চারিমায়, তাদের স্থান করে নিয়েছে। জীবনানন্দ কবিতা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় মুহূর্তের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছেন। যে মুহূর্তগুলোর জন্যে কবি এই মোমের মতো এক প্রজ্জ্বলন অনুভব করেন সেই মুহূর্তের একটা বাড়তি দাম আছে। এই মুহূর্তটুকুতেই সে প্রকৃত অর্থে কবি এবং বাকি সময়টুকুতে যখন তিনি রচনা প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত অথচ এই হৃদয়ের স্ফুরণ অনুভব করছেন না তখন তিনি কবি নন। অতএব কোন দীর্ঘ রচনায় বা পরিসরে পুরোটাই কবিতা নয়। গোটাটাই গভীর অনুভবের সৃষ্টি নয়। কবিতার ন্যারেটিভ্‌কে বিশ্লেষণ করলে বোধহয় এই কবিতা জননের প্রতিফলন সেখানে বিক্ষিপ্ত আকৃতিতে অনুভব করা যাবে। প্রকৃত কবিতা কেবল এই মোমের মত জ্বলে ওঠা মুহূর্তেই রচিত হয়েছে বাকিটা কেবল দুর্বল সাযুজ্য বা যুক্তির গ্রহণযোগ্য আকৃতি পেয়েছে। এই চমৎকার অভিজ্ঞতা কবির মনকে ছেড়ে যেতে পারে। তখন সে কবিতা না লিখে কেবল পদ্য লেখেন, যে পাশ্চাত্য চিন্তকেরা জীবনানন্দকে এ বিষয় ভাবনা চিন্তার খোরাক যুগিয়ে থাকবেন তাঁরা কে বা কারা সেটা গবেষকরা খুঁজে পেতে বের করতে পারেন। তবে এ কথা কোলরীজ্ অথবা ম্যাথিউ আর্ণল্ডের ভাবনায় বিশেষ করে স্থান পেয়েছিল।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কোলরীজ্ যখন তার জীবনী রচনা করছিলেন তখন তিনি এই রকম

একটা মন্তব্য করেন। কবিতার জননের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবার সময়ে তিনি বলেন যে কোন দীর্ঘ কবিতার গোটাটাই কবিতার মূল্য পেতে পারে না। অর্থাৎ, কেবলমাত্র যখন কবির কল্পনাশক্তি কবিতার পরিসরে কাজ করতে থাকে, কোন ইন্দ্রজালের মত যখন কবির অনুপ্রাণিত হৃদয় সংসার যা প্রকৃতির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপকরণকে একটা সামান্য প্রতিভার আলোতে ঐক্যদান করতে সক্ষম হয় সেই সব মুহূর্তে কবির কল্পনার স্বাক্ষর প্রতীত হয়, সেই সব মুহূর্তে যখন বুদ্ধির বিক্ষিপ্ত শক্তি হৃদয়ের ঐক্যদানের কাছে পরাজয় স্বীকার করে একমাত্র তখনই কবিতার জননের কথা কারও পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা হয়, নচেৎ নয়। জীবনানন্দের কাব্যতত্ত্ব এই কোলরীজীয় ভাবধারায় কিছুটা আচ্ছন্ন। এটা প্রভাবের প্রশ্ন, ততটা নয় যতটা জীবনানন্দের আন্তরিক ধ্যানের ফসল। নিজের প্র্যাক্‌টিকাল অভিজ্ঞতার থেকে তিনি এই সত্যটাকে উপলব্ধি করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই ভাবধারা ইংরেজ কবিদের মধ্যে সক্রিয় ছিল বললে অত্যুক্তি করা হবে না এবং ম্যাথিউ আর্ণল্ড সাহেব থাকে কবিতার কষ্ঠি পাথর বলেছিলেন বা পেটার সাহেব যাকে স্টাইল বলে আখ্যায়িত করেছিলেন এই তত্ত্ব সেই সব চিন্তার অনুরূপ বলা চলে। এখানে কবির কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সাযুজ্যের। সৃষ্টির মহিমা এইখানেই যে তা নিজের খেয়াল মেনে চলে আর কবিকে তার সঙ্গী করে নেয় যাতে করে কবি এই সৃষ্টির পথকে, সৃষ্টির উন্মেষ বা জননকে তার মানসিকতার সর্বোচ্চ বা মাহাত্ম্যের শীর্ষ কোন অনুভূতি বলে স্বীকার করে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কোলরীজ্ কিংবা ওয়ালটার পেটারের তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার ফলে একটা বিশেষ দিক সম্পর্কে আমরা অবহিত হই। এমনকি কাব্যতত্ত্বেও, অর্থাৎ কবির মানসের বিশ্লেষণেও জীবনানন্দ পাশ্চাত্য পদ্ধতি প্রয়োগ করছেন। যদিও জীবনানন্দের কাব্যতত্ত্বের মূল বিষয়টা রবীন্দ্রনাথ এবং সংস্কৃত বৈয়াকরণের শাব্দিক চিন্তার থেকে একেবারে তফাতে নয়। আমরা বলতে পারি যে, কবিতার কথায় একটা বিশেষ ভাবধারা তৈরী হচ্ছে এবং রক্ষা পাচ্ছে। এটা একাংশে সনাতন, আবার একাংশে ততটুকুই সনাতন যতটা ব্রাহ্ম বৈদান্তিকেরা সনাতন ধর্মের কিছু মূল বক্তব্যকে বা পাঠ্যকে তাদের চিন্তার বা উপাসনার জন্য মেনে নিয়েছিলেন। এই যে ভাবধারা তৈরী হচ্ছে, জীবনানন্দ যে ভাবধারার অন্তর্গত তাতে বলা চলে লৌকিক আচার বিচার বা বিশ্বাস প্রত্যয়ের কোন স্থান নেই। জীবনানন্দের বক্তব্যে স্পষ্ট দেখতে পায় কেমন সাজে, লোকশিক্ষা বা রাজনীতির কথা কবিতা রচনার প্রক্রিয়ার মধ্যে একেবারে আত্মস্থ অথবা লুপ্ত হয়ে আছে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ হয়তো এই অলৌকিকতা পছন্দ করবেন এবং যেখানে সৃষ্টি তত্ত্বের অবয়বে সৌন্দর্যের অনুধাবন প্রাথমিক দরকার সেখানে এই তত্ত্বের মূল্য নেহাৎ কম নয়। এখানে লোকোত্তরতা, জ্যোতির্ময়তা অপ্রতুল নয়। ইংরেজিতে প্যারাডক্স বলে একটা কথা আছে। জীবনানন্দের যে চেতনার জগৎ তাতে বাঙালির ইতিহাসে, বাঙলা ভাষার ইতিহাসে একটা প্যারাডক্স দেখি। জীবনানন্দের কবিতার ক্ষেত্রে বাঙলার উপচার সর্বস্ব জীবনপথের যেমন বিসর্জন হয়েছে তেমন এক নব্য লোকভিত্তিক, গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার, ডেমোক্র্যাটিক কালচারের উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। এই সংস্কৃতি মানুষের বিবেক আর শুভ চেতনার উপর নির্ভর

করবে। তাতে ধর্মানুষঙ্গ বা প্রাচীন ঐতিহ্য স্মৃতির সামগ্রী হয়ে উঠবে আর তার জায়গায় স্থান পাবে বিমূর্ত, আত্মিক অন্বেষণের অক্ষর। জীবনানন্দ থেকে কয়েক লাইন উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টা নিয়ে আর সংশয় থাকে না। পাঠক লক্ষ্য করবেন, কবিতার কথায় তিনি বলছেন, 'প্রতিভা যাকে কবি বানিয়েছে—কিংবা সঙ্গীত বা চিত্রশিল্পী বানিয়েছে—বুদ্ধির সমীচীনতা নয়,—শিল্পের দেশেই সে সিদ্ধ শুধু ...যেখানে তার প্রতিভার স্বকীয় বিকাশ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সেই শিল্পের রাজ্যে তাঁকে খুঁজতে হবে। সেখানে দর্শন নেই। রাজনীতি নেই, সমাজনীতি নেই ধর্মও নেই—কিংবা এই সবই রয়েছে কিন্তু তবুও এ সমস্ত জিনিস যেন এ সমস্ত জিনিস নয় আর'।

সেই সমস্ত না থাকার তাৎপর্য এই যে সেই সব চিন্তার উপকরণ একটা নতুন সাযুজ্যে স্থান পেয়েছে। কবিতার সামগ্রী কবির হৃদয়ে এমন এক উৎসারের মত জন্ম নেয় যেখানে মনে হয় যেন কোন প্রজ্জ্বলিত অনুভূতি মানুষের ভাব আকাঙ্খা বা তার আবিষ্কার করা সব তথ্যকে একটা নতুন, প্রায় অজানা কোন বিকাশে, বা সৃষ্টিতে সার্থক করে তুলেছে। এই সৃষ্টির মন্ত্রগুপ্তি কবির একান্ত বলে জীবনানন্দ মনে করেন। আমাদের বরঞ্চ আরও মনে হয়েছে যে সামগ্রী যেহেতু সৃষ্টির তত্ত্বে গৌণ সেহেতু কবিতা শুধু কাগজে লেখা কয়েক লাইনের মধ্যে বা লেখকের নিজের খেয়ালে আলপনা করা চত্বরের মধ্যেই আটকে থাকবে না। সংসারের প্রত্যেকটা রীতিতে এই সাযুজ্যকে, এই বিকাশকে, বা যাকে সৃষ্টি বললাম তাকে, যেন আহ্বান করা হবে। এই আহ্বানেই সম্ভবতঃ মানুষের অস্তিত্ব একটা কবিতা হয়ে উঠবে। কবিতার থেকে যে অনেক শেখার আছে তা আমরা শিখতে পারি একমাত্র তখনই যখন এই সৃষ্টির বা সুন্দরের বোধটা আমাদের মধ্যে কাজ করে। যেটা কবির মধ্যে কাজ করেছিল সেটা আমাদের মধ্যেও করবে। সহৃদয়তায়, জীবনানন্দের কাছে যা পাইনি তা নিয়ে আর আক্ষেপ করে লাভ নেই। তার কাছে অনাগত কালের মানুষ কি পেতে পারে সেটা বিবেচনা করা চলে।

১০

বাঙালির সংস্কৃতি ও ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব

১

উনত্রিশ বছর বয়স হলে আমার বাঁজা মেয়ের মতো যন্ত্রণা হতে লাগল। কৈশোরপ্রাপ্ত হবার পর থেকে চিত্তে গর্ভধারণ করার সাধ জেগেছে কিন্তু সাধ আর সাধ্যের, দৈবের বশে, সামঞ্জস্য ঘটেনি। অনেক প্রযত্ন করাতেও এযাবৎ লেখা শুরু করা গেল না। অবশেষে স্থির করলাম যে বাতাসে আর দিন যেতে দেওয়া যায় না। এ পর্যন্ত যে সকল যবন ফিরিঙ্গিদের লেখা পড়েছি তথা ব্রাহ্মণ সন্তান হলেও বিধর্ম্মীর তত্ত্বজ্ঞানে আত্মমগ্ন থেকেছি এবং সেহেতু বৈদগ্ধ লাভ করে যারপরনাই আনন্দ পেয়েছি সে সকল গ্রন্থ রচনাকারেরা যা বলেছে তা অনুসরণ করা সিদ্ধান্ত করলাম। আমার মনে হল (তবে সেটা হঠকারিতা হতে পারে) যে মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা হয়েছে। অতএব মানুষের সমাজ, তার সংস্কৃতি, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে গুটিকয় সন্দর্ভ রচনা করা যেতে পারে। বিশেষ করে মনুষ্যকূলের মূর্তিমান বাঙালি জাতির সমাজ ও চরিত্র নিয়ে ভাবনা চিন্তার অবকাশ রয়েছে বলে মনে হল। তবে এ তো গেল রচনার বিষয়বস্তুর কথা এবং যেহেতু বিষয়বস্তুর কথা উঠল সেহেতু এটাও কবুল করা প্রয়োজন যে যদিও এ লেখকের উক্ত বিষয়গুলো আদতে ঠাট্টার দ্রব্য নয় তথাপি আমার শিক্ষানবিশী অতিপ্রকট। আবার প্রথমতঃ আমি দর্শন শাস্ত্রে পণ্ডিত নই, নৈয়াইকও নই। দ্বিতীয়তঃ নানা অকাজে শশব্যস্ত থাকাতে বিষয়ের উপস্থাপনার দিকে দৃকপাত করার অবকাশ হয়নি। উপরন্তু আমার ভাষাজ্ঞান সীমিত। আমি শব্দের বুৎপত্তি সম্বন্ধে অবহিত নই। আমার অভিধান এখনও অপঠিত রয়েছে। অতএব একটি দীর্ঘ গদ্য রচনা করার উপক্রম যেমন আমার পক্ষে অযৌক্তিক তেমন এক অর্থে অর্বাচীনতার লক্ষণ হতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে একটা সুবৃহৎ পরিকল্পনা করেছিলাম কিন্তু তার বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব নয় ভেবে বেশীদূর এগুইনি। অনেকদিন যাবৎ দুশ্চিন্তা করেছি যে বাঙালির তেমন দর্শনশাস্ত্র নেই। পাশ্চাত্য দর্শন নিয়ে যতই পড়েছি ততই মনে হয়েছে যে বাঙলায় ইদানীং যে দর্শনচর্চা হচ্ছে তাতে একটা বড় ফাঁকি রয়ে যাচ্ছে। এটা সত্যি যে পশ্চিমের দেশগুলোতে ইদানীং কালে মনীষীরা যেমন ভুরি ভুরি রচনাসম্ভারের নিদর্শন রেখেছেন তেমন এই প্রায় হতভাগ্য বাঙালী জাতির ভাগ্যে সম্ভব হয়নি। বাঙালির ইতিহাসও তো সহস্র বৎসর।

কোথায় কোন্ বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের হ্রং টিং চ্ছটে বাঙলা সভ্যতার বিকাশ হোল, কোথায় কোন্ মৌন ভাব, বা বুদ্ধের বাণী দীপ্ত আলোয় বাঙালির সংস্কৃতি স্বতোৎসারিত স্রোতে বিন্যস্ত হোল বা মোছলমান নবাবের হেফাজতখানায় তরোয়াল নিয়ে হানাহানি হোল, ওলোন্দাজ এল, ফিরিঙ্গি এল, তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু এমন কোন গ্রন্থ রচনা করার কোন প্রমাণ নেই যার ফলে বলা যায় যে, এ জাতি তার ন্যায়সঙ্গত চিন্তার স্বাক্ষর করে রাখতে পেরেছে। বঙ্কিম যে বাঙালিকে আত্মবিস্মৃত বলেছেন এ তো কেবল আংশিক সত্য। ইতিহাস রক্ষা করাটাও একটা বিশ্বদর্শনের বোধ থেকে সম্ভব হয়। যে দেশের লোকেরা পরের বিশ্ববীক্ষায় নিজের ইতিহাস রচনা করে এবং মনে করে যে এতেই তাঁর বঙ্কিমচন্দ্রের ফরমাশ খাটা হয়ে গেল তাঁরা ভুল করেন। যে ন্যায়দর্শন, অর্থাৎ এপিস্টোমলজি বাঙালিকে তার সমগ্র সংস্কৃতির মূল্যায়ন করতে সাহায্য করবে সে কাজ করার শতসহস্র ভাগের এক ভাগ নিতে চেয়েছিলাম। এটাই ছিল আমার প্রথম ভাবনা। এই ভাবনা রূপায়নের প্রকল্পে আপাততঃ অনন্যোপায় হলে আমি একটা কিঞ্চিৎ ভিন্ন চেষ্টায় রত হলাম। আমাদের সাহিত্য, কাব্য বা সমালোচনায় যে বড় ভাবনার ইঙ্গিত রয়েছে, আমাদের প্রাচীন ট্র্যাডিশনের উপকরণ যে সাজসজ্জায় বর্তমানের আর্ট, বর্তমানের পলিটিক্স্ বা জীবনচর্চাকে সমৃদ্ধ করছে তার বিশ্লেষণ করা সাব্যস্ত করলাম।

এখানে অবশ্য চক্রবৎ ঘুরে একটা পুরোনো প্রসঙ্গ অবতারণা করতে হয়। বাঙালির ট্র্যাডিশনে, তার চিন্তার উপকরণ, তার দর্শন কেমনতর তা সর্বজনবিদিত। বাঙালির অধ্যাত্মদর্শন পৃথিবীশ্রেষ্ঠ, তার দীর্ঘ ইতিহাস। বাঙালির দর্শন পৌরুষেয় অর্থাৎ একথা বলতে আমি এটাই প্রতিপন্ন করা সিদ্ধান্ত করলাম যে পূর্বতন রাঢ়, পৌন্ড্রবর্ধন, সমতট অঞ্চলের পণ্ডিতবর্গ একটা অদ্ভুত শৈলী করে তাঁদের ভগবৎদর্শন রচনা করেছেন এবং তার ভিত্তি থেকে পুরুষকারের ধারণা জন্ম দিয়েছেন। ভগবানকে পুরুষকল্পে চিন্তা করা এবং তৎসঙ্গে নেচেকুঁদে তার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা এ বঙ্গের মাটিতে যে ভাবে রূপায়িত হয়েছে তা এক হাতে প্রশংসাযোগ্য আবার অন্য হাতে বিস্ময়কর। এ বঙ্গ শ্রীচৈতন্যের লীলাক্ষেত্র। বাঙালি বাঙলার মাটিতে ভক্তিধাম নির্মাণ করেছেন। বৈষ্ণবদর্শনের ন্যায় সুচিন্তিত, সৌখিন, কাব্যময় তথা আটপৌরে, এবং ইদানীং সুবিদিত দর্শনপন্থা কম রয়েছে। বাঙালির দ্বিতীয় অবদান দেবীকল্প। 'মনসামঙ্গল' কাব্যের চাঁদসদাগরের শেষ পরাজয়, যার দ্বারা সে মনসার ঈর্ষাদলনী চরণে প্রত্যাবর্তন করল তা এক জটিল দর্শনপন্থার কাব্যরূপ তো বটেই এমনকি তা এক অপার্থিব অধ্যাত্মভাব প্রকাশ করতে থাকে। ঠিক যে মুহূর্তে রূপকের মানব-মানবী বা ঠাকুর দেবতা তার রূপকতা পরিত্যাগ করে একটা অন্য আত্মিক সত্যের আভাস বহন করতে শুরু করে সে মুহূর্তে ধর্মের বিশ্বজনীনতা প্রকাশ পায় তথাপি লৌকিক হতে অপরিবর্তনীয় অলৌকিকতার সংসর্গলাভ করে। দেবীমূর্তির পূজোআচ্চা শাক্তদর্শনেও প্রকট। মহাশয় পাঠক আপনার এ কথা অবিদিত থাকা বাঞ্ছনীয় নয় যে আমি বাঙালির দর্শন নেই বলতে বাঙলার অধ্যাত্মদর্শনের ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়েছি। কারণ প্রাগুক্ত সর্গে আমি বিশেষ করে লোকায়ত দর্শনের, যেমন লজিকের কথা বলেছি। আজ সাহিত্য বা রাজনীতি শিক্ষা করতে গিয়ে আমাদের লজিক বা ন্যায় নির্ভর হতে হয় বটে

তথাচ এ পন্থা বাঙালি জাতির নিজস্ব ন্যায়দর্শন নয়, পাশ্চাত্য ন্যায়। প্রাচ্য নৈয়াইকের রচনাসম্ভার প্রায় অনুপস্থিত, নচেৎ অকিঞ্চিৎকর।

আবার বাঙলা সাহিত্যে আমি নিতান্ত অজ্ঞ নই, কারণ আমি পুরোপুরি অশিক্ষিতও বটে। তবে পাঠক মহাশয় এ স্বীকারোক্তি শুনে প্রশ্ন করতে পারেন যে যদিও আমার মঙ্গলকাব্যে স্কলারশিপ অতিকিঞ্চিৎ, বৈষ্ণব ঐতিহ্যের ভক্তি ভাবনা সম্বন্ধে নিস্পৃহ এবং রবীন্দ্রনাথের মতো ক্ষণজন্মা প্রতিভার সাহিত্যকৃতি পর্যন্ত অধ্যয়ন করা হোল না তথাপি কোন ধৃষ্টতায় বাঙলা সাহিত্যের এবং বাঙালির দর্শন সাহিত্যের প্রসঙ্গ এ রচনায় টেনে আনলাম। যথোচিত দূরে থাক, মাতৃভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় যথোকিঞ্চিৎ। আমি নিজগৃহে অজ্ঞাতবাসী এবং পরগৃহে আত্মপ্রবঞ্চক। স্বভাবতঃ অনন্যোপায় হওয়া সত্ত্বেও স্বক্ষেত্রে পরবাসী থাকা আমার জীবনের একমাত্র সত্য ঘটনা। তবে সাহিত্যের যথার্থ মূল্য না টের পেলেও, বাঙালির যে চলতি জীবনচর্চার একটা সুপরিকল্পিত বিন্যাস বা বিশ্লেষণ উপস্থিত করা যেতে পারে এ বিশ্বাস আমার মানসপটে দৃঢ় হয়েছিল। চালচিত্রে যেমন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পরিলক্ষিত হয়, পটুয়ার রঞ্জনপটে যেমন ধানের শিস্, টাকার ঘট, রাশি রাশি মোহরের মাঝখানে, বাহক লক্ষ্মীপ্যাঁচার পিঠে লক্ষ্মীকে চাপিয়ে সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত উপচারের চিত্র সৃষ্টি করা হয়, তেমন একটা পটচিত্র কল্পনা করেছিলাম। অর্থাৎ সংসারের বিক্ষিপ্ত আচার-অনুষ্ঠান যেন সংস্কৃতির একটা পট নির্মাণ করতে পারে। পৌষের ভোরে যুবক সাইকেল চালিয়ে যায়, মফঃস্বলের গৃহস্থ মানুষ ডেলীপ্যাসেঞ্জারির পরে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেবে যখন দুগ্ধপোষ্য শিশু মাতৃক্রোড়ে ক্রন্দন করে তখন হরেকরকম ঘটনা কল্পনা প্রতিভায় হঠাৎ রোমাঞ্চকর ঠেকে। বঙ্গলোকের গল্পে এ সকল ঘটনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে। এই সব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘটনা পূজা পার্বণ সংস্কৃতির উপকরণ। এভাবে মনে করা যায় যে যদি একটা দৃঢ় বিশ্বাস ধারণ করা যায় এই ভেবে যে মানুষের সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত অর্থ একমাত্র বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার বা অনুভবের ফলেই সম্ভব হয় তাহলে একটা বড় লাভ হয়। এক্ষেত্রে সংস্কৃতির ধারাবিবরণীকারকে এই ভেবে বেগ পেতে হয় না যে তার পণ্ডিত হবার অবকাশ ঘটেনি। কেবলমাত্র সরল জীবনযাত্রার মধ্যেই সে অনুভাসম্পন্ন হতে পেরেছে।

অপরপক্ষে একটা যৌক্তিক ব্যাখ্যার দ্বারা দর্শনশাস্ত্র রচনা করবার আগেই আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে আমি পরাবাস্তব সত্যে বিশ্বাস করি। আমার কেবলই মনে হয়েছে যে ব্রহ্মাণ্ডের একটা আধ্যাত্মিক মুহূর্ত রয়েছে, নির্বিকার, যার সম্বন্ধে বিশেষ করে কারও কিছু বলবার জো নেই। উপরন্তু এই অবিচল মুহূর্তের দিকে যেন কোনো অমোঘ নিয়মে এ বিশ্বপ্রপঞ্চের সমস্ত লীলা উদ্যত হচ্ছে। ঈশ্বরের এই সত্ত্বা কোথায়, কোন্ স্থানে অবস্থিত, ব্রহ্মাণ্ডের কোন দিগ্বলয়ে তিনি আপন সত্ত্বাকে বিধৃত করে রেখেছেন এমন প্রশ্ন করা হলে আমি উত্তর দিতে উদ্যত হব যে যেহেতু তার অস্তিত্ব স্থান বা কালের পরিসীমায় আসে না সেহেতু তাঁর দিঙ্‌নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কেবল বলা যায়, যে এই আধারপুরুষ আমাদের সকল অনুভূতির উর্দ্ধে নিশ্চলভাবে আপনার আশ্রয়ে বিরাজ করছেন। তিনি অবশ্যই আছেন, উর্দ্ধে—এই বাহ্যিক জগতের অন্তরে নিহিত আছেন। লাবণ্যে ভরপুর পৃথিবী

আমাদের রোমাঞ্চ করে, এবং তার বাহুল্য নিয়ে ছলনা করে। আকাশ, ধরিত্রী, বায়ু ও সলিল কেবল মায়াবি প্রকৃতি মাত্র। কিন্তু তারা এই আধ্যাত্মিক মুহূর্ত বা অধিষ্ঠানের দিকে আমাদের নিয়ে চলেছে। প্রকৃতপক্ষে এই আধারের তত্ত্ব এক বিরাট তত্ত্ব যদিও তার সম্পূর্ণ উপস্থাপনা এই ছোট পরিসরে সম্ভব নয়। এই যে সৃষ্টির কথা উল্লেখ করলম সেটা একটা প্রক্রিয়া। যেন বীজ প্রক্ষিপ্ত হচ্ছে। তৃণ উপ্ত হচ্ছে। মানুষের এই সংস্কৃতিতে যে বৈচিত্র্য, যে সংস্কার, যে ছোট ছোট উপকরণ, পোড়া মাটির পুতুল বা লোকসঙ্গীতের কলি যার দৃষ্টান্ত হতে পারে, তার মধ্যে যেন বীজ বা সংকেত। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব হল এইটেই যে এই সংকেতগুলোর মধ্যে যেন মানুষের উত্তরণের ইঙ্গিত বিধৃত রয়েছে। মানুষ যে সৃষ্টির উৎসে ফিরে যাওয়ার প্রযত্ন করে অব্যাহত প্রয়াশের প্রতিফলন ঘটে সংস্কৃতিতে। নইলে সুন্দর কোন দ্রব্যে সুন্দরের উপস্থিতি ঘটবে কেন? মানুষ তো হাট-বাজার বা থানাতল্লাশি নিয়ে থাকতে পারত কিন্তু তা সে করেনি। বরঞ্চ সে সংস্কৃতিবান হতে চেয়েছে। এই হতে চাওয়ার মধ্যেই সংস্কৃতির তত্ত্ব নিহিত রয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে।

একটা জাতির ভাষা, সাহিত্য, উৎসব, মেলা, আচার-অনুষ্ঠান, তার ধর্ম, তার সংস্কার, তার নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্ম, তার সম্মান, তার রাজনীতি এবং তার ভবিতব্যের কল্পনা। এক নিত্যকর্ম পদ্ধতি অর্থাৎ প্রভাতকালের প্রাতক্রিয়া থেকে রাত্রের শয়নকক্ষের প্রত্যেকটা ব্যবহার আরও করলে, আমরা একটা জাতির সংস্কৃতিভাবনার ধারণা পাই। তবে এখানেই কালচারের তত্ত্ব কথা ফুরোয় না। কারণ, দ্বিতীয়তঃ এই বাহ্যিক লক্ষণের মধ্যে সংস্কৃতি আরও রহস্যময় সূত্রের অনুধ্যান করা সম্ভব। এখন কতকটা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা কবতে হয়। অবশ্য যদিও একথা ঠিক যে কোন সাংস্কৃতিক তত্ত্ব এ রচনার উপপাদ্য উপরন্তু এই তত্ত্বের, একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। এতে করে সংস্কৃতির সৃষ্টিসূত্রটুকু নির্ণীত করা ও চিহ্নিত করা যায়। সমগ্র মানব সংস্কৃতির বিশ্লেষণের কাজে এটা একটা পদ্ধতি প্রদান করবে, কিংবা একটা মানসিক বা বৌদ্ধিক ভিত্তি স্থাপন করবে যার উপর এই প্রবন্ধের কলমকারি বিন্যাস লাভ করতে পারে।

যে রহস্য কালের গর্ভে সুপ্ত রয়েছে তার কিছুটা অনুমান করলেও সত্যের কিছুটা অব্যক্ত থেকে যায়। মানুষের অনুসন্ধিৎসু চিত্তের বাহবা করলেও তার অনুসন্ধান করবার ক্ষমতা যে সর্বদা সীমিত এ কথা নতুন করে বলতে লাগে না। আমরা যে কালচারে জন্মলাভ করি এবং মানসিক ভাবে যে কালচারের চৌহদ্দির মধ্যে বড় হই তার কবে কোথায় কিম্বা কেমন করে উদ্ভব হয়েছিল সে তত্ত্বের গোটাটাই জানা যেতে পারে না। আসলে, আমাদের ক্ষুদ্রসত্ত্বাটুকু মেনে নিয়ে যদি বলা যায় যে কালচার আমাদের দ্বারা সৃষ্ট হয় না বরং কালচারই আমাদের স্বভাব রচনা করে তাহলে একটা বড় সত্যি কথা বলা হয়, এতে আমাদের অহংভাব কিছুটা খর্ব হয়। বাস্তবিক, এ কথা উপলব্ধি করতে পারি যে আমরা সংস্কৃতির পরিনামচক্রে নিজেদের স্থান গ্রহণ করার জন্যে যেন আপনা থেকেই দীক্ষা লাভ করেছি। এবং আমাদের বড় হয়ে ওঠার মধ্যে সংস্কৃতিকে তার নৈপুণ্যে, সূক্ষ্মতায় এবং বৈচিত্র্যে চিনতে পেরেছি। এতে চমৎকার লাগে। পরিশেষে, যখন আমাদের আত্মা

অনেকটা বিকশিত হয় তখন বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা একটাই সত্য উপলব্ধি করে থাকি। মানুষের সেই সৌন্দর্যের বোধ কমবেশী প্রত্যেকটা বস্তুতেই বিধৃত হয়ে আছে। আমরা দেখার কায়দা রপ্ত করলেই দেখতে পাব। কেমন করে নির্বিঘ্নে, কারোও পারমিশন ছাড়াই, চারিদিকে সুন্দরের বোধটা আমাদের আচার-ব্যবহার বা ব্যবহার্য জিনিসগুলোর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। আলপনার মধ্যে, পূজোর বিগ্রহে, নৈবেদ্যর সাজে, চুলের ছাঁট কিংবা অঙ্গসজ্জার মধ্যে সুন্দর করে সৃষ্টি করার চেষ্টাটুকু প্রতিফলিত হয়। সংসার চরাচরকে সৃষ্টির লীলাক্ষেত্র বলে বোধ হতে থাকে। একটা ছোট্ট, বিক্ষিপ্ত ঘটনাকেও তখন জীবিত বা জৈবিক, কোন প্রাণিত, বিবর্তের সংকেত বলে ঠেকে।

রমণীরা যে ছাপা শাড়ি পরিধান করেন তাতে এক বিশেষ ধরণের নক্সা থাকে। পরিধেয় বস্ত্রে এই যে বিশেষ কারুশিল্পের নিদর্শন তার তাৎপর্য এইখানেই। বাগবাজার স্ট্রীটের মোড়ে যেখানে মোদকের মিষ্টান্ন ভাণ্ডার অবস্থান করছে তার অনতিদূরে একটা ছাপা শাড়ির কারখানা ছিল। কয়েকজন শীর্ণকায় কারিগর সেখানে দিবারাত্র মিলের কাপড়ে নক্সী ছাপ বিকশিত করতেন। হরেক রকম রঙে সাদা কাপড়ের উপর চৌকোন, গোল বা অর্ধবৃত্তাকার ছাপ ফেলা হত। দ্রৌপদীর বস্ত্রের মত সে দীর্ঘসূত্রী কাপড়ের রোলে শ্রমিকেরা অবিরাম নক্সা এঁকে চলতেন। ছাপাইদের যে বিন্যাসগুলো আমার মনে খুব স্পষ্ট করে রেখাপাত করেছিল তার মধ্যে একটা বিশেষ নক্সা ছিল চৌকোন। চৌকোন আকারের মধ্যে সারি দিয়ে শঙ্খকল্‌কা করা থাকত। তারা কোন আত্মিক সত্যের প্রতীকির মত আমার চোখে প্রতীত হোত। অর্থাৎ, সুচারু বস্ত্র পরিধান করার যে আন্তরিক আকর্ষণ আমরা অনুভব করি সেটা এই ছাপাইদের হাতে শঙ্খকল্‌কার রূপ নিয়েছে। ছাপা শাড়ির কল্কার মধ্যে যে অপার্থিব ভাব থাকতে পারে, তা নিতান্ত কাকৃতালীয় নয়। ছোটবেলা থেকে যে কল্কাগুলো স্মৃতিপটে রয়ে গেছে তা আমার মানসের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আরও সুনিশ্চিত রূপে প্রকট হয়েছে। আত্মিক দিনযাপনের ফলে বুঝতে শিখেছি যে অকিঞ্চিৎকর উপমার মত যে সকল কারুকার্য আমার সংস্কৃতিবহ মনে হয়েছে সেগুলো নিছক বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। বরঞ্চ যে অপার্থিবতা আমাদের বাসভূমির পঞ্চত্ব সংগ্রহ করে সংস্কৃতির চরিত্র নির্ধারিত করে এতে তারই স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়।

বর্তমান প্রবন্ধের প্রেক্ষাপটে আত্মকথন অহেতুক নয়। অন্ততঃ হৈতুক না হলেও, এবং ইদানীং যদিও অন্যত্র আমাকে হেতুবাদীতায় আচারনিষ্ঠ হতে হচ্ছে না, এ জবানবন্দি করতে পিছুপা হব না যে আমি খানিকটা অবান্তর মতামত প্রশ্রয় দিয়েছি। তবে বিষয়ান্তরের পরিবর্তে আমার রচনার পার্শ্বচারিতাকে বিষয়ের যথার্থ বিস্তার বলা ভাল। ক্লাসিকাল সংগীতের বিস্তার লাভের মতো ব্যক্তিগত প্রবন্ধে প্রথমে ভূমিকার মতো করে নিজের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞান ব্যক্ত করা গেল। সাফল্য পাঠক বিচার করবেন। যাঁরা বারুইপুরের নিকট দক্ষিনরায়ের মন্দির পরিদর্শন করেছেন তাঁরা বিগ্রহের চোখে গোসাবা হতে নামখানা, বা হ্যাটানিয়া-দোয়ানিয়ার সংলগ্ন বনাঞ্চলের ভয়াবহতা অনুভব করেছেন। দক্ষিণেশ্বরের পরাভৌতিক চাহনি পর্যবেক্ষককে সুন্দরবনের আদি পুরাতত্ত্ব স্মরণ করায়। শৈশবে একবার দক্ষিণরায়ের মন্দিরে গেছিলাম। মন্দির দালানের বাস্তুচিত্র এখন প্রায় কিছুই স্মরণ হয় না।

তবে দক্ষিণরায়ের শার্দুলবাহিত বিস্ফারিতচক্ষু মূর্তি দেখেছিলাম। তার মুখাকৃতি ছিল গোলাকার, মূর্তির দৃষ্টিতে দক্ষিণরায়ের প্রজাপালনের জন্যে চিন্তিতভাব প্রকাশ পায়। কথিত আছে, যখন অঞ্চলের মানুষ নিত্য রাতে ঘুমোতে যায় দক্ষিণরায়ের দৈবরূপ স্বয়ং এলাকা প্রদক্ষিণ করতে বেরোয়। রাতের অন্ধকারে শার্দুলবাহিত গণদেবতা দক্ষিণরায় জনহিতের নিমিত্ত প্রত্যাবর্তী হন। ঘরকন্নার পরে গৃহিনী নিশ্চিন্তে তন্দ্রা যান। মালি, ক্ষেতচাষী, রোজকার কাজ সেরে নির্বিঘ্নে শুতে পারেন। যদিও দক্ষিণরায়ের নাইট ডিউটি মুক্ত স্বাধীন দেশের নানা সামাজিক বা অর্থসম্বন্ধীয় বিপর্যয় সমস্ত সর্বদা ঠেকাতে পারেনি। তবে এই যে লৌকিক পুরাণ তৈরী হয়েছে তাতে এ অঞ্চলের লোকেদের যত ভয় ভাবনা ছিল, যত অবলম্বন ছিল সব একই বিন্যাসে রহস্যে প্রকট হয়েছে। সব এক আর্টে, উপাসনায় রূপান্তরিত হয়েছে।

আমি আবাল্য কলকাতার দূরবর্তী মফঃস্বলবক্ষে মানুষ হয়েছি। প্রপিতামহ দেশভাগের সময়ে ক্লেশবিদারিত চিত্তে পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হবে স্থির করেন। সংসার স্কন্ধে তিনি মধুমতি নদীর পার থেকে উৎপাটিত হয়েছিলেন। পূর্ববাংলায় আমার ঠাকুর্দা সাবডিভিশন টাউনে ওকালতিতে কিঞ্চিতধিক পশর করতঃ একটা বড় দালানবাড়ি নির্মাণ করেন। দেশভাগের পঞ্চাশ বৎসর পরে আমার পিতা ওপার বাঙলা ভ্রমণ করতে গিয়ে সে বাড়ি দেখলেন, ইঁটে গাঁথা প্রাচীর বটবৃক্ষ আচ্ছন্ন করেছে। সে যাবৎ পরিত্যক্ত ঘরগুলোর কালিমা শান্তবাটির পূর্বস্মৃতি অবগুণ্ঠিত করে রেখে ছিল। আমার পূর্বপুরুষদের পারিব্রজ্যের ইতিহাস কেবল এতটুকু। সাতচল্লিশের ঘূর্ণিপাকে বাবা শাহের মোড় নামক শহরতলিতে বসত নির্মাণ করলেন। গর্ভ থেকে বেরিয়ে সে বাড়ির ছাদের তলায় দিনে দিনে শশরীরে বৃদ্ধি পায়। একদা যে পূর্ববঙ্গীয় কালচার আমাদের সংসারে প্রকট ছিল তা খুইয়ে ক্রমশ এদেশীয় হলাম। এই সাংস্কৃতিক পাল্টা পুরাণের একটা তাৎপর্য ছিল বইকি এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যার যে দায়িত্ব অর্শায় আত্মরূপান্তরের গল্প-হুঁকায় এক ছিলিম ঠাণ্ডা তামাক ঠেসে যাতে গড়গড়া ফুঁকলে তার ভেদভাব প্রশমিত হয়। প্রকৃতপক্ষে কালচার এর বা ওর হয় না।

অতঃপর যে দৃষ্টির দ্বারা আমরা লোকেদের কালচার বিশ্লেষণ করার উপক্রম করি সে বিশেষ দৃষ্টিতে কালচার সবিশেষ রূপে ঠেকে। আমাদের একটা বিশ্বাস জন্মায়, যেই একমাত্র প্রক্রিয়ায় আমরা সংস্কৃতির রূপরেখা অঙ্কন করি সেটা একেবারেই আমাদের নিজেদের একটানা অনেকদিনকার মেলামেশায় অর্জন করা গেছে। কবে এ চক্ষু উন্মেষের কাহিনী শুরু হয়েছে তা স্পষ্ট হতে পারে না। শৈশবের অর্ধচেতনার মধ্যেই বোধ করি এই দেখতে পাওয়ার সূচনা হয়েছে। জননীর কোলে পীবরস্তন পান করতে করতে কচি কাঁচারা বিকাশ লাভ করে। মায়ের কক্ষপুটে সন্তান কেমন দ্যুতি বিচ্চুরিত করে মায়ের মনোরঞ্জন করে। তদুপরি শিশুর মানসিক বর্ধ অব্যাহত থাকে। সে অক্লেশে মায়ের নিপীড়নের জন্যে নানাপ্রকার দুষ্টবুদ্ধি অর্জন করে। এ বাৎসল্য ক্রীড়া তারুণ্যের মানসিকতা তৈরি করে। সচরাচর বাচ্চাদের এই নিশ্চুপ জীবনী চোখে পড়ে না তবে এর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবার বিশেষ অবকাশ নেই। মা ও শিশুর জৈববৈজ্ঞানিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে, জননী ধরিত্রীর

শস্য সঞ্চয়ন ও বিপণনের মধ্যে দিয়ে, নাড়ির টানের যে অকৃত্রিম চাওয়া-পাওয়া থাকে, তার মধ্যে দিয়েই সমাজ, সংস্কার আর মানবিক মুল্যের বোধ সৃষ্টি হয়। এই বোধের কাঁচামাল নাড়িই—অর্থাৎ দান ও নির্মল গ্রাহীতা, বিকাশ ও সৌন্দর্য।

এখন এই যে একটা নির্দিষ্ট করে চেয়ে দেখার কথা বললাম এর কতকগুলো উপাদান থাকে। অন্ততঃপক্ষে কলকাতার জনপদে যিনি এ কথা ভেবে দেখেছেন তিনি অনুভব করেছেন যে কলকাত্তাই লোকের, একটা ললিত কৌতুকবোধ থাকে। ধরুন পাঠক যদি ইংলণ্ডের স্যাক্সন অধিবাসীদের উদাহরণ বিবেচনা করেন কিম্বা চীনের উপজাতিদিগের কোন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অভিহিত হতে চান তাহলে তিনি লক্ষ্য করবেন কেমন করে এই ভিন্ন ভিন্ন জনজাতিগুলো চিন্তা করে বা বিশ্লেষণ করে—পর্যবেক্ষণ এবং উপস্থাপন করে। যাঁরা ফিরিঙ্গি ভন্ উইলিয়মের কম্পোজিশন শুনেছেন তারা বিলেতি রাখালের ভাবনা কিছু বুঝেছেন। চীনেদের ক্যালিগ্রাফিতে সে জাতির সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্নতা ফুটে ওঠে। তবে বাঙালির জীবনচর্যায় একটা সুললিত ক্যারিকেচার। ক্যারিকেচারে মানবের আত্মপ্রতিকৃতির ব্যঙ্গ করা হয়। তবে এ ব্যঙ্গে মানবকে তুচ্ছজ্ঞান করা যায় না। বরং এ ব্যঙ্গে ইহলোকের ট্রিভিয়াল ভাবটা বজায় থাকে। ক্যারিকেচারে মানবের ভিতরকার স্থূলতা ধরা পড়ে। আমাদের বেঁচে থাকার একটা অন্যতম প্রধান ঘটনা হল এই যে গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের অস্তিত্ব কত স্থূল ও হাস্যকর। জীবনের প্রতি সততা থাকলেই এই বোধ কাজ করতে পারে। ক্লাসিকাল্ কবির কল্পনায় সরস্বতী চন্দ্রবদনা হতে পারেন, তথাপি ছাঁচে ঢালা পরিমাপে সরস্বতী কলসীর মতো পয়োধর, নমনীয় বেতের মতন কোটিদেশ পেতে পারেন। কিন্তু যে লৌকিক কল্পনায় বঙ্গলোকের পটচিত্র আঁকা হয়েছে সেখানে গৃহিনী সরস্বতীর নেহাৎ কুমড়োর গড়ন। গোল বিস্ফারিত অথচ সদয় চোখ। অগ্রে বরাভয় কর প্রক্ষিপ্ত। এতেই মানবের ক্যারিকেচার সম্পূর্ণ। আমি যা বলতে চাইলাম তার দৃষ্টান্ত পাঠক যামিনীবাবুর গ্রাম্যভাব চিত্রকলাতে, নন্দলালের সহজপাঠের ছবিগুলোতে এবং প্রত্যন্ত লৌকিক আর্টে, কুমোরটুলির মাটিশিল্পী, কালিঘাটের পটুয়া এবং পুরুলিয়ার ছোউমুখোশ তৈরিকারকদের শিল্পে হরদম দেখে থাকবেন।

বাঙালির মঙ্গলকাব্যে তাই শিবঠাকুরের অবাধ বিচরণ। তার খামখেয়ালীপনা, হঠকারিতা, ক্রোধ এবং বালাই বেহায়া গতর গৃহবধূর উৎপাতের কারণ হয়েছিল। তাছাড়া, চণ্ডীর সঙ্গে শিবের যে কুটতর্ক, বিরহ, আদি মঙ্গলকাব্য হতে সংক্রান্তির শিব ভাঁড়ামো, সকল ক্ষেত্রেই কবি বঙ্গজ দৃষ্টিতে দেব-দেবীর ঠাট-বাট ব্যক্ত করেছেন। কবির উচ্চারণের অন্তরে আমাদের নিদাঘ কর্কট নক্ষত্র সন্নিহিত অস্তিত্ব ভেসে উঠল। সংসারের কূট ক্যাঁচাল, কিম্বা হুটোপাটি কিম্বা উদ্ভট ঘটনাদি বাঙালি জীবনের একটা আদি শক্তি ধ্বনিত করছে। শিবের ক্ষেত্রেই বা তার অন্যথা ঘটবে কেন? অন্ততঃপক্ষে শিবের ধৃঙ্গিপনার দৃষ্টান্ত কবি বিজয়গুপ্ত, কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম, কে না দিয়েছেন। রঙ্গরসিকতা নিয়ে বাঙালির জীবন। আজ অবধি তার ব্যতিক্রম ঘটল না বটে কিন্তু রসিকতা যে সর্বত্র বজায় রয়েছে এ কথাও হলফ্ করে বলা যায় না। যে জাতি তার রসিকতা বজায় রাখে সে বড় ছোট জাতি নয়।

বৈষ্ণব ধর্মমত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের করালরূপ অনেকটা কেটে গেছিল। সনাতন ধর্মের বর্ণভেদ, অতিনিষ্ঠা, উন্নাসিকতাকে বৈষ্ণবের প্রেমলীলা অপসৃত করে দিয়েছিল। বৈষ্ণব সাধনার একটা অঙ্গ কীর্তনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। কীর্তনের সুরবৈশিষ্ট্য প্রাচীন শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ রাগিনী ভেঙ্গে ভেঙ্গে তৈরি হয়েছে। কীর্তন বাঙলার শ্রেষ্ঠ অবদান। বয়স্প্রাপ্ত হলে লীলাকীর্তনের প্রকৃত মহিমা বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম। হেঁয়ালিতে, বা সান্ধ্য ভাষায় পদাবলী রচয়িতা প্রেমভক্তির মাহাত্ম্য গান করেছেন। প্রেমের জন্যই সংসার এক লীলাক্ষেত্র। কীর্তন রচয়িতার যে তত্ত্ববোধটা আমায় বিশেষ করে ভাবায় সেটা এই যে সে প্রেমকে মানুষের মুক্তির একমাত্র উপজীব্য বলে চিহ্নিত করেছে। কবি বলেছেন প্রেমের উচাটন কম কথা নয়। এই উচাটনবিরহ, আমাদের সকল অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করছে। এই যে উচাটন বোধ, এই যে চোখে দেখার পর, যিনি রমন করছেন তাঁকে স্পর্শ করার পর থেকে তার সঙ্গে প্রাণে শৃঙ্গার করতে চাওয়া, এই যে চেয়েছি তিনি সংস্পর্শে থাকুন, এতেই যেন আমাদের একমাত্র মুক্তি হয়েছে, তৃষ্ণা মিটেছে। যাকে ভালবাসলাম তাকে পাওয়ার মধ্যেই পূর্ণতা। লীলা কীর্তনের এইটেই ছিল সার কথা। কীর্তনের সাধনার মধ্যে ভারতবর্ষের প্রাচীন ভগবদ্দর্শন এক নতুন আকৃতিতে ফিরে আসে। বর্তমানে যদি আমরা বাঙালির সাহিত্য মূল্যায়ন করতে বসি, অর্থাৎ, বাঙলা উপন্যাস বা কাব্যে, চিন্তাশীল গদ্যে, তাহলে আমরা দেখতে পাব কেমন করে বেদান্তের বা উপনিষদের সব গুঢ় তত্ত্ব বর্তমান জীবন দর্শনে, পাঠ্যে নানা অঙ্গে ফিরে এসেছে। বিশেষ করে পুরাণের, যাকে সাহেবরা বলে মীথ্, যেমন মার্কণ্ডেয় বা বিষ্ণুপুরাণের মত কাহিনীর যে উপকরণ ছিল, সেটা, আধুনিক কালে, আধুনিক ভাষায় পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। কীর্তনের উপমা, বা পটচিত্র, বা কাঠখোদাইয়ের চিত্রগুলো যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে প্রাচীন শাস্ত্রের জ্ঞান নিদর্শন তাতে খুঁজে পাব। এই নিদর্শনগুলো চিহ্নিত করার কাজটা বর্তমানে করা দরকার। আবার এই উচাটন বিরহের মতো আরো এক প্রাচীন নদীস্রোতের উপমা স্মরণ হচ্ছে। বাউলদের গানে ইসলাম ধর্মের সুফিদের যে চিন্তা ব্যক্ত হয় সেটা কম কথা নয়। আমি এর বিশদ ব্যাখ্যায় যাব না। একটা দৃষ্টান্ত দেব। একবার এক ছোক্রাকে দেখেছিলাম চোস্ত চাপকান পরে হারমোনিয়াম নিয়ে গান ধরেছে। সে গাইছে আর সামনের ইতস্ততঃ শ্রোতারা বসে দাঁড়িয়ে তার গান শুনছে। ছোকরা গাইছে 'হেথায় নদী গিরি সবই উর্দ্ধে ধেয়েছে'। মনে হল যে এই বর্ণনার মধ্যে, উল্টো করে দেখানোর জন্যে নয়, বরং কোন আদি রহস্যের খোঁজ রয়েছে। নইলে ভূমিতে যখন গিরিবর্ত বা নদীনালা সব সাগরে গিয়ে অর্থাৎ নীচের দিকে ধাবিত হয় তখন দেখছি এই গানটির উপমায় সব উপরদিকে ধেয়েছে। এই উত্তরণের ভাবনাটা যবন ফিরিঙ্গির ধর্মের গোড়ার কথা। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে উত্তরণের একটা ইঙ্গিত রয়েছে। সুফি বাউলিয়ার গানে সেই সত্যের এক ঝলক দেখেছিলাম। এই সত্যের ঝলক, কাল্পনিক চোখে দেখা হলেও তা সংস্কৃতির চরাচরে লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃতিকে আপন করে বুঝবার যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছিলাম এটা সেই চেষ্টাকেই সার্থক করে। এক গ্রীষ্মের বিকালে যখন রবিঠাকুরের 'সাহিত্যের কথা' হাতে নিয়েছিলাম তখন এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে দেখলাম। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের পূর্ণতার প্রসঙ্গ নিয়ে যে

আলোকপাত করেছেন তার মধ্যেও আমার বঙ্গদর্শনের কিছু কিছু ভাবনা নিহিত ছিল। চিত্ত যেন আপনা থেকেই পূর্ণতা পেতে চায়। আমাদের সকল সচেতন বিশ্বাসের আগেই এ পূর্ণতার গতি আমাদের চালাতে শুরু করে। পুত্রকে কামনা করি বলেই যে পুত্র আমাদের প্রিয় তা নয়, আপনাকে কামনা করি বলেই পুত্র আমাদের প্রিয়, পুত্রের মধ্যে পিতা নিজেকেই উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধিতেই আনন্দ। কোন একটা উপলব্ধির সূক্ষ্ম স্তরে গিয়ে মানুষের অনুভূতি বোধহয় সমধর্মী কিন্তু সরল দিনযাপনের ক্ষেত্রে মানুষ নিজেদের সংস্কার বিশ্বাস মেনে চলে। প্রত্যেকের অনুভূতি বা যাকে বলা চলে মানসিক প্রক্রিয়া এক। কিন্তু কেউ যখন কোন সাংস্কৃতিক সমষ্টির অংশীদার হয় তখন সে সেই কালচারের লোকেদের মত করে কথা বলে অঙ্গভঙ্গি করে বা আচার-ব্যবহার অনুসরণ করে। ভারতীয় সংস্কৃতির নানা অঙ্গে যে আনন্দের প্রকাশ-পূর্ণতার প্রকাশ—সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

বাঙালির বিশ্বাস-অবিশ্বাস সম্পর্কে আরেকটা কথা উল্লেখ করতে হয়। এটা অত্যন্ত দরকারি। এ জাতির যত সামগ্রী আছে তা রসাতলে তলিয়ে গেলেও এই বিশ্বাসটা অটুট থাকবে। যতদিন বৈদিক বা বৌদ্ধচিন্তার পীঠগুলো পড়ে থাকবে, যতদিন ভগবৎগীতার সঞ্জয় উবাচ এ দেশে পাঠ করা হবে ততদিন এর শিকড় অটুট থাকবে। অর্থাৎ জন্মাতরে বিশ্বাসের কথা বলছি। যেদিন থেকে আমাদের মতো সাধারণ লোকেদের কোন অদৃশ্য সত্যের কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করেছে সেদিন থেকে আমরা কর্মের কথা, কর্মফলের কথা, আমাদের পুনর্জন্মের নানারকম তত্ত্ব শুনতে পেয়েছি। আত্মীয় পরিজনের মধ্যে এ সব কথা নিয়ে রঙ্গ তামাসা বা বিতর্ক হতে দেখেছি। আমাদের নিরপেক্ষ এক অমর্ত্যলোক আছে এবং আমরা কেবলমাত্র দুর্বল মোহের বশবর্তী হয়ে জীবনধারণ করে আছি এরকম একটা ভাবনা আমাদের মধ্যে গেঁথে আছে। কঠোর নিরীশ্বরবাদীকেও দেখেছি ধন্দের মধ্যে পড়েছেন এবং পুনর্জন্মবাদ নিয়ে অস্ফুট প্রশ্ন মন্তব্য করেছেন। আমাদের ধর্মের এই তত্ত্ব আমার জানা ছিল। একবার এক গ্রামের এক সান্ধ্য সংস্কারে যমরাজ ও চিত্রগুপ্তের আখ্যানের এক নাট্যরূপ দেখেছিলেম। সেখানে মহাভারতের শান্তিপর্বের নাট্যায়ন হচ্ছিল। ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান। ভীষ্মের বর্ণনায় পরলোকের চিত্র উন্মোচিত হল, যমরাজের ভয়ঙ্কর রূপ, ঘনশ্যাম তনু এবং সোনার মুকুট, যেন মেঘের উপরে সূর্যদেব উঁকি দিচ্ছেন। যমরাজ চিত্রগুপ্তকে মৃতের আত্মার বিচার করতে বলছেন। সে বিচারের ফলে কারো নিস্তার হচ্ছে না। প্রত্যেককে তাদের পাপ ও পুণ্যের ফল পেতে হচ্ছে। যমপুরীর বর্ণনাতেও রোমাঞ্চ হয়। নরকের একপারে চৌরাশীটা অগ্নিকুন্ডে যমদূতেরা প্রয়াত আত্মাদের কাঁটার উপর বেত্রাঘাত করছে। কৃমিহ্রদে পাতকীদের সাঁতরাতে হচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে ভদ্রশীল নামের এক ব্রাহ্মণ হরিনাম করতে করতে তার পাপ স্খালন করেছেন। ভগবান বড় ভক্তবৎসল, তাকে ভক্তি করলে মানুষের নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি হয়। বলা বাহুল্য হবে না যে এই ভদ্রশীলপালাটিকে আমার অবাস্তব বলে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার প্রবৃত্তি হয়নি। আরও পরে যখন শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করেছিলাম তখন পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সত্যের পুনরাবর্ত লক্ষ্য করেছি। যে মূল্যবোধ আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে তা এই পাপ পুণ্যের

বোধ। হরির কাছে হয়তো পাপ-পুণ্য নেই। তাঁর শ্রীচরণ পেতে গেলে পুণ্যকেও নেতি নেতি বলে জানতে হয়। তবে যমদূতের অপেক্ষায় আমরা জীবনযাপন করি বলে বোধহয় জাতি হিসেবে এখনও নিদেনপক্ষে অন্যায়, আর অপরাধ থেকে বিরত থাকি। কঞ্চির ডলিতে জবা, পদ্ম আর ধুপ দিয়ে যখন নৈবেদ্য অর্পন করি তখন সংস্কৃতির অন্তিম অঙ্কে প্রবেশ করি। তাছাড়া ওই নেতি নেতি।

আমার লেখার ইতিবৃত্ত শুরু কলেজ স্ট্রীটে, তবে যেহেতু ছোটবেলাকার কোন দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে আমার স্মৃতি কালের পদচিহ্ন অনুসরণ করে না সেহেতু সে ইতিবৃত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ রচনা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমার এমনই মানসিক বিকার যে স্মৃতিপটে কেবল বিক্ষিপ্ত সব ছবি ভেসে আসে ও অতঃপর তলিয়ে যায়। পুকুরের জলে শরৎকালের যে শুভ্র মেঘের ছায়া পড়ে তাতে ইঁটপাটকেল ছুঁড়লে যেমন ঢেউ খেলে যায় তেমন আমার মানসপটে স্মৃতি চিহ্ন ভেসে আসে ও ভেঙ্গে যায়। গুটিকয়েক বস্তুতে একটা বাড়তি ইন্টারেস্ট বা কৌতুক পাওয়ার ফলে লেখা শুরু করেছিলাম। এর মধ্যে অবশ্যই আনারকলি ফিরিস্তির উপরে স্থান পাচ্ছে। কলির ভিতরে যেটুকু আলো প্রবেশ করে তাতে রঙের একটা বৈচিত্র্য প্রকাশ পায়। আনারকলি রক্ষা করবার প্রতীক। যেন এক টুকরো চুনির অন্তরে ডানাকাটা পরীর ভাস্কর্য করা। আনারকলিতে যে এক টুকরো কাব্য থাকতে পারে এটাই আমার লেখার মূল কথা। এ কথা অস্বীকার করতে পারিনা। আমার কিসে নিষ্ঠা আছে যে পন্ডিতের মতো অপলক দৃষ্টিতে কোন দুরূহ সত্যের প্রস্থান রচনা করব? আমার মতো আকিঞ্চনের ষষ্ঠীর বাহনের মতন ভাবুকের ভান করা চলে। আমার মনে যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয় তাতে উপকরণ কেবল আমার আটপৌরে বেঁচে থাকার ঘটা অঘটন। তবে কল্পনার কেরামতিকে ফুৎকারে উড়াতে পারি না। আটপৌরে জীবনের ধারে যে হোয়াট ফর নট, জালের চেয়ার, বর্মা টীকের টেবিল বা চন্টাভাঙ্গা পাখা আর শার্সির কাঁচের মলিনতা ভিড় করে থাকে তাদের নিতান্ত এভাবেই দেখি না বরঞ্চ কল্পনার প্রয়োগে তা সপাট রূপান্তরিত হলেই রসসিক্ত হয় বইকি।

যারা অল্পবিস্তর লেখালেখি করে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার চেষ্টা করেছে তাদের কার্যসিদ্ধির জন্য বইপাড়ায় ঘুরাঘুরি করতে হয়েছে। আমাকে বইপাড়ার রঙ্গকর্মীরা অল্পবয়স থেকেই আকর্ষণ করেছে কিন্তু সাক্ষাৎ পুস্তক প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে পরে। কলেজ স্ট্রীটের এ প্রান্তে যে প্রকাশক আছে তাদের নিয়ে একটা উপাখ্যান রচনা করা যায়। এখন কলেজ স্ট্রীট চত্বরে ছোট থেকে নিয়ে বারফট্টাই করবার মত নানা রকমারি পাবলিশার গজিয়েছে। লীফ্‌লেটের বিজ্ঞাপন, প্যাম্‌ফ্লেট, ম্যাগাজিন, লিট্‌ল ম্যাগাজিন, জার্নাল, ছোট পুস্তিকা, সরু কিংবা মোটা চক্‌চকে মলাটঅলা বই সবকিছু ছাপতে তারা সিদ্ধহস্ত। বটবৃক্ষের বয়স হলে সেটি যেমন ডালপালা বের করে চাতুর্দিকে বিস্তৃত হতে থাকে তেমন করে ইতিহাসের শেঁকড়ে গজানো ছাপাখানার মালিকেরা তাদের ব্যবসার পত্তন করেছেন।

নেই নেই করে উত্তরে রাধা সিনেমা পর্যন্ত আর পুব দক্ষিণ বরাবর শিয়ালদা স্টেশনের আশেপাশে প্রকাশকদের হৈ হৈ। বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা হিন্দু স্কুলের ধারে যুবকরা রাজনীতির বুলি আওড়াচ্ছে। এঁদো গলির মধ্যে লোকেরা দেওয়ালে প্রস্রাব করছে। হকারেরা বই বিক্রী করছে। টুং টুং করে ঘন্টা বাজিয়ে ট্রাম চলে যাচ্ছে। তবু নির্জন গলির ভিতরে চাপা চাপা বাড়িগুলোর বেসমেন্টে জেলবন্দী দাসের মত নিশ্চুপ হয়ে হাড়গিলে ছাপায় শ্রমিক ঢক্ ঢক্ আওয়াজ করে ব্লকের থেকে কাগজে ছাপ ফেলছেন। এখনও কলকাতার এ অঞ্চলে স্থির, অপরিবর্তনীয় কাগুজে সভ্যতার কোন নিরশন হয়নি।

আমার বাবা-কাকারা অন্ততঃ তিন প্রজন্মের রীতি মেনে এ অঞ্চলে শিক্ষা করতে এসেছিলেন। যে বয়সে জানলার গরাদ দিয়ে টগর আর করবীর খবর দেওয়া বাতাস গায়ে লাগলে শিহরণ হয় সে বয়সে আমিও এখানে লেখাপড়া করার জন্যে উপস্থিত হয়েছি। এখানে আসা সেই পারিবারিক বিধি মেনে। আমার পিতামহ সেকালে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে থেকে আইন পড়েছিলেন। সাতচল্লিশ সালে কয়েকটা যখন বাঙালির ভিটের বাটোয়ারা হল তখন আমাদের পরিবারের সবাই বিস্মৃতির কোটালে কোথায় কোথায় ভেসে যায়। ঠাকুর্দা পূর্ববঙ্গে তাঁর ওকালতির পসার গুটিয়ে ফের কলকাতায় চলে আসেন। আর তাকে দেশমুখো হতে হয়নি। আমি যখন ছাত্রাবস্থায় কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাতে সায়েবসুবোদের পলিটিকস্ আর থিওরী নিয়ে শিক্ষা করতে আসি তখন আমাদের পরিবারের পুরোনো ঐতিহ্যের কথা ভুলে মেরেছি বটে তবে নতুন করে—আজকালকার ব্রাহ্মণের উপবীত পড়ার মত—আমার এ পাড়ার হালচালে নিজেকে দীক্ষিত করার সাধারণ নৈমিত্তিকটুকুর ব্যত্যয় ঘটেনি। তবে বাঙ্গালির সাহিত্যপাঠে অনুরাগ সত্ত্বেও আমার খালি বোধ হয়েছে যে এখানেও বাঙালিচরিতের চরমসত্য অকপট দেওয়াল লিখনে প্রতীয়মান। যে অনীহার বশবর্তী হয়ে, আত্মম্ভরিতার প্রকোপে এ জাতির সকল সংস্কার প্রতিহত হচ্ছে তা সাহিত্যিকদের আক্রান্ত করেছে। এক লিট্ল ম্যাগাজিনের সম্পাদককে বলেছিলাম সততা ব্যতিরেকে কাজ করবেন না। ঠারেঠোরে এই মন্তব্যে আমি আমার নিজের সাহিত্যমনস্কতার চাবিকাঠি এঁটেছিলাম। ব্যক্তির আত্মিক সততাই তার সাহিত্যকর্মের গুণনীয়ক। বইপাড়ার মতন সারস্বত পীঠস্থানে আমার মোহ কেটেছে।

অতএব এবার আমার ম্যানুয়ালের এক একটা পয়েন্ট পর্যালোচনা করা চলে। অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিধি অবলম্বন করে আমি লিখি, কেনই বা যেভাবে লিখি একমাত্র সেই ভাবেই লিখি। কেনই বা অন্যথা হয় না। উপাযু আমার লেখাতে কেন ব্যামোহক জবানী। অথচ মাত্রাপাতের আশঙ্কা। কেন সারবান ভাবনা, ছান্দসের সন্তর্পণতা। শাব্দিকতায় শৈথিল্য। কেনই বা তাতে গদ্যের সৃজ্যমানতা। আত্মতৃপ্তি ও আত্মক্লেশ। আমি কেন লিখি? এর দুটো-তিনটে কারণ ব্যক্ত করা যেতে পারে। প্রথম দুটি যথার্থ তৃতীয়টি নগণ্য। প্রথমতঃ লেখার ব্যাপারে আগ্রহী হওয়ার কারণ কেবল লেখকই টের পায়। সে উল্লেখ আনারকলির উপমায় আগেই করেছি। লেখক বড় নিশ্চিন্ত মানুষ নন। তার লেখার পিছনে হরেকরকম দায়িত্ব থাকে। সে নিজেকে সংস্কৃতির বাহন মনে করে। তথাপি রচনা করতে করতে সে একটা ঋণ শোধ করে। মানুষের যেমন শাস্ত্রোক্ত পিতৃঋণ থাকে লেখকের তেমন অস্তিত্বের

ঋণ। যে গোয়ালার দুগ্ধদোহনের ফলে, ক্ষেতচাষীর অন্ন রোপণের ফলে এবং তাঁত মজুরের বস্ত্রবুনোটের ফলে, তথা ধরিত্রীর অপরিসীম মমতায়, জন্মগ্রাহক ইহলোকে বেঁচে বর্তে থাকে সেই সকল ধনদায়কের কাছে তার ঋণ। সমগ্র সমাজের কাছে তার ঋণ। লেখার ফলে লেখক ঋণমুক্ত হয়। সমাজের প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে লিখতে হয়। তৃতীয়তঃ চন্ডী কালিকার চ্যালার ন্যায় বকধার্মিক বা বেড়ালতপস্বীর প্রতিপত্তি বিনাশ করবার ইচ্ছে জন্মেছিল। অতএব বরাত জোরে যারা হতভাগ্য বাঙালি লেখক সম্প্রদায়ের শেষ প্রতিভূ সেজে, কুলাঙ্গার পন্ডিতমণ্যের পতাকা তুলে, অপরকে কাঠি করে, নিজেদের লেখক বলে হেঁকর তুলেছে কেবলমাত্র তাদের সায়েস্তা করতেও লেখা সাব্যস্ত করেছিলাম।

আমাদের পরিবার ছিল কাঠ বাঙাল। পূর্ববঙ্গের ভাষায় দরিয়ার গতি। তাতে কোন থানা পুলিশি চলে না। মাহেশের অমূল্য দাদু আজ গত হয়েছেন। আমি শৈশব অতিক্রম বালক হয়েছি। যখন ছিচ্‌কে ছেলের মতন ঘোষেদের আমবাগানে ঝোপ বুঝে কোপ দিচ্ছি তখন দেখতুম মাহেশের অমূল্য দাদু আসছেন এবং রাস্তা থেকে ডাকছেন "দাদুবাই লও ল্যাবেঞ্জুশ খাও"। বাসু—বাবা বলতেন বাউস্যা—মায়ের হাতের রান্না খেতে বাড়ি আসতো। সে দুপুরবেলায় জিরোতে জিরোতে গুলতানি করত। 'পাকিস্তানে (অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে) এক একডা ক্যাঙড়া ছেল কড়াইয়ের মত। ধানক্ষেতে আলের ফুটায় পলাইলে জাল পাইত্যা দিয়া ধরতাম। বাই তোমায় একদিন বড় বড় ক্যাঙড়া খাওয়াম'। আমি যে বাচন ভঙ্গির কড়চা শুনে বড় হয়েছিলাম তাতে একদিকে ছিল এই অবারিত ভাষা। এর অপরদিকে ছিল পড়শিদের খাঁটি এদেশী। সামনের সরকার বাড়িতে শুনতাম মাপা, গেঁড়ো দেওয়া, ক্লাসিকাল কলকাতার ভাষা। অবশেষে যখন লেখবার উপক্রম করলাম তখন খানিকটা পড়শীদের প্রভাব আর কতকটা টেঁকচাদ এবং হুতোমের রচনা পড়ে কলকাতার ভাষা অবলম্বন করা সাব্যস্ত করলুম। নিজের পরিবারের ভাষাভঙ্গিমা ছেড়ে দিয়ে কলকাতার বাঙ্‌লা আপন করলাম দুটো কারণে। প্রথমত এ গদ্যে একটা টান টান বুনোট ছিল। দ্বিতীয়তঃ মাটির উর্বরতার মতো দিশি ভাষায় মাটির কিছু চরিত্র থাকে। এহেন পরিস্থিতিতে অন্যের বাগানে যে সব ফুল ফোটে তার দিকে নজর দেবার দরকার পড়েনি। কলকাতার মানুষের বাচনকে সাদরে গ্রহণ করে যৌবনে নির্মাণ করা সিদ্ধান্ত করলাম। যে বিশ্বাস নিয়ে আমি হুতোমের ভাষা আরেকবার প্রচলন করবার আবেদন করলাম তা ভাঙবার অধিকার কেবল আমারই থাকে।

একটা বিশেষ উপমা দিয়ে আমার লেখনীর আদর্শ চিহ্নিত করা যায়। যারা টেঁটরা বা নিদেনপক্ষে কাড়ানাকাড়ার বাজন শুনেছেন তাঁরা বুঝবেন আমি কেন জবান বলতে এমন লব্ধ ব্যবহার করলাম যাতে যেন টেঁটরার তাল ছন্দ গড়ে ওঠে। যতদূর বাক্যে মাত্রার প্রশ্ন উঠছে কেমন নিপুণ মাপা ভঙ্গি। কথ্যভাষার যে একটা অব্যক্ত টান টান ভাব থাকে, বা যাকে বলা চলে একটা ধ্বনি ব্যঞ্জনা, সেইটেকে ধরবার আবাল্য চেষ্টা করেছি। টেঁটরার কুড় কুড় ছন্দে ওই একই অনুভূতি। অনুভূতিকে খালি অনুভূতি দিয়েই আঁচ করা যায়। তাই উপমা ছেড়ে তা অন্য কথায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকলাম। তাই তবল্‌চির চটাপটের তুলনা দেওয়া যায়। তবল্‌চিকে পাঠক নিশ্চয় চটাপট্‌ করে তবলার ছাওয়া

পেটাতে দেখেছেন। যাঁরা একেবারে তালকানা নন তাঁরা জানেন তবলা বাজাবার বোল আছে। যেমন তিন তাল ফাঁকে বাজে 'না তিন তিন না'। আবার জমপেশ্ দাদ্‌রার তাল চলে 'ধা তেটে তা ধেটে'। ছন্দের মহিমা কেবল তবল্‌চির চপেটাঘাতেই নয়—ছন্দের নিজের কিছু বিধি আছে। এখানেই স্বচ্ছন্দ সে তালের মাত্রাগুলো সৃষ্টির শুরু থেকে বিকাশ লাভ করেছে। জগতের আদিকালে ব্রহ্মা যখন মানুষের সৃষ্টি করেছিলেন, অর্থাৎ যখন সেই মহাপ্রাচীন মনুরও যারা পূর্বপুরুষ, যে পুরুষ মাটির থেকে সজাগ চৈতন্য নিয়ে বিকশিত হয়েছিল তখন তার বিকাশ লাভ করবার মধ্যেই মাত্রা নিবদ্ধ ছিল। সেই মাত্রাই নৃত্যে, নাট্যে, ঢুলির টেঁটরাবাদ্যে শ্রুত হয়। গদ্যের এই মাত্রা বা তালছন্দের ধারণা পাওয়া যায় কলেজ স্ট্রীট থেকে চিৎপুর রোড, হেদো থেকে শ্যামবাজার মোড়ের মানুষের কথ্য ভাষা থেকে। কিংবা বাগবাজার অঞ্চলের কথোপকথনে যে ভাষায় এদের কথা বলা তার ছন্দটুকু ধরতে পারলেই লেখার বারো আনা করায়ত্ত হোল। গদ্যে যে ছন্দের মাত্রাসংযোগ হলে গদ্য নির্মাণ সম্ভব হয় তা কোন বাইরেকার সামগ্রী নয়। এমন নয় যে কটা কথা লিখে ফেলে তাতে দিব্যি মাত্রা বসিয়ে দিলাম। মাত্রার প্রক্ষেপই গদ্যের শরীরকে তৈরি করে। এ কথা যতদিন সঠিক করে করায়ত্ত করতে পারিনি তত দিন আমার লেখার মধ্যে কণ্ঠস্বরের আভাস তৈরি হয়নি। তবে এখন ভাষার ব্যবহারে বোল শুনতে পাই। এতেই আমার পারমার্থিক তৃপ্তি। পাঠক বিচার করবেন এই গদ্যের বাচনে তবলিয়ার বোলের মিষ্টত্ব কিংবা কোন ব্রাহ্মণের চণ্ডীপাঠ বা শুক্লযজুর্বেদের মন্ত্রোচ্চারণ করার যে মাত্রা প্রক্ষেপ তার কোন সুদূর আভাস পাচ্ছেন কি না।

লেখার আর এক প্রাথমিক উপকরণ হল ভাবনা। পাঠক যদি প্রশ্ন করেন ভাবনা কাকে বলে তাহলে আমি তার সদুত্তর দিতে পারব কিনা বলতে পারি না, এখন বসে বসে ভাবলেই মানুষের ভাবনা জন্মায় না এ কথা ঠিক। বৃষ যখন রোমন্থন করে তখন তার কাল্পনিক প্রতিচ্ছবিগুলো সম্ভবত শুক্‌নো বিচালি, কাপাশ তুলো বা ঢ্যাপের খইয়ের মতো উড়ে যায়। বলদের ভাবনায় যদি কোন কাজ হোত তাহলে তাকে কলুর টান টানাতে হোত না। ভাবনার অভাবে যাঁরা লেখেন তাঁরা কতকটা বলদের ন্যায়। বিলাসের পণ্য নিয়ে যাঁরা সংবাদপত্রে লেখেন তাঁরা আজকের বলদ। দুটো মাইনের জন্য আর ফোকট বুঝে যারা কাগজ কলম পাচ্ছে তারাই লিখছে, লেখার হিড়িকে প্রাইজ পাচ্ছে, কিন্তু লেখা এতই সারবান যে তা টিক্‌তে না টিক্‌তে অন্য লেখার হিড়িক পড়ছে। লেখকেরা আসা যাওয়া করছে। যে লেখক ভেবে লেখেন তিনি ভাবনার খোরাক পান নিজের অন্তরে। কোন বই পড়ে বা শিক্ষা করে তার ততখানি ভাবনা আসে না যতখানি সে নিজের মধ্যে থেকে অর্জন করে। বোধহয় দৈবের বিছুটা হাত আছে নইলে অনেকের চেষ্টা করলেও ভাবনা আসে না। আবার কেউ কেউ ইচ্ছে করে ভাবেন না। ভাবনা ফুলের মতন, তুলশীর মতন ও ধনীর ধনের স্বপ্নের মত কল্পনাশক্তির জেরে অক্ষর বিন্যাসে ফুটে ওঠে। ভাব অনুভবের বিশ্লেষণ করলে আমরা ভাবনার মাহাত্ম্য টের পাই। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমি খেলনা বাটি, গুলতি ও ক্রমে ফুটবলের গোলাকার মহিমা অনুসরণ করতাম, এখন বয়স হয়েছে। মাঝে মধ্যে অলীক বা অলৌকিক ভাবের অনুসরণ করি ও একটু-

আধটু লেখার চেষ্টা করি। ভাবনা আমাদের আকাশের নক্ষত্র ও মহাশূন্যের দিকে টেনে নিতে পারে। কাঁধে শব্দ, বর্ণ ও অক্ষরের বোঝা নিয়ে ভাবনার জের টানতে টানতে অনন্তের পথে চলা। সে ক্ষমতা যে রচয়িতার থাকে সে ফুটো কড়ির উপকরণ ঝেড়ে ফেলে তাঁর নিজের ভাবনার পথে হাঁটা দেন।

এবার বাচনভঙ্গির অন্য একটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে উল্লেখ করছি। যাঁরা বাঙলা সাহিত্যে প্রবন্ধ লেখা ঠাওর করেছিলেন তাঁরা পুরাতন ঢাক পিটিয়েছেন। অর্থাৎ আমার আপাততঃ আরাধ্য লেখকগণের অন্যতম হুতোম ও টেকচাঁদ, আবার অন্যদিকে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ এবং একদম শেষে সুধীন দত্ত প্রত্যেকেই নিজের নিজের মতো করে ঢাকের বাদ্যি পুরাতন বাঙলা ভাষার উপর আখর দিয়েছেন। এই পুরাতন বাঙলা ভাষা কেমন করে তার বর্তমান স্বরূপ অর্জন করল কোন নৃতাত্ত্বিক বা ভাষাবিদ্ বিশদ করে ব্যাখ্যা করবেন। প্রত্যেক ভাষার একটা বাচনভঙ্গি থাকে। ইংরাজিতে বললে গালভারি শুনায় বলে এই বাচন বা কণ্ঠস্বরকে বললাম 'অ্যাটিটিউড'। আমার ভাষার কণ্ঠস্বর কানে বাজলে পর আমায় যেন সমাজতাত্ত্বিক অভিনয় করতে হয়। মহামুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রে অভিনেতাকে অভিনয় করতে বলেছেন। এরিকসন সাহেব ব্যক্তির এই অভিনয় পটুতার কথা বলেছেন। লেখক যদি বাঙালির ন্যায় অভিনয় না করতে পারেন, হালচালে নিজের তল্লাটের কপচানি বকুনির কেতা রপ্ত করতে হয়রান হন তাহলে তার লিখে কাজ নেই। বাঙালির সরা বা পট কেমন। বিলেতি রঙ কিংবা গর্জন তেলের দাগা বুলোলেই সৃষ্টির জন্যে সনাতনী তার বুক পেতে রেখেছেন। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। জীবনানন্দ দাশের পদ্যে বাঙালির সেই দিশি বাচনভঙ্গি অশ্রুত। তিনি কাব্যে বা কাব্যভাষায় সংলাপ প্রয়োগ করেছিলেন—ফিরিঙ্গি কবি ইয়েট্স বা এলিয়ট সাহেবের মতো। এমন অপ্রস্তুত বাঙালি পাঠককে হতে হয়নি। ইংরেজের ভঙ্গিমায় যে বাঙলা কবিতা লেখেন তাকে সবাই বরেণ্য মনে করেছেন। জীবনানন্দ দাশ গ্রামদেশের নদী, খাল, বিল, দোয়েল, চিল, শকুন ইত্যাদি পাখিকেও ইংরেজ পর্যবেক্ষকের মর্মে পর্যবেক্ষণ করেছেন। জীবনানন্দ একটি কবিতায় কথ্য ভাষার অতি নিকটে এসে একটি পঙ্ক্তি লিখেছিলেন। কিন্তু এখানেও গোটা কবিতাটা পড়লে মনে সংশয় হয় যে বিচিত্র এক শহরের বর্ণনা কবিতায় স্থান পেয়েছে। সে শহর সাইকেলরিক্সা, ঠ্যালাগাড়ী ও চা পাঁউরুটির ঝুপড়ি নগর আদি শহর কলকাতা কি না। এবং এ নগর যদি অন্য কোন নগর হয়, কোন বিলেতের মেট্রোপলিস তাহলে তা অন্য বিষয়। অতএব যদিও সে নগরে—

"একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে অস্থির পেট্রল ঝেড়ে—"

তবুও এ কোন নগর যেখানে কবির

"নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয় লিবিয়ার জঙ্গলের মতো"।

ভাল লেখককে অর্থাৎ যে লেখক গদ্যের চরিত্র নিয়ে অনুসন্ধান করেছেন, সিরিয়াস লেখক, ভাবুক বোঝেন যে বাক্যরূপ প্রকৃতপক্ষে অক্ষরের গ্রন্থি। লেখক যখন তার রচনা লিখবার পরিকল্পনা করেন তখন তিনি শব্দের মূল, সেই অক্ষরের গ্রন্থিবন্ধন করা শুরু করেন। লেখকের কাজ এ অর্থে গৃহনির্মাণের রাজমিস্ত্রীর মতো। মন দিয়ে দেখতাম

গৃহনির্মাণে কতখানি কেতাদস্তুর হতে লাগে। কর্পোরেশন এলাকার অলিগলি পাড়া, কলোনিতে গৃহনির্মাণে একটা অব্যাকরণসম্মত, বিক্ষিপ্ত চিন্তার ব্যবহার উপযোগী বাস্তু স্থাপত্যের নিদর্শন দেখি। সারি সারি বাড়ি, ইঁটের গাঁথনি, গাঁথনির দেওয়াল ও দেওয়ালের পরিমিতিতে তৈরি বাড়ি। যেমন গাঁথনি তেমন অক্ষরের পরে অক্ষর গেঁথে শব্দ নির্মিত হয়। যেমন গাঁথনির দেওয়াল জুড়ে জুড়ে বাড়ি তৈরি হয় তেমন শব্দের সঙ্গে শব্দ জুড়ে বাক্য সৃষ্টি হয়। যেমন বাড়ির পাশে বাড়ি স্থাপিত হয়ে একটা পল্লীর বিন্যাস তৈরী হয় তেমন বাক্যের সঙ্গে বাক্যের সংযোজনে একটা সমগ্র রচনা বিন্যাস লাভ করে। (আবার বাড়িগুলোর প্রত্যেকটায় আকার ইকার হসন্তের অলংকার—ঝুলবারান্দা, চিলেকোঠা, রোয়াক এবং লোহার ঝালাই করা গ্রিলের কারুকার্য।) ঠিক যেমন কোন স্থপতি গৃহনির্মাণের ডিজাইনে একটা লজিক বা কার্যকারণ মেনে বাড়ি তৈরি করেন এবং একমাত্র এই কারণেই যেমন বাড়িখানি সবার চোখে সুদৃশ্য ঠেকে ঠিক তেমন করেই নির্মাণের কার্যকারণ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে লেখককে শব্দপ্রয়োগ করতে হয়। এ কাজে ছন্দপতন হলে, কিংবা শৈথিল্য ঘটলে লেখার মানহানি হয়। লেখকের হাত ছেড়ে ছত্রাকার হয়ে তাতে এক বিচিত্র মায়াজাল সৃষ্টি হয়। তাতে প্রায়শঃই বৈচিত্র্য থাকে কিন্তু সাযুজ্য লঙ্ঘিত হয়।

অবশেষে বলি আমি যদি লেখকের লেখার প্রক্রিয়াকে দর্পণের সঙ্গে তুলনা করার উপযুক্ত যুক্তি করি তাহলে পাঠক মানবেন যে আমি এ বিষয়ে অযথা উক্তি মন্তব্য করছি না। যদিও আমার সংস্কৃতির ক্ষেত্র এই শ্যামল বাঙলা এবং আমার বাচনের ধরণ কলকাতার এক সাধারণ, ঐতিহ্য সচেতন নাগরিকের বৈ নয় তথাচ আমি যে সব বইপত্র পড়েছি ও গবেষণা করেছি তার অধিকাংশই পাশ্চাত্য। আমি উক্তির স্বচ্ছন্দচারিতায় প্রাচ্যমনস্ক এবং আমার নিরুক্তি স্বভাবতঃ আমার চারপাশের হাট-বাটের উপর অন্যমনা ধ্যানের ফলশ্রুতি তথাপি পাশ্চাত্য জ্ঞান আমার অনাহরিত নয় বটেই। এতক্ষণ প্রাচ্যের বুলি আওড়ালেও আমি এবার পাঠকের অনুমতি নেব। চিন্তকের সাধনমার্গে কেবল দুরূহ বাক্যসঞ্চার নয় কিছু ভাবনার আদান-প্রদানও ঘটে। যেমন ধরা যাক যে লেখক ফিরিঙ্গিয়ানাকে বর্জন করতে পারে তেমন ফিরিঙ্গির কিছু তত্ত্ব আত্মস্থ করতে পারে। আমার লিখিত রচনার ক্ষেত্রে ফিরিঙ্গিদের একটা মূলতত্ত্ব বপন করেছিলাম। সে তত্ত্বের বীজমন্ত্র ছিল একটা বক্তব্যেই। সাহিত্য যেন আয়না—যে আরশিতে সমাজ সংসারের লীলা দেখতে আশ্চর্য লাগে। আমি হদিশ করে দেখেছি যে বড় লিখিয়ের লেখা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই আমাদের সংসার বাজার-হাটের প্রতিবিম্বিত এক দর্পণ সাহিত্য।

অন্তিমে পাঠককে একটি সন্ধান নিবেদন করব। হুতোমের বাচনভঙ্গি আমার অত্যন্ত প্রিয় তবে একটা প্যাসেজ আমায় বারংবার ভাবিত করেছে। হুতোম প্যাঁচা প্রকৃতির এক টুকরো বর্ণনা দিয়েছেন। এমন বর্ণনা আমি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাবালু গদ্যেও খুঁজে পাইনি। রবীন্দ্রনাথেও নয়। কথ্যভাষা ও হৃদয়ের মর্ম যে বাচনে একত্রিত ও সংমিশ্রিত হয়েছে তার জুড়ি মেলা ভার। হুতোম লিখছেন।

'শরতের শশধর স্বচ্ছ শ্যাম গগন মাঝে নক্ষত্র সমাজে বিরাজ কচ্চেন দেখে প্রণয়িনী রজনী মানভরে অবগুণ্ঠবতী হয়ে রয়েছেন। চক্রবাক দম্পতি কতপ্রকার সাধ্য সাধনা

কচ্চে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, সপত্নীর দুর্দ্দশা দর্শন করে স্বচ্ছ সলিলে কুমুদিনী হাস্তেছে, চাঁদের চির অনুগত চাকার চকোরী সর্ব্বরীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে তাঁরে তুড়ে ভৎর্সনা কচ্চে, ঝিঝিপোকা ও উইচিংড়ীরাও চীৎকার করে চকোর চকোরীর সঙ্গে যোগ দিতেচে, লম্পট শিরোমণির ব্যবহার দেখে প্রকৃতি সতী বিস্মিত হয়ে রয়েচেন, এ সময় নিকটস্থ্ হলে রজনীরঞ্জন বড় অপ্রস্তুত হবেন বলেই যেন পবন বড় বড় গাছপালায় ও ঝোপেঝাপের আশেপাশে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে চলেচেন। অভিমানিনী মানবতী রজনীর বিন্দু বিন্দু নয়নজল শিশিরচ্ছলে বনরাজী ও ফুলদামে অভিষিক্ত কচ্চে।

এমন বর্ণনায় বাঙলা ভাষার যে উৎকর্ষ সাধন হয়েছে তা আর বাড়িয়ে বলা যায় না। সর্বোপরি প্রকৃতির চারিমাকে ভাষার পটে ফুটিয়ে তুলবার এক কায়দা প্রবর্তিত হয়েছে। বরঞ্চ এ উপপাদ্য বোধহয় প্রমাণিত হল যে, রচনার প্রথমেই যা বলেছিলাম অভিজ্ঞতার উপকরণকে কবি তার কল্পিত বাক্যের সংযোজনে পরাস্ত করেন ও বদলে দেন। আমি বলি এতেই কাব্যের জয়জয়কার।